পূর্বভাষণ

কার্যক্ষেত্রে প্রধানত ইংরেজী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের চর্চা করলেও ছাত্রজীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান সম্বন্ধে আমার গভীর আগ্রহ। বহু বছর ধরে খেয়াল-খুশীমত রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীতের এলোমেলো চর্চা করতে করতে এই রচনায় সংগৃহীত চিন্তাগুলি মনে ভেসে উঠতে থাকে। কিন্তু লেখার কোন পরিকল্পনা বহুদিন মাথায় আসে নি। সরকারী চাকরীর অমোঘ বিধানে যখন ১৯৫৭-র শেষদিকে কুচবিহারে বদলি হই তখন সেখানকার আপেক্ষিক নির্জনতার মধ্যে মন কিছুটা অন্তর্মুখ হয়ে ওঠে, এবং তখনই এই লেখাগুলির সূচনা। প্রায় সব লেখাগুলিই ১৯৬২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু নানা কারণে, বিশেষত উদ্ধৃতির ব্যাপারে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ বাধা সৃষ্টি করায় প্রকাশনার কাজ এর আগে শেষ করে ওঠা গেল না।

অল্পবয়স থেকেই ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের চর্চা করায় রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে আমার অনুভূতি বা ধারণা বহুদিন ধরে এবং বহুভাবে বিবর্তিত হবার সুযোগ পেয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স, টেনিসন বা রোসেটি-র মত রবীন্দ্রনাথেরও কাব্যের এবং কবিসত্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠেছি। ঐ সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে যে বিভোরতা ছোটবেলা থেকেই ছিল তাও গভীরতর পরিচয় এবং জীবন-অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ক্রমাগতই বদলাতে থাকে। রোমাণ্টিক ভাবপ্রবণতা থেকে মন যতই সূক্ষ্মতর শিল্পবোধের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো ততই কবির শিল্পীজীবনের দ্বিতীয়ার্ধের কাব্যকে সাধারণভাবেই প্রথমার্ধের কাব্যের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর মনে হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগলো যে কবির অধিকাংশ গানের কণ্ঠসংগীত হিসাবে যে অবর্ণনীয় শক্তি ও সৌন্দর্য, তা ছাড়াও তাদের নিছক কাব্যাংশগুলিও অসামান্য শিল্প-ঐশ্বর্যময়। এ সম্পর্কে আমার বন্ধু অধ্যাপক মোহিতকুমার মজুমদারের সঙ্গে বহুবার সাক্ষাতে ও পত্রে আলোচনা করে রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যসম্পদের এই উৎকর্ষ ও অনন্যতা সম্বন্ধে ক্রমশই অবহিত হয়ে উঠি। এর সঙ্গে আরো দুটি ধারণা দৃঢ়তর হতে থাকে। প্রথমত ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনের এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনের উপর গভীর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিণত কাব্যের অনুভূতি-সংগঠনে এবং রূপরচনার মধ্যে ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের এক সূক্ষ্মসঞ্চারী প্রভাব বর্তমান। দ্বিতীয়ত, জীবনের সার্থকতম পর্যায়, অর্থাৎ জীবনের শেষ ত্রিশ বছর ধরে 'আধুনিক'

সাহিত্যের প্রভাবে পরিবৃত থেকেও এবং যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্যের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখেও রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাবকে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁর নিজস্ব রোমাণ্টিকতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে শেষ পর্যন্ত সেখানে নিত্যনতুন অনুভূতিসূত্রের সন্ধান করে গেছেন।

আর একটি কথা আমি এই লেখাগুলির ভিতর দিয়ে বলতে চেয়েছি। সে এই যে 'রবীন্দ্রমানস' বা 'রবীন্দ্রপ্রতিভার' অনির্দিষ্ট নীহারিকালোক থেকে বোধ হয় আলোচক ও পাঠকের মনোযোগকে কিছুটা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ ক্ষেত্রে। কবির মানসিক ক্রমবিকাশ ও তাঁর দার্শনিক দৃষ্টির বিবর্তন নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তাদের কয়েকটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান, কিন্তু অনেকগুলিই কবির শিল্পীসত্তা সম্বন্ধে অচেতনতা-বশত অবান্তরতায় পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছুই ছিলেন, কিন্তু প্রধানত তিনি যে কবি, কারুশিল্পী, গীতকার —একজন creative artist—সে কথাটি অনেক সমালোচক প্রায়ই ভুলে থাকেন।

যিনি মূলত মানবহৃদয়ের এবং বিশ্বপ্রকৃতির কবি, গীতকার ও লিরিষ্ট, তাঁর অন্তরের বিশেষ স্পন্দনগুলিকে নিছক তত্ত্ববিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সেই অনুভূতি-নির্মিত জগতের রোমাঞ্চলোকে প্রবেশ করতে হলে সবচেয়ে আগে চাই পরিণত শিল্প-অনুভূতি এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। পাঠক বা সমালোচকের মনে রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবে বহু বিচিত্র চিন্তাজালের উদ্রেক সম্ভব ; কিন্তু এই সব চিন্তা-অনুভূতি যদি কবির কাব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় পরিচয়-প্রসূত হয় তবেই কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে তাদের সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচে-র কয়েকটি কথা মনে পড়ে।

The reader who understands poetry goes straight to its poetic heart and feels its beat upon his own ; where this beat is silent, he denies that poetry is present, whatever and however many other things may take its place, united in the work. and however valuable they may be for skill and wisdom, nobility of intellect, quickness of wit and pleasantness of effect. The reader who does not understand poetry loses his way in pursuit of these other things. He is wrong not because he admires them, but because he thinks he is admiring poetry.

আর্ট বা কাব্য যে শুধুই দার্শনিক দৃষ্টি বা গভীর অনুভূতি নয়, সে যে যে-কোন রকম জীবনানুভূতির সুসংহত সৌন্দর্যময় রূপ-পরিণতি সে কথা আজও যেন আমাদের

কাছে কিছুটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অথচ আর্টের এই দেহরূপ, এই form-এর মধ্যেই বলতে গেলে এর যা কিছু পরিচয়; কারণ এই form বাদে তার কোন অস্তিত্বই নেই। রবীন্দ্রকাব্যকে যদি উচ্ছ্বাসভরে "খুব ভালো" বা "অদ্ভুত" না বলে সেই কাব্য কেন এবং কোথায় ভালো, এবং কোথায় এবং কেন ভালো নয় তা বুঝতে হয়; তাহলে শুধু সেই কাব্যের ভাবাভিজ্ঞতা বা অন্তর্নিহিত তত্ত্বের আলোচনা করলে চলবে না; তার form-এরও আলোচনা করতে হবে; দেখতে হবে কোথায়, কী পরিমাণে এবং কেন তার প্রকাশরূপ সার্থক হয়েছে এবং কোথায় তা হয় নি। শুধু সার্থক-অসার্থকের মধ্যে নয়, ভালো-মন্দ-মাঝারির মধ্যে এবং ভালোর-ও বিভিন্ন স্তর এবং প্রকারের মধ্যে তফাৎ করতে হবে। অনুভূতি এবং শিল্পবোধের সম্মিলিত দৃষ্টিপ্রসূত এই discriminating study-ই রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের শিল্পী-পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। কাব্যশিল্পের সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ পরিচয়টি আমি আগ্রহী পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

এই অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করেছি বিশ্বসাহিত্যের, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের তুলনায় কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় এবং তাঁর বিশেষত্ব কী, ঠিক কোন্ দিক দিয়ে তিনি মহৎ, শিল্পসাফল্যের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর দান সত্যিই অনন্য। এই সঙ্গেই দেখাবার চেষ্টা করেছি, কোথায় তিনি দুর্বল, জীবনের কোন্ কোন্ পর্যায়ে এবং শিল্পসাধনার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর আর্ট অসম এবং অপরিণত, এবং এই সব আপেক্ষিক ব্যর্থতার তাৎপর্য কী। আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার উন্মেষকে ঠিকভাবে বুঝতে গেলে সেই উন্মেষের পথের বাধাগুলিকেও বোঝা দরকার।

এই আলোচনা-পর্যায়ের মূল পরিকল্পনাটি সরল। (ক) প্রথম পরিচ্ছেদে আছে আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিচার এবং তাঁর প্রতিভার মূল সুরটি নির্ণয় করার চেষ্টা। (খ) দ্বিতীয়াংশে পাওয়া যাবে কবি-অন্তরের সেই মূল প্রবণতাটি যে ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক সার্থকতা লাভ করেছে— সেই লিরিক কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-লোকের বিভিন্ন সুরগুলির বিশ্লেষণ এবং বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ের প্রয়াস। (গ) তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে রবীন্দ্রকাব্যের form-এর আলোচনা শুরু। এই অংশের প্রথমে আছে কাব্যকলার ক্ষেত্রে form-এর, শিল্পরূপায়ণের গভীর গুরুত্ব সম্পর্কে ইংরেজী কাব্যের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক স্তরের আলোচনা এবং তার পরে আছে রবীন্দ্রকাব্যের বিপুল ধারাটিকে

শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে সেই দ্রুত কাব্যের পরিবর্তিত রূপগুলির অনুধাবন। (ঘ) চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে আগেকার আলোচনার ভিত্তিতে এবং প্রধান ইংরেজ কবিদের শিল্পকীর্তির তুলনায় রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্ট শিল্পলক্ষণগুলির আলোচনা এবং তাৎপর্য নির্ণয়। কাব্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই বিচিত্র সাধনার পর্যালোচনার শেষে দেখানো হয়েছে যে ছোট ছোট পুষ্পোপম গীতিরচনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা তার সবচেয়ে সহজ এবং সার্থক শিল্পবিকাশ লাভ করেছে। (ঙ) শেষ অংশে আছে এই সার্থকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সে লেখা কয়েকটি পরম সার্থক গীতি-কবিতার appreciation। এ ছাড়াও আশা এই যে এই appreciation গুলি হয়তো রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিল্পী এবং শ্রোতাদের কবির শ্রেষ্ঠ গানগুলির বিচিত্র ভাবসম্পদ এবং অপূর্ব রূপগ্রন্থনা সম্বন্ধে আরো একটু সচেতন করে তুলতে পারে। এই প্রয়াসে কতটুকু সফল হয়েছি তা সুধীজনের বিচার্য।

পরিশেষে জানাই, এই বইটি লেখায় আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ মনীষার অমূল্য সাহায্য পেয়েছি। তাঁর কাছে আমার ঋণ পরিশোধের নয়। তাছাড়া, আমার তিন অধ্যাপক-বন্ধু মোহিতকুমার মজুমদার, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী এবং রামপ্রসাদ দাসের অনুপ্রেরণা এবং সাগ্রহ সমালোচনার জন্যই এই বই আজ বর্তমান আকারে উপনীত হতে পেরেছে।

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ

পরিচায়িকা

শ্রীমান গৌরীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজী সাহিত্যের রসলোকে গভীর অনুপ্রবেশশীল ও রুচিবৈদগ্ধ্যের অধিকারী একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্ররূপে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার এই পরিশীলিত শক্তি সে যে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে নিয়োজিত করেছে তার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আজকাল রবীন্দ্রসাহিত্য-গবেষণায় বাঙলা দেশে বহু কৃতী সুধী ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু এই উর্বরা ও একান্ত আকর্ষণীয় বিষয়ে যে প্রচুর গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে তার মধ্যে দুরকম সংকীর্ণতার চিহ্ন পরিস্ফুট। প্রথমত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের যুক্তিক্রমের অভাবে এদের অধিকাংশই উচ্ছ্বাসবহুল নির্বিচার প্রশস্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত কিছু অংশ রবীন্দ্রভাবধারার সারসঙ্কলনপ্রাচুর্যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় নিছক ভক্তিপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করছে। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন তাই নির্ধারণ করতে আমরা এমন ব্যস্ত যে তিনি কেমন করে বলেছেন সে জিজ্ঞাসা আমাদের নিকট গৌণ হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় ফেলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে আমরা তাদৃশ মনোযোগী হই নি। তাঁকে সার্বভৌম বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দের তুলনায় তাঁর স্থান নিরূপণ করার দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আসল মূল্য জানা যাবে তাঁকে ভারতীয় কাব্য বা সংস্কৃতির নিরিখে যাচাই করে নয়, তাঁর ভাবধারার অবিমিশ্র বৈচিত্র্য বা উৎকর্ষে নয়, তাঁর বাণী-ভঙ্গিমার শাশ্বত ও দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনাশক্তির উপলব্ধিতে। ইংরাজী সাহিত্যে শেক্‌সপিয়র মিল্‌টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, টেনিস্‌ন, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবির কোন কোন পংক্তি আমাদের চেতনায় যে মুগ্ধ বিস্ময়, যে গভীর অনুরণন, চিত্তের যে গূঢ়তম উদ্বোধন জাগায়, যাতে একসঙ্গে রুচি ও রসবোধ তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ পংক্তি রবীন্দ্রকাব্যে কত প্রচুর ও স্বতঃস্ফূর্ত তাই বিচার করে তাঁর রচনা বর্তমানকে উত্তীর্ণ হয়ে মহাকালের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, মুহূর্তের তিলক তাঁর ললাটে শাশ্বত ভাস্বরতায় উদ্ভাসিত হবে কি না তারই পরীক্ষায়। এই মানদণ্ডে রবীন্দ্রকাব্য-বিচারে গৌরীপ্রসাদই প্রথম পথিকৃৎ। রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের বিচার আমাদের সমালোচনায় এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কেন না শিল্প সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সংশয়িত। এইখানে গৌরীপ্রসাদ এক নিঃসংশয় রুচিপ্রত্যয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য পরিক্রমা করেছে ও অতিকথনের সঙ্গে শিল্পসঙ্গত

মিতভাষণের পার্থক্য নির্ণয়ে কোন সংকোচ করে নি। হয়ত তার প্রত্যেকটি অভিমতের সঙ্গে সকলের মতৈক্য হবে না। কিন্তু যে দুঃসাহসী বিচারবুদ্ধি ও রুচিসংস্কার, অতিরেক ও ভাববিন্যাসে তিলমাত্র অসংযম ও অসামঞ্জস্য ধরে ফেলে ও তা নির্ভীকভাবে ঘোষণা করে, তার দৃষ্টির মৌলিকতা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দনীয়। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' অভিহিত প্রথম প্রবন্ধে, অন্যান্য বিশ্বকবির সহিত তুলনায়ই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মৌলিকতা নির্দ্ধারিত হতে পারে, শুধু কালিদাস বা বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর সংকীর্ণ ভাবপরিমণ্ডলে তাঁকে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁর প্রতিভার স্বরূপটি নির্দ্ধারিত হবে না, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিশ্বকবির মানদণ্ডে তাঁর ভাবপরিধি ও প্রকাশদীপ্তির মূল্যায়নের দ্বারাই তাঁর প্রকৃত মহিমার উপলব্ধি সম্ভব। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও লিরিক আর্ট'-এ লিরিকের মর্মসত্য উদ্‌ঘাটনে লেখক কবির উপলব্ধির অন্তর্মুখিতা ও ভাববৈচিত্র্যের বিপুল সমৃদ্ধি ও প্রসার বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিদের সহিত তুলনায় নিরূপণ করেছে। এতে তার পাঠের সর্বসঞ্চারী পরিমাণ ও অভিনিবেশের সূক্ষ্ম অনুভূতি আশ্চর্যরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন মহাকাশ বিচরণের আপেক্ষিক কৃতিত্ব যে দুটি দেশ এ বিষয়ে অগ্রণী তাদের বৈমানিকদের তুলনামূলক পরীক্ষার সাহায্যেই নিরূপণ সম্ভব, তেমনি নভোচারী কবি-বিহঙ্গের উর্দ্ধারোহণ ও তার পক্ষবিস্তারের অকম্পিত স্থিরতা অন্যদেশের আকাশবিহারী কবিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের মানদণ্ডে নিরূপণযোগ্য। কেবল সমধর্মী কবি-সাহিত্যিকদের সহিত প্রতিযোগিতার দ্বারাই রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার তুঙ্গ সমুন্নতি ও দুর্গম পথে স্বচ্ছন্দ পরিক্রমার ধারণা করা যেতে পারে। তাঁর প্রতিভার শক্তি ও দুর্বলতার ও সীমা নির্ধারণের জন্য এই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা। রবীন্দ্র-লিরিক আর্টের উপজীব্য হিসাবে লেখক যে সত্যটি প্রকারভেদে উল্লেখ করেছে, আমার মনে হয়েছে যে, বিষয়গুলির অতি-জটিলতা ও পরস্পর-সাপেক্ষতার জন্য সেগুলির স্বাতন্ত্র্য সংশয়াতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই স্তরবিন্যাসগুলিও লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও প্রকাশের আশ্চর্য সম্পদ সত্ত্বেও পাঠকের নিকট সুবোধ্য হয়ে ওঠে নি। হয়ত নিজে গীতিকবি না হলে শুধু গীতিকবিতার রসবিভোর অ-কবির পক্ষে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের মূর্চ্ছনা যথাযথ বাণী-শিল্পে রূপান্তরিত করা অসম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের ক্রমবিবর্তন' রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমায় এক নূতন দিগ্‌দর্শন উদ্‌ঘাটিত করেছে। সাধারণত সমালোচকগণ এই ব্যাপারে দুটি রীতি অনুসরণ করেছেন। এক হচ্ছে কালানুক্রমিক, অপরটি হচ্ছে ভাব-পরিণতিমূলক।

এর সঙ্গে এক তৃতীয় পদ্ধতিও সংযুক্ত করা যায়। সেটি হল সাহিত্যপ্রকরণ-অনুসারী। সাধারণত কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, গদ্যরচনা প্রভৃতি ধারা অনুসরণে সমালোচনা বিন্যস্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি বিভাগের সূত্রানুসরণে রবীন্দ্রপ্রতিভার সূচনা, অনুশীলন ও চূড়ান্ত পরিণতির অগ্রগতি-রেখাটিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা হয়। কিন্তু শিল্পরূপের অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের সাক্ষ্যটির দীপবর্তিকা তাতে নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের দুরূহ সমস্যায় অনুপ্রবেশ ও সার্থক শিল্পসৃষ্টির মানদণ্ডের নির্দেশে এর মূল্যায়ন এক অভিনব নিরীক্ষার পথ উন্মোচন করেছে। এই সূত্র অবলম্বনে গৌরীপ্রসাদ কতগুলি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিনবত্ব বিস্ময়ের হলেও কবির শেষ লক্ষ্য হল প্রকাশ-পরিপূর্ণতা, পাঠকচিত্তে কাব্যানুভূতির অনবদ্য সংক্রামণ। Form ও content-এর অভিন্নত্ব-সাধনই কবিপ্রতিভার দুরূহতম পরীক্ষা। এ পর্যন্ত প্রচলিত রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা সাধারণত content-এর উপর বেশী জোর দিয়ে তার form-এর দিকে আপেক্ষিক ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। গৌরীপ্রসাদ ইংরাজী কাব্য থেকে চারটি সুনির্বাচিত উদ্ধৃতির সাহায্যে শ্রেষ্ঠ কাব্যে এই form ও content-এর হরিহর-আত্মার অমোঘ মিলন-তত্ত্বটি উদাহৃত ও ব্যাখ্যাত করেছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে আরও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা বিশ্লেষণ করে কোথায় বা কবি চরম শিল্পসার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কোথায়ই বা সাময়িক বিভ্রান্তিতে মহত্তম সাফল্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তা প্রজ্ঞাপরিণত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে নির্দ্ধারণ ক'রে তার অভ্রান্ত, বহু-সাহিত্যপাঠে পরিশীলিত রুচি-প্রকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। এই বিষয়ে তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সূত্রটি অনুসরণ করলে ভবিষ্যৎ আলোচকবৃন্দ নির্ভরযোগ্য বিচারভূমির সূচনা পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের আদি পর্যায়ের কাব্যগুলি সন্ধ্যাসংগীত থেকে চিত্রা পর্যন্ত প্রসারিত। এই যুগকে আমরা রবীন্দ্র-সৃষ্টিকল্পনার পূর্ণ উৎসারের ও সমস্ত বন্ধন-মুক্তির স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করি। কিন্তু এইসব বাধাবিঘ্ন-মুক্তকারী কবি-কল্পনার কল্লোলিনী নদীতে রূপান্তরের কাহিনীটি পরিপূর্ণ শিল্পসংযমের ও রূপস্থির-তার পরিচয়বাহী নয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যে উদ্দাম গতিবেগ ও ভাবধারাপুষ্ট ছন্দ-উচ্ছলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ, তা যে সঙ্গে সঙ্গেই পরমতম শিল্পপরিণতির নিঃসংশয় নিদর্শন তা বোধ হয় দাবী করা যায় না। উদ্দীপনা বাইরের শিকলকে ভেঙেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত শিল্পরুচি-নির্মিত স্বেচ্ছাসংযমকে বরণ করে নেয় নি। বরং প্রথম বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস-আতিশয্যে যে কবিতার মধ্যে ফেনিল আবর্তচক্রের উদ্ভব হয় তাই তার সামগ্রিক গঠন-সুষমাকে অস্পষ্ট ও আবিল করে তুলেছে। ভাবোচ্ছ্বাস প্রথম

মুক্তির অদম্য গতিবেগে যেন কিছুটা অগ্রসর না হলে এ রূপসৃষ্টির শাশ্বত সংযমে ছন্দায়িত হতে চায় না। সুতরাং গতির প্রথম উন্মত্ততা কবিকল্পনার ছন্দোময় শাসন মেনে না নিলে এর শাশ্বতরূপটি স্থিরতা লাভ করে না ; অশান্ত তরঙ্গ-বিক্ষোভের অস্থির মুকুরে কবিকল্পনার মানসচিত্রটি নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না। সুতরাং যেমন কবির ভাবৈশ্বর্যের ক্রম-পরিস্ফুট পূর্ণতাটি লক্ষ্য করা দরকার, তেমনি প্রয়োজন তার রূপশিল্পের চরম রমণীয়তার অনুধাবন ও অনুভব। এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্র-সমালোচনায় এই অতিপ্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল; গৌরীপ্রসাদের আলোচনা এই অভাবমোচনের প্রথম প্রয়াসরূপে গণ্য হবার যোগ্য। ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-কবিকল্পনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্পোন্নতি বা শিল্পোৎকর্ষ একটি আবশ্যিক অনুসন্ধানরূপে আলোচনার অঙ্গীভূত হবে। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির বিচার এক সূক্ষ্ম অনুভব-মানদণ্ডের বিষয়ীভূত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে নূতন পর্যবেক্ষণের উপকরণ যোগাবে।

অবশ্য লেখক কবির শিল্প-সার্থকতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তরূপে 'চিত্রা'র অন্তর্ভুক্ত ও তার পরবর্তী রচনায় যে সমস্ত কবিতার উল্লেখ করেছে তার সবগুলিই যে সুনির্বাচিত, এ ধারণা আমার হয় নি। বিশেষত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির এই তালিকায় অন্তর্ভুক্তি আমার যুক্তিনিষ্ঠ বলে ঠেকে নি। কবিতাটি কবির মানসপরিবর্তনের সাক্ষ্যরূপে তাৎপর্যময় হলেও এর শিল্প-সংহতি দুই বিরুদ্ধ ভাবের অতর্কিত মিলনপ্রয়াস হিসাবে আমার নিকট পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয়েছে। যেখানে লেখক 'সাজাহান'-এর মত কবিতার শিল্পোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে সংশয়ী সেখানে 'এবার ফিরাও মোরে'-র মত মধ্যমানের কবিতার সম্বন্ধে এরূপ অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া আমার নিকট বিভ্রান্তিকর ঠেকেছে।

এই নূতন মানদণ্ড অবলম্বনে লেখক 'বলাকা' থেকে কবির অন্তিম জীবন-পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও তাৎপর্যময় পথপরিক্রমা করে আমাদের নিকট রবীন্দ্রকাব্য-বিচারের একটি অভিনব সন্ধানসূত্র প্রকটিত করেছে ও আমাদের এই কবিতাবলীর পুনর্বিচারের প্রেরণা দিয়েছে। আপাতত স্তুতি-নিন্দাবিকীর্ণ পূর্বসংস্কারের ভাঙ্গা কাঁচের প্রাচুর্যে দুর্গম পথপরিক্রমার আমার কোন অবসর নাই। যদি ভবিষ্যতে এই পুনর্বিচারের সুযোগ পাই তবে এর সদ্ব্যবহারের ইচ্ছা রইল।

সর্বশেষে 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গীতিকবিতার পরিচয়' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক কাব্যরস-আস্বাদনের যে অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম মর্মোদ্ঘাটনের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে তাই তার এ বিষয়ে প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত অভিজ্ঞানপত্র।

অবশ্য এই পরিচয় সম্পূর্ণভাবে কাব্যধর্মী; এর মধ্যে সুরের অভিযোজনায় যে আবেদনের নিগূঢ় রূপান্তর ঘটে তার পরিমাপের কোনও প্রয়াস লক্ষ্যণীয় নয়। এই গানের কাব্যপ্রবণতার সূক্ষ্মতম অনুরণনটি, এর সুকুমার ব্যঞ্জনাসমূহের অন্তর্বয়ন, এর অন্তরের অন্তঃপুরে নিহিত এক জটিল ভাবরূপের দিব্য উন্মোচন এই আলোচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। বিষয়টির ব্যাপ্তি ও অন্তর্মুখিতার তুলনায় সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের খণ্ডিত উদ্ধৃতি নিতান্ত অপ্রচুর মনে হয়। কিন্তু জানা গেল যে এইরূপ অসম্পূর্ণ প্রয়াসের জন্য লেখক নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ আরোপের ফলেই তাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই তার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। গবেষণার পথকে এরূপ কণ্টকাকীর্ণ করা রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ও প্রচারেরই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। গানগুলির উপযুক্ত রসবিচার ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যময়তা উদ্ঘাটিত হলে তা বিদগ্ধমহলে তাদেরই আস্বাদ্যতা বাড়াত। যাই হোক এ বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আমার আর কিছু করণীয় নাই। এই ভাঙ্গাচোরা আলোচনাতেই আমাদের আপাতত সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

কবিতা থেকে গানে রূপান্তরের ফলস্বরূপ কবিতার অন্তঃপ্রকৃতিতে কিরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে সেই কৌতূহল আরও অনুকূল পরিস্থিতির জন্য প্রতীক্ষায় রইল। তবে একটি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত লেখকের অনুভবের চিহ্নস্বরূপ আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে। কবিতার 'স্মৃতি' গানে 'বিস্মৃতি'তে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সমস্ত চমৎকৃতিটুকু লেখক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় অনুভব ও প্রকাশ করেছে (পৃঃ ১০৬—১০৭)। গানের গভীরশায়ী টানে কবিকল্পনা সমস্ত বাড়তি বিস্তারকে ছেঁটে ফেলে এক নিবিড় সংহতি ও অর্থগূঢ়তায় কেন্দ্রায়িত হয়েছে। অতীত স্মৃতির জোয়ার আনে না, স্মৃতির একটা চকিত চমক মুহূর্তের জন্য স্ফুরিত হয় মাত্র। যে বিস্মৃতির জোয়ারে সমস্ত অতীত নিমজ্জিত, তার পিছনটানে দু-একটি স্মৃতির লুপ্তাবশেষ, মগ্নচৈতন্যের দু-একটি কণিকা, হঠাৎ বিস্মৃতির অতল থেকে জেগে ওঠে। তাই কবির অসতর্ক উক্তি এক অভ্রান্ত সংস্কারে ও অনবদ্য সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উদ্‌বুদ্ধ গীতিকারের দ্বারা সংশোধিত। সুরের অন্তর্গুঞ্জন যে উত্তেজিত অনুভূতিকে সমস্ত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে, তাই কাব্যের অসামঞ্জস্য দূরীকরণে নিজ অমোঘ প্রেরণার পরিচয় দেয়। সঙ্গীতোৎফুল্ল কবিদৃষ্টি এক শাশ্বত সত্যের ধ্যানলোক আবিষ্কার ও অধিকার করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই নিগূঢ় অনুপ্রেরণা এক স্বতন্ত্র ও দূরবিসর্পিত আলোচনার প্রতীক্ষা করছে। সংগীতে যে চিরন্তন ভাব সত্যের এমনকি

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

মানুষের কাব্যরচনার ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে শেষ পর্যন্ত একটি পরম বিস্ময়ে মন এসে দাঁড়ায়। সে বিস্ময় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সৃষ্টির অনির্দেশ্য খেয়াল-খেলার এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত—পৃথিবীর এই আশ্চর্য সুরময় প্রাণটিকে জাগিয়ে তোলা ইতিহাসের এই গীতহীন যুগের প্রাঙ্গণে। রোমান্টিক আদর্শের মৃত্যুলগ্নে যেন জন্ম নিল রোমান্সের পারিজাত। বহু-পরিবর্তিত ইয়েট্‌স যখন তাঁর পিছনে-ফেলে-আসা রোমান্টিক কাব্যরচনার দিনগুলির কথা ভেবে বলেছেন—

> We were the last romantics—chose for theme
> Traditional sanctity and loveliness

তখনও সত্তর বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথের হাতে মানুষের রোমান্টিক অনুভূতির সৌন্দর্যরূপায়ণ অভাবনীয় বৈচিত্র্যের পথে এগিয়ে চলেছে। এই ধরনের অসঙ্গত, অথচ দুর্নিবার আবির্ভাব ইতিহাসে আরো দু-চার বার ঘটেছে। Restoration-যুগের বিপুল চাপল্যের মধ্যেই বৃদ্ধ মিল্‌টন তাঁর মহত্তম কাব্যগুলি রচনা করেন। তাঁর স্বকীয়তা অসাধারণ ও অনস্বীকার্য। কিন্তু তিনি ছিলেন Renaissance ও Reformation—এই দুই পূর্ববর্তী ভাবরীতির শেষ বাহক, এবং তাঁর Paradise Lost-এর মধুর-গম্ভীর মন্দ্রধ্বনি অন্তত সাময়িকভাবে সেই কেতাদুরস্ত যুগের বাক্‌-কোলাহলের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে গিয়েছিল। তাই শেষ-সপ্তদশ শতকে ড্রাইডেন-এর শিষ্য অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু মিল্‌টন এর কৃতী শিষ্য একজনও মেলে না। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তখনকার মত বিস্মৃত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ঘনায়মান অবিশ্বাস ও মূল্যক্ষয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরিপূর্ণ শিল্প-জীবনের এক মহান প্রস্রবণ। তাঁর দুর্দমনীয় প্রভাব জাতীয় শিল্পসত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তাকে জারিত করেছে নিঃশেষে। তাঁর মহান বিশ্বাসোজ্জ্বল সৃষ্টি এ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ মরুর বুকে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের স্বপ্ন রচনা করেছে।

আধুনিক যুগের শিল্প-সাহিত্যের সমস্ত নতুন আদর্শকে অনায়াসে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন রোমান্টিক আদর্শের অনুসরণে। পথে যেতে যেতে যুগের ভাণ্ডার থেকে যা কিছু আহরণ করেছেন তাকেই নিজের অন্তরের স্পর্শে নতুন রূপে জাগিয়ে তুলেছেন। কোথাও কোন বাধা অতিক্রম করতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি; কারণ আধুনিক যুগের দেশী বা বিদেশী কোনো সাহিত্যেরই

প্রভাব তাঁর মনে স্থায়ী হয় নি। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ-যুগের মানুষ হয়েও তিনি এ-যুগের সাহিত্যিক চিন্তা ও ও সৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেন নি। এই বৈষম্যকে তিনি সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত একে লুপ্ত হতে দেন নি। স্বকীয়তার ধ্রুবপথ থেকে মুহূর্তের জন্যও ভ্রষ্ট না হয়ে তিনি অনেক দূরের আধুনিকতাকেই আপনার দিকে বার বার টেনে এনেছেন। তাই বাংলা সাহিত্যে আজ এমন একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যা পৃথিবীর আর কোন প্রখ্যাত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্পনা করাও কঠিন। ইয়েট্‌স্‌-এর মোড়-ফেরার সময় থেকে ইংরেজী কাব্যে আধুনিকতার প্লাবন বয়ে গেছে। এলিয়ট, পাউণ্ড-প্রমুখ যুগ-প্রবর্তকদের রচনার ভিত্তিতে নতুন আদর্শের স্থাপনা হয়েছে। সে আদর্শও আবার বারে বারে বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ডেভিজ বা ডে-লা-মেয়ার বা প্রথম-যুগের ইয়েট্‌স্‌ এর আদর্শ আজ নিঃশেষে পরিত্যক্ত।[১] কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা আজও বারে বারে উৎসবারির সন্ধানে ফিরে যায় বিপরীত-ধর্মী রবীন্দ্রনাথের দ্বারে, বিস্ময়পুঞ্জিত চোখে চেয়ে থাকে সেই বিজাতীয় ঐশ্বর্যের দিকে; কখনও অর্ধচেতনায় কখনও বা অচেতনায় বারে বারে তোলে 'বেঠিক-পথের পথিক'-এর জয়ধ্বনি।

আধুনিক জীবন অশান্ত। ছোট বড় অসংখ্য সমস্যার সংঘাত তার প্রাঙ্গণে। তাই বাস্তব, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের ছিন্ন সংঘাতময় বৈচিত্র্যই সেখানে সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। সে বাস্তবের স্পর্শ শুষ্ক-কঠিন, কারণ এ-যুগের বহু বিপর্যস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাকে এমনই করে তুলেছে। তাই বারে-বারে আহত পর্যুদস্ত মন সবচেয়ে সত্য বলে জানে এই খণ্ডিত কঠিনতাকে, আর তার বিরক্তি থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি চায় ক্ষণিক সুখাবেশের মোহে। তাই তার কাছে আর সব-কিছু ছাপিয়ে উঠেছে দুটি সত্য—দৈনন্দিন সংগ্রামের রূঢ়তা আর তার মাঝে মাঝে ক্ষিপ্র হাতে ছিনিয়ে-নেয়া নিমেষের আরাম। তার সংগ্রামের প্রস্তুতি, বিরাম বা চিত্তবিনোদন—সব-কিছুর মধ্যেই আছে দ্রুত-সঞ্চরণের অধীরতা। এই অতি-প্রয়োজনীয় অশান্ত ক্ষিপ্রতা তাকে স্বভাবতই নিকটতমের দিকে আকৃষ্ট করে। এই কাছের টানের আড়ালে তার দূরদৃষ্টি হয় ব্যাহত, তার রুচির স্বকীয়তা এবং কামনার গভীরতা নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে ধীরে ধীরে হয় সমাহিত। তাই যা-কিছু

১ মনে হয় ইংরেজী কাব্যে এবং বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও অল্প কিছুদিন থেকে অপেক্ষাকৃত সরল এবং পুরোনো প্রকাশরীতির দিকে মোড় ফেরার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সে অত্যন্ত সাম্প্রতিক ব্যাপার।

প্রত্যক্ষ, অতিপ্রকট, তার বাইরে আর যা-কিছু প্রচ্ছন্ন, সুদূর, তা স্বভাবতই তার চেতনার ঘেরাটোপ-দেয়া সংকীর্ণ আলোয় ধরা পড়ে না।

এ-যুগের মানুষের এই চিত্তবিক্ষেপের মূল অনেক গভীরে এবং আজ পর্যন্ত আমরা এর প্রতিকারের পথের কোন নিশানা পাই নি। আমাদের এই নোঙর ছেঁড়া, নতুন-ভারসাম্য-সন্ধানী মনোভাবকে নিয়ে আমরা অনেক বিচিত্র পরীক্ষা করেছি এবং সময়ে সময়ে এই সব পরীক্ষা থেকে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁদের চমকপ্রদ জিনিস সৃষ্টি হয়েছে; তাদের মূল্য নগণ্য নয়। তা ছাড়াও আমাদের এই সব বহুমুখী প্রয়াস নিশ্চয়ই পরবর্তী কালের আত্মসন্ধানের পথকে আলোকিত করবে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা কঠিন যে এই খণ্ডিত তুচ্ছতা, এই বহু-বিক্ষিপ্ত চাঞ্চল্য, এই দিগ্-ভ্রান্তির অনিশ্চয়তা এবং এই অস্বাভাবিকের অন্বেষণকে মহৎ সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলা সহজ নয়। এ-শতাব্দীর এই বিপর্যয়-বিহ্বল মনোভাবের সবচেয়ে সার্থক কবি টি. এস্. এলিয়ট-এর রচনাতেও বার বার ধ্বনিত হয়েছে শুধু এই বিপুল মূল্যক্ষয়ের হাহাকার, মানুষের কোনো চিরন্তন সত্যোপলব্ধির সুর নয়। অথচ এই যুগের বিক্ষুব্ধ গণ-কোলাহলের মাঝখানে দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের দ্বিতীয়ার্ধের অবিনশ্বর দান আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। তার কারণ, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর মানবজীবনের বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত রূপটি তাঁর বেদনাকে আলোড়িত করলেও তাঁর গভীর কল্পনাদৃষ্টিকে মানব-অন্তরের চিরন্তন রূপ-লোকের সাধনা থেকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে নি। তার কারণ, বাইরের সমস্ত আলোড়ন সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি কখনও কোনো কিছুর উপরিভাগে এসে থেমে যায় নি; সেই বহিরাবরণকে অনায়াসে ভেদ করে গভীর অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। তাই কালনির্বিশেষে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মূল সুর অন্তর্লোকের রহস্যময় গভীরতার বিচিত্র ব্যঞ্জনা। তাঁর অবর্ণনীয় সৌন্দর্যসৃষ্টির কথা বাদ দিলে দৃষ্টির এই স্বচ্ছন্দ গভীরতাই তাঁর মহত্তম দান, এবং এখানেই তিনি আধুনিকদের থেকে সবচেয়ে দূরে।

রবীন্দ্রনথের দৃষ্টির গভীরতা বলতে আমি শুধু তাঁর বহু-বিশ্লেষিত আধ্যাত্মিকতাকে বোঝাই নি। কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই পৃথিবীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ pantheist। এই চির-রহস্যময় অনুভূতির ক্ষেত্রে তাঁর মতো এত সহজ এবং এত বিচিত্র পথে কেউ সঞ্চরণ করেন নি। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এই ক্ষেত্রে মোটেই সীমাবদ্ধ নয়; তাঁর ক্ষমতার ঐ-রকমই বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায় আর এক ক্ষেত্রে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সে ক্ষেত্র হচ্ছে হৃদয়ানুভূতির মনস্তত্ত্ব। অধ্যাপক কাজামিয়াঁ সার্থকভাবেই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-কে বলেছেন

psychological poet par excellence, এবং ব্রাউনিং-ও একজাতীয় নাট্যকাব্যের মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের যে বিচিত্র বিশ্লেষণ করেছেন তার উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানবমনের অজস্র অনুভূতি-আকৃতির যে অপূর্ব রসঘন ছবি এঁকেছেন তা আগেকার এই শ্রেণীর অধিকাংশ রচনাকেই বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-এর মতো রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির অবিকৃত লীলা দেখবার জন্য অসংস্কৃত গ্রাম্যজীবনের পটভূমির আশ্রয় নেন নি। ব্রাউনিং-এর মতো তিনি মধ্যযুগ বা Renaissance-এর দীর্ঘলুপ্ত পটভূমির মধ্যে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে অর্ধ-সংস্কৃত মানুষের বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের কল্পনাচিত্র আঁকেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থান এবং কালকে অনায়াসেই মেনে নিয়ে তার পটভূমিতে চিরদিনের সভ্য পরিশ্রুত মানবমনের গভীর আনন্দবেদনার অনুভূতিগুলিকে ছোট ছোট কাব্যপটে অননুকরণীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর প্রতিভা গভীরভাবে লিরিকধর্মী; তাই তাঁর কল্পিত প্রতিটি পরিস্থিতির মর্মবাণীই পরোক্ষভাবে তাঁরই ব্যক্তিত্ব-নিঃসৃত, প্রত্যেকটি মানস-চিত্রই তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের বর্ণে রঞ্জিত। এমনই গভীর তাদের বার্তা, এমনই সূক্ষ্ম তাদের ব্যঞ্জনা এবং এমনই চিত্তজয়ী তাদের দেহরূপ যে তাদের আবেদন বিদ্যুৎসঞ্চারের মত অনুভূতিপ্রবণ মনকে আবিষ্ট করে।

যখন মনে করি এই ধরনের কবিতা সমস্ত ইংরেজী সাহিত্যে হয়তো দু'শোটির বেশী নেই, কিন্তু একা রবীন্দ্রনাথে আছে কয়েক শত, এবং এই ইংরেজী লিরিক-গুলিও অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম কবিতাগুলির সামগ্রিক উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছাতে পারে নি তখন বিস্ময় কূল পায় না। তার ওপরে যখন ভাবি যে, এই অশান্ত উৎকেন্দ্রিক যুগের প্রতিকূলতার মাঝে দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে এই গভীর সৌন্দর্যসৃষ্টির পথে শেষ পর্যন্ত অভ্রান্তভাবে নিয়ে গেছেন, তখন সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে তাঁর তুলনা পাই না।

আরো আশ্চর্য এই যে, আমাদের সাহিত্যের আধুনিক ছাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও, প্রমথ চৌধুরীকে বাদ দিলে, তিনিই প্রথম। তাঁর 'শেষের কবিতা' ও 'চতুরঙ্গ' তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চিন্তাধারা এবং বাচনভঙ্গির চমকপ্রদ নবীনতায় সেদিনের রীতিমত চটকদার আধুনিকতাকেও নির্বাক করে দিয়েছিল। কথিত বাংলা ভাষা তাঁরই হাতে 'সাধু'ত্বের জড়তা থেকে মুক্তিলাভ করে আজকের এই সহজ এবং পরিপূর্ণ প্রকাশ-মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে মৌলিক সৃষ্টি গদ্য-কবিতার ক্ষেত্রেও তিনিই পথিকৃৎ। এমন কি, আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাঁর শেষ জীবনের মুহূর্তের মনোযোগের দান গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

অথচ একথাও ঠিক যে পুরোপুরি আধুনিক ধরনের রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় কখনই হাত দেন নি। এ বিষয়েও তাঁর অসাধারণ আত্মচেতনা এবং শিল্প-বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিকতার অভিনব স্রোতকে তিনি অনুভব করেছেন, কিন্তু সে-স্রোতে ভেসে যাওয়া তিনি তাঁর পক্ষে সম্ভব বা সমীচীন মনে করেন নি। তাঁর প্রগতিপ্রিয় মন আধুনিক মুক্ত-ছন্দের বিস্তৃততর স্বাধীনতা এবং বাস্তব-সমাবেশের সুযোগকে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে এমন সব চমকপ্রদ সৃষ্টি করে গেছে, পূর্বাচরিত পদ্ধতিতে যা একেবারেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু গদ্য-ছন্দকে কখনও তিনি এলিয়ট বা পাউণ্ড-এর মত ব্যবহার করেন নি; তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর লিরিকধর্মী প্রতিভার পক্ষে তা প্রয়োজনও নয়, সম্ভবও নয়। দু-একবার মুহূর্তের মোহে এবং অনুচরদের অতি উৎসাহে লুব্ধ হয়ে তিনি আধুনিকতার মাঝডাঙায় এসে এযুগ-বাদীদের চমক লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন—যেমন করেছেন তাঁর 'ল্যাবরেটরি' নামক অর্থহীন এবং অশোভন গল্পটিতে। কিন্তু এইরকম দু-একটি সামান্য ভুলের ধাক্কা'ই তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁর ভিন্নধর্মী মনের নিজস্ব পথে। আধুনিক মানুষের স্বপ্নভঙ্গের দিশাহারা বেদনা তাঁর মনকে গভীরভাবে আঘাত করেছে, তাঁরও জীবনস্বপ্নকে করেছে আলোড়িত, কিন্তু তাকে ভাঙতে পারে নি। তাই আধুনিকতার প্রান্তদেশে তিনি দীর্ঘদিন বিচরণ করেছেন সগৌরবে; কিন্তু সেই প্রতিকূল এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ভ্রান্ত চেষ্টা করেন নি।

দেখা যায়, উনবিংশ শতকের প্রথম জাতীয় জাগরণের অস্পষ্ট প্রত্যুষ থেকে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ আন্তর্জাতিক ও সামাজিক কোলাহলের জ্বলন্ত দ্বিপ্রহরে এসে পৌঁছেছেন একটি সুস্পষ্ট পথে। সে পথ অনেকাংশেই তাঁর নিজের সৃষ্টি এবং এই দীর্ঘ এবং অতিদুর্গম পথে তিনি একবারও দিগ্‌ভ্রান্ত হন নি। তার কারণ, তাঁর দৃষ্টি এত গভীর, বোধ এত স্বচ্ছ এবং মন এত উদার ছিল যে অনায়াসে এবং অক্লান্তভাবে তিনি সমস্ত ক্ষেত্রেই মহত্তরকে গ্রহণ এবং তুচ্ছতরকে বর্জন করে গেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক—যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, তিনি যেন অত্যন্ত সহজেই জীর্ণ পুরোনোকে শান্তভাবে সরিয়ে রেখে উজ্জ্বল নতুনকে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক আশ্চর্য গতিশীল মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি একবার দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারতেন অসংখ্য পুরোনো রীতি ও আদর্শ কী ভাবে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়ে আবার বিচিত্র নতুনের মধ্যে নবজন্ম লাভ করে নতুন সৃষ্টি-সম্ভাবনার ইঙ্গিত করছে। ঠিক এই কারণেই

নিছক নতুন বা পুরোনো বলে কোনো জিনিসকে তিনি আদর বা অবজ্ঞা করেন নি; সব কিছুকেই যাচাই করেছেন তার আভ্যন্তরীণ শক্তি ও সম্ভাবনা, তার inner vitality দিয়ে। তাই প্রকৃত হিন্দুধর্মের উৎস উপনিষদের প্রভাবে তাঁর অন্তর পুষ্ট হলেও হিন্দুসমাজের মজ্জাগত অসংখ্য কুসংস্কারের তিনিই ছিলেন প্রবল শত্রু। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক হয়েও তিনি গান্ধীজির চরখা-প্রচলন, বিদেশীবস্ত্র-দাহন, জন্মনিয়ন্ত্রণ-বিরোধিতা প্রভৃতি কয়েকটি নির্দেশের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সংগীতের ক্ষেত্রেও তিনি সেই একই ঐতিহ্য-সচেতন অথচ প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতীয় মার্গ-সংগীতের মহান প্রভাবে তাঁর অন্তর পরিপুষ্ট, এবং সেই সংগীতকে তিনি বিচিত্র শিল্পরূপে অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর অজস্র গানে। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার দেখা যায় যে আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের ঠাট এবং রাগিণীগুলির গতিপথের অপরিবর্তনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর ঐশ্বর্যময় শিল্পী-অন্তরের বিচিত্র প্রয়োজন অনুসারে তিনি বহু রাগ রাগিণীকে আশ্চর্য সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তিত এবং সংমিশ্রিত করে শুধু যে অপরূপ এবং অভিনব ইঙ্গিতময় সুরলোকের সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, প্রাচীন সংগীতকে তার চিরস্থিরতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি তার মহিমাকে এক অভাবনীয় নববিকাশের পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। সেই একই নীতি অনুসারে তিনি আধুনিক সাহিত্যের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশরীতিকে এক নতুন-বেদনা-পীড়িত যুগের অভিজ্ঞতার দ্যোতক হিসাবে অভ্যর্থনা করেছেন; কিন্তু সেই আধুনিকতার আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতা, অগভীরতা, অস্পষ্টতা এবং রুচির বিকৃতি তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাঁর চেয়ে ভাল গদ্য-কবিতা ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্যে কেউ লিখেছেন বলে জানি না। গত শতাব্দীর শেষ কুড়ি বছর এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছর ধরে স্থান-কালের এক বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যে যা-কিছু সুস্থ, সবল ও সুন্দর তাকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে টেনে নিয়েছেন; কিন্তু নির্জীব, বিকৃত বা নিছক চমকপ্রদ সব-কিছুই তাঁর হাতে ক্রমান্বয়ে বর্জিত হয়েছে। তাঁর বহুবিস্তৃত সুদীর্ঘ স্রষ্টার জীবনে প্রায় কোনো কিছুতেই তিনি ঠকেন নি—এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে? অন্তত সাহিত্যের ইতিহাসে এমন আর কারুর কথা আমার জানা নাই, যিনি স্থান ও কালের প্রভাবকে এত বহুলভাবে অতিক্রম করে এরকম অপরিমেয় মূল্যের সৃষ্টি মানুষের হাতে দিয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও লিরিক আর্ট

লিরিক আর্টের জন্ম শিল্পী-অন্তরের আকস্মিক অনির্দেশ্য ভাবস্পন্দন থেকে। তাই সে এত প্রাণময়, তাই তার নিবিড় রহস্যের কেন্দ্রে পৌঁছেও পৌঁছানো যায় না। সংগীতকে বাদ দিলে আর যে কোনো ধরনের শিল্পসৃষ্টির মূলে অনির্দেশ্য প্রেরণার সঙ্গে মিশে থাকে কিছু পূর্ব পরিকল্পনার ইঙ্গিত, কিছু সচেতন চিন্তা ও ব্যক্তি প্রয়াস। কিন্তু গীতধর্মী আর্টের জন্মমূলে আছে প্রায় শুধুই অন্তরাবেগ, শুধুই এক প্রকাশেচ্ছু ভাব-বিভোরতা। সে মেঘপুঞ্জিত অন্তরের চকিত বিজলীরেখা ; স্থান-কালের কোনো পূর্বনির্দেশ তার জন্য নয়। চিন্তা, ঔৎসুক্য, জিজ্ঞাসা—সবই তার 'মেজাজের রঙিন খেলা'র স্পর্শে অবিমিশ্র অনুভূতির রূপমালায় গাঁথা হয়ে যায়।

কিন্তু লিরিকের এই ক্ষণিকতা নশ্বরতার নামান্তর নয়। আমরা জানি, যা সবচেয়ে সুন্দর তাই সবচেয়ে ক্ষণিক। ফাল্গুনের চঞ্চল মাধুরী, সূর্যাস্তের বিচিত্র বর্ণরাগ, যৌবনের অপরূপ লাবণ্যোচ্ছ্বাস, প্রেমানুভূতির দুর্লভ পরিপূর্ণতা, জীবনের এক একটি অভাবনীয় পরিস্থিতির তড়িৎ-আবেদন—সবই কয়েকটি মাত্র মুহূর্তের জন্য চোখ মেলে ঝরে পড়ে অস্তরবির পথে, দৃষ্টিপারের মহাতিমিরে—যেখান থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার কোনই উপায় নেই। এই ক্ষণিকতার বেদনায় নিঃশ্বসিত জীবনের মহাপ্রাঙ্গণ। লিরিক আর্ট এই অকূল বেদনার কৃষ্ণসায়রের বুকে বিকশিত আনন্দের অম্লান শতদল। কোন তত্ত্বোদ্ঘাটন তার সচেতন উদ্দেশ্য নয়, কোনো দার্শনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সে ধার ধারে না। সে চায় স্পর্শকাতর মানবমনের নিবিড় অনুভূতির নিমেষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে কথার পারিজাতমাল্যে, ছন্দের তরঙ্গদোলায়। তাই মর্ত্যমানবের অসীম-বৈচিত্র্যময় অনুভূতিলোকে যা-কিছু অবিস্মরণীয়, অনির্বচনীয়, জীবনে যা-কিছু মুহূর্তের বেদনা-ঝলকে অসীম সৌন্দর্যের আভাস দিয়ে যায়, তার স্পর্শের সেই লুপ্ত শিহরণকে আমরা যুগ যুগ ধরে অনুভব করি লিরিকের অম্লান দ্যুতিজালে।

ক্ষণিক নিবিড়ের এই অমরত্বে অভিষেক রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের মতো আর কোথাও হয় নি। ইংরেজী সাহিত্য লিরিক-সৌন্দর্যে অপূর্ব সমৃদ্ধ। ছোটো-বড়ো কত অসংখ্য কবি এই ঐশ্বর্যভাণ্ডারে তাঁদের অক্ষয় দান রেখে গেছেন। প্রায় চারশো বছর ধরে ভরে-ওঠা এই লিরিক-ভাণ্ডারের ভাবব্যাপ্তি এবং রূপবৈচিত্র্য অতুলনীয়। নিছক নমুনা হিসাবে কয়েকটি মহৎ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি।

শেকস্‌পীয়ার-এর সনেট, That time of year thou mayst in me behold-এ[১] জীবনার্ত প্রেমিকপ্রাণের আসন্ন বিদায়-গোধূলির অসীম করুণতার চিত্রটি কয়েকটি অপূর্ব image-এর ভিতর দিয়ে গভীর সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে। তাঁরই Measure for Measure নাটকে গাঁথা Take, O take those lips away গানটিতে পরিত্যক্তা প্রণয়িনী মেরিয়ানার অন্তরাক্ষেপ অতুলনীয় শিল্পসৌন্দর্যের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-এর My heart leaps up (The Rainbow) কবিতাটিতে প্রকৃতির অম্লান রূপের সঙ্গে কবির প্রাণের প্রীতির সংযোগ চিরন্তন হোক—এই মহৎ কামনাটি মর্মস্পর্শী সরলতার ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। শেলি-র Away! the moor is dark beneath the moon-এ যে অনুতপ্ত প্রেমিক তার পরিত্যক্তা প্রণয়িনীর খোঁজে এসে তার সদ্যমৃত দেহটি দেখে ফিরে যাচ্ছে তার চির-অশান্তিময় জীবন পরিস্থিতির চিত্রণ এক নিবিড় সৌন্দর্যমালা রচনা করেছে। টেনিসন-এর Tears, idle tears-এ পাওয়া যায় অতীত স্মৃতির অমৃত-গরলময় আবেদনের অভিব্যক্তি এক অবিস্মরণীয় image-মালার মধ্যে। ব্রাউনিং-এর Two in the Campagna-য় দুই প্রেমিকসত্তার আত্মবিনিময়ের পথে নিয়তির হাতে বসানো যে দুরপনেয় বাধা, তার ব্যথিত চেতনা এক অপূর্ব আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে একটি চরম উপলব্ধির শীর্ষে পৌঁছেছে। ইংরেজী সাহিত্যে এই ধরনের গভীর-ব্যঞ্জনাময় লিরিকের শেষ রচয়িতা বোধহয় ইয়েট্‌স্‌। তাঁর When you are old-এ কবিপ্রিয়ার সুদূর বার্ধক্যকালের বেদনাময় যৌবন-স্মৃতির অপরূপ কল্পনা চিত্রণ, অথবা তাঁর Aedh wishes for the cloths of Heaven-এ মহত্তম প্রেমের প্রেরণায় জেগে ওঠা আত্মোৎসর্গের অসীম আকূতির রূপায়ণ এই শ্রেণীর আর্টের পর্যায়ে পড়ে। এমন বহু দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু আগেই বলেছি আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমস্ত ইংরেজী সাহিত্যে এই স্তরের লিরিক রচনা যত আছে তার চেয়ে বেশী আছে একা রবীন্দ্রনাথে। পরিসংখ্যানের সাহায্য না নিয়েই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, কারণ তুলনীয় সংখ্যাদুটির মধ্যে তফাৎ সামান্য নয়।

যে সব দুর্লভ-দ্যুতিময় হীরা-মুক্তা-চুনী-পান্না একত্রেই অভিভূত করে তাদের রবীন্দ্রনাথ মুঠোয় মুঠোয় ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের সাহিত্যের সংকীর্ণ অঙ্গনে, এবং একজন-মাত্র কবির হাত থেকে পাওয়া মহৎ কাব্যের এই অতি-প্রাচুর্যই আমাদের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি জাগায়। কিন্তু তুলনার

১ শেক্‌স্‌পীয়ার, সনেটমালা, ৭৩।

প্রসঙ্গ উঠলে আর একটি তফাৎ আগেকার মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদেশী লিরিক কবিদের অনেকের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শুধু তাঁর দানের বিপুল পরিমাণেই নন, তাঁর সৃষ্টির গুণগত উৎকর্ষেও। অরূপকে রূপায়িত করায়, অনির্বচনীয়কে বাণীময় করে তোলায় রবীন্দ্রনাথ আর সকলকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছেন। চেতনার যেসব গভীর ছায়াচ্ছন্ন স্তরে অন্য কবিদের দৃষ্টি কদাচিৎ পৌঁছেছে, সেখান থেকেও তিনি তাঁর কথা ও সুরের মায়াজাল বিস্তার করে অপার্থিব সৌন্দর্যের মূর্তি আহরণ করে এনেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণায় আমরা সৃষ্টির বাস্তবকেন্দ্রের দিকে যতই অগ্রসর হতে চেষ্টা করি ততই রহস্যের মায়াজাল নিবড়তর হয়ে আমাদের সন্ধানী পদক্ষেপকে বিভ্রান্ত করে তোলে। অনুভূতির উপলব্ধির জগতেও তাই। হৃদয়ানুভূতি যে পরিমাণে গভীর ও সূক্ষ্ম, সেই পরিমাণেই রহস্যময় এবং অবাধ্য। রবীন্দ্রনাথ কখনও অনুভূতির বাইরের স্তরে থেমে যান নি। ইন্দ্রিয়রঞ্জিত বহিরাবরণের অতিসূক্ষ্ম প্রবেশপথ দিয়ে তিনি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির কেন্দ্রে গিয়ে আঘাত করেছেন এবং অতুলনীয় প্রকাশ শক্তি ও শিল্পচেতনার বলে সেই অব্যক্ত জগতের রহস্য-গভীর মহিমাকে ছোটো ছোটো লিরিকের সহস্র বর্ণচ্ছটায় ব্যক্ত করেছেন। তাই তাঁর সৃষ্টি এত প্রাণতরঙ্গিত, জীবনীশক্তিতে এত ভরপুর। তার মধ্যে জীবনানুভূতির কেন্দ্রলীন অব্যক্ত স্পন্দন ধরা পড়েছে বলেই তাতে অসীমের রেশ।

মানুষের হৃদয়লীলার গভীরে রবীন্দ্রনাথের এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে আজীবন ছুটিয়েছে তাঁর প্রতিভার সমধর্মী প্রকাশরীতির খোঁজে। এই দিনে-দিনে বেড়ে-ওঠা প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে তাঁর রচনার ভঙ্গি গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই একই কারণে তাঁর নিজেরই হাতে গড়া আধুনিক বাংলা ভাষা ও ছন্দের সমস্ত শক্তিকে আশ্চর্যভাবে আয়ত্ত করেও তিনি ক্রমাগতই ফিরেছেন সুরের সন্ধানে। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য অমিত-শক্তিশালী হলেও তাঁর অলৌকিক লিরিক-প্রতিভা চরম অভিব্যক্তি পেয়েছে সেখানেই যেখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং শ্রেষ্ঠ সুর শরতের সবুজ প্রাঙ্গণে সকালের সোনালী আলোর মত পরস্পরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে ও-প্রসঙ্গের মধ্যে আমরা আর বেশী দূর অগ্রসর হতে চাইনা। কারণ আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের লিরিক কাব্য, তাঁর সংগীত নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই চির-অতৃপ্ত প্রকাশ-প্রেরণা, সার্থকতর শিল্পরূপের এই চির-অন্বেষণ তাঁর অন্তরানুভূতির যে গভীরতা ও সূক্ষ্মতার পরিচয় বহন করে তার

সম্যক্-উপলব্ধি জীবনকে এক রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের আনন্দে ভরে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মূল অনুপ্রেরণা প্রাচীন ভারতের মহৎ দার্শনিক কাব্য থেকে এলেও শিল্পী হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতকের ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের সগোত্র এবং অনেকাংশেই তাঁদেরই প্রবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতির উত্তরসাধক। কোল্‌রিজ এবং বায়্‌রন ছাড়া বাকি তিনজন প্রধান রোমান্টিক কবির সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মিল গভীর। কিন্তু কিছুটা ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির গভীর পার্থক্যের জন্য এবং কিছুটা ব্যক্তিগত প্রকৃতির ভিন্নতার দরুণ আগেকার রোমান্টিকদের প্রবর্তিত কয়েকটি মৌলিক অন্তরাভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন আশ্চর্যভাবে বিবর্তিত হয়েছে, এমন এক অভিনব অনুভূতি-স্পন্দনে পর্যবসিত হয়েছে যে কাব্যের ইতিহাসে তারা এক নতুন ঐশ্বর্যময় অনুভূতিলোক সৃষ্টি করেছে। 'লিরিস্ট' রবীন্দ্রনাথের এই সূক্ষ্মতর অভিজ্ঞতালোকের প্রধান ক্ষেত্রগুলির প্রকৃতি এবং বিশেষত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

১. সভ্যতা-সংস্কৃত মানুষের মানসলোকের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের ওপর রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য মর্মভেদী রসদৃষ্টিপাত করেছেন—কাব্যের ইতিহাসে যার তুলনা নাই। মানবজীবনের যে পরিস্থিতিগুলি তিনি তাঁর অসংখ্য ছোটো ছোটো লিরিকে চিত্রিত করেছেন তারা সম্পূর্ণভাবে স্থানকাল-নিরপেক্ষ। পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা সার্থকতার পথে বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেও যে-সব সমস্যা ব্যক্তিগত জীবনকে আন্দোলিত করতে থাকবে—মানব-অন্তরের সেই-সব চিরন্তন সমস্যাগুলিই রবীন্দ্র-লিরিকের উপজীব্য। শুধু তাই নয় সভ্যতা যত অগ্রসর হতে থাকবে, তার বহির্জীবনের সংগঠনের সমস্যাগুলি যতই ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসবে (যদি সত্যিই তাই হয়), জীবনের সেই শান্ততর পরিবেশে অপরিবর্তনীয় মানব-প্রকৃতির চেতনা-স্পন্দনগুলিও ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠে মানুষের মনোযোগকে গভীরভাবে আকর্ষণ করবে।

২. সভ্যতার ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের আর এক মহৎ দান—মানবীয় প্রেমের এক অত্যাশ্চর্য আত্মিক পরিণতি। নর-নারীর প্রণয়-আকূতির এই অপরূপ বিশোধন কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বাদ দিয়ে ঘটে নি; ইন্দ্রিয়লোভন রূপ-ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েও সে প্রেম তাকে অতিক্রম করে হৃদয়ের গভীরতর রূপলোকে প্রবেশ করেছে। তবে মানুষের প্রেমরঞ্জিত হৃদয়ের অজস্র ঐশ্বর্য, প্রেমের স্পর্শে জেগে-ওঠা অন্তরের বিচিত্র বিশ্বপ্লাবী পুলক-বেদনা রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টিকে এমনই মুগ্ধ করেছে যে প্রেমের নিছক দেহকামনার দিকটির প্রতি তাঁর মনোযোগ

প্রায় কখনই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নি। তাই তাঁর প্রেমকাব্যে দেহ যেন অতি সহজেই অন্তর্লোকের বিচিত্র আকুতির বাহক, তার বহু-বিচিত্র gesture-এর অপরূপ রূপব্যঞ্জনা হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিত্রণের আর একটি মহৎ বিশেষত্ব এই যে তাঁর আঁকা মানুষের বিচিত্র প্রেম-আকুতি আর্ত অন্তরের আবর্তে আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে-পড়ে বিশ্বের বিপুল পরিসরে। তাই সে প্রেমের বেদনা অনেক ক্ষেত্রে অতি গভীর হলেও, বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ থাকায় তার তীব্রতা অসহনীয় হয়ে ওঠে না। মানুষের বিচিত্র-রঙা প্রেমানুভূতিকে বিশ্বপ্রকৃতির পট-ভূমিকায় স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ তাকে এক অভাবনীয় মহিমায় বিকশিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ-চিত্রিত প্রেমের এই আশ্চর্য sublimation-এর উৎস এক সুগভীর, সুদূর-চাওয়া romantic idealism, এবং এই idealism-এর মৌলিক প্রকৃতি স্পষ্টতই মিস্টিক্। দেহের রূপ ও ভঙ্গিমার বিচিত্র মাধুরী একে নিবিড়ভাবে জাগিয়ে তোলে; কিন্তু এই প্রেম তার পরম উপলব্ধির নিমেষগুলিতে জানে যে, বাঞ্ছিত প্রিয়দেহের নৈকট্য তার এই অনির্বচনীয় আকুতিকে কোনো মহৎ সার্থকতায় নিয়ে যেতে পারে না। সে জানে প্রিয়-দেহের উপস্থিতির মধ্যে, প্রিয়-চোখের চাওয়ায়, প্রিয়-মুখের কথার সুরে যে বিচিত্র অতীন্দ্রিয় মাধুরী-রস অসংখ্য রঙ, রেখা, গতি ও ধ্বনির মাধ্যমে আভাসিত হয়ে ওঠে, অন্তর্লোকে তার সূক্ষ্ম স্পর্শের অনুভবই তার পরম কাম্য। তার কাম্য দেহ নয়, দেহাশ্রিত রূপমাধুরী এবং রূপাশ্রিত রহস্যময় মাধুরী-রস। তাই বাইরের কাছে-আসা এই প্রেমাকৃতিকে এক সাময়িক নিবিড় তৃপ্তি দিলেও এই কাছে থাকার আধিক্য সেই বেদনা-ব্যাকুল বিস্ময়-বিভোর সৌন্দর্য-তৃষ্ণাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলুপ্ত করে তার বদলে এনে দেয় সাধারণ তৃপ্তি এবং অতৃপ্তি-মেশানো এক ধূসর দৈনন্দিনতা। তাই প্রেমকে তার সাধারণ পরিণতি—'sad satiety'—থেকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন দূরত্বের একটু ব্যবধান, কাছের মধ্যেও একটু ফাঁক, একটু অবকাশ, যার ভিতর দিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরের জোয়ার-ভাঁটার লীলাস্রোত স্বচ্ছন্দগতিতে আনাগোনা করতে পারে। প্রেমের অনেকটাই কল্পনার মোহনলীলা; তার মধ্যে এই কল্পনার সৃজনীস্রোত অব্যাহত থাকলে তবেই সে থাকে চিরবিস্ময়ভরা চিরনবীন হয়ে। এই চিরনবীনতাই প্রেমের কাম্য, প্রেমের পূজ্য। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের লীলাপ্রাঙ্গণে যে চিরনবীন প্রাণরস অম্লান রূপের নিত্যনতুন আবির্ভাবে প্রকাশিত, তারই আর এক চরম অভিব্যক্তি প্রেমের বিচিত্র আকুতিতে এবং প্রেমবাঞ্ছিত দেহরূপের অবর্ণনীয় মধুরিমায়। তাই শেষ পর্যন্ত, প্রেমের এই অকারণ ব্যাকুলতা বাঞ্ছিতের সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিফলিত

সেই বিশ্বব্যাপ্ত চিরনবীনেরই ধ্যান। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে মূলত এই রমণীয় সুদূরের ধ্যানরূপে দেখেছেন বলেই তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় প্রেমাভিজ্ঞতার দুটি মূল সুর: এক চির-অতৃপ্ত চেয়ে-দেখা এবং প্রিয় অন্তরের 'অগম, গোপন, গহন মায়ায়' এক অপরূপ অজানার অন্বেষণ। সব মিলিয়ে দেখলে রোমান্স ধর্মী কাব্যে, বিশেষত রবীন্দ্র-কাব্যে চিত্রিত এই প্রেমের মূল লক্ষণ হচ্ছে প্রেমিকমনের উপর তার একটি সূক্ষ্ম গভীর জাগরণী প্রভাব, যার স্পর্শ অন্তরকে এক অভূতপূর্ব আত্মচেতনায় বিভোর করে তোলে। এই যাদুস্পর্শে জেগে উঠে প্রেমিক যেন প্রেমিকার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় কোনো এক চিরপরিচিত অজানাকে, অস্তিত্বের কোনো এক চিরবাঞ্ছিত পরিপূরককে, যার স্পর্শে তার অন্তর নিবিড়তর চেতনায় জেগে উঠে বিশ্বলোকের পটভূমিতে নিজের উপস্থিতির অর্থটিকে[১] পরিপূর্ণভাবে অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম তাই তার বিচিত্র রূপলীলার ভিতর দিয়ে মানব-অন্তরকে এক গভীর বিশ্বমিলন-চেতনার পথে নিয়ে যায়। শেলি-ও মূলত এই পথেরই পথিক; কিন্তু শেলি-র যেখানে শেষ, রবীন্দ্রনাথের সেখানে সুরু। তাঁর বর্ণিত প্রেমাভিজ্ঞতার বিচিত্র ঐশ্বর্য এবং তাঁর প্রেমদৃষ্টির এই গভীর স্বচ্ছতা এবং পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য কাব্যের ইতিহাসে অতুলনীয়।

৩. মানবীয় প্রেমের চিত্রণে রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশিষ্ট দান, প্রেমের বিচিত্র ক্ষেত্রে নারীহৃদয়ের ভূমিকার অপূর্ব রূপায়ণ। প্রেমগাথায় অসাধারণ সমৃদ্ধ ইংরেজী কাব্যে কয়েকজন মাত্র মহিলা-কবির রচনায় আমরা নারীহৃদয়ের প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তি পাই।[২] সেগুলি নিঃসন্দেহে আধুনিক সভ্যতার পরম সম্পদ। কিন্তু পুরুষ-কবিদের রচিত ইংরেজী গীতিকাব্যে বিশেষ কোথাও আমরা নারীহৃদয়ের প্রেমাভিজ্ঞতার মহৎ চিত্রণ পাই না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। নারীর পূর্ণবিকশিত প্রেমকে তিনি সৌন্দর্যের চরম পরিণতি মনে করেছেন[৩] এবং তাঁর অসাধারণ সংবেদনশীল রোমান্টিক মন চিরন্তন নারীহৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় গহনে প্রবেশ করে তার প্রেমবেদনার নিবিড় আকূতিগুলিকে অতুলনীয়

১ এ অর্থ দর্শনসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত হোক্ বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। তখনকার মতো প্রেমিকের অনুভূতি-লোকে এই অর্থটি সত্য।

২ এঁদের মধ্যে এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং এবং ক্রিষ্টিনা রোসেটি প্রধান। এঁদের পরবর্তী স্তরে পড়েন অ্যালিস মিনেল এবং মেরী কোল্‌রিজ। এমিলি ব্রন্টিও অন্তত একটি প্রেমের কবিতা রেখে গেছেন যার মর্মান্তিক আবেদন অবিস্মরণীয়। কবিতাটির আরম্ভ: **Cold in the earth—and the deep snow piled above thee.**

৩ এই ভাবানুভূতি রূপায়িত হয়েছে "বিচিত্রিতা"-র 'পুষ্প' কবিতাটিতে।

শিল্প-সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছে। একই কবির কাব্যে পুরুষ ও নারী দু'পক্ষেরই প্রেমাভিজ্ঞতার এই মহৎ অভিব্যক্তি থেকে দুটি আপাতবিরোধী গভীর সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রথমটি হচ্ছে নারীর আবেগপ্রধান এবং পুরুষের কল্পনাপ্রধান প্রেমের প্রকৃতিগত এবং লীলাগত পার্থক্য। দ্বিতীয় সত্যটি এই যে, নারী ও পুরুষের প্রেমের মধ্যে এক অপরূপ ও অলজ্ঘ্য ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে তারা আশ্চর্যভাবে একতন্ত্রী। অমিত লাবণ্যকে যে কথা বলেছে[১], এবং কবি তাঁর বিভিন্ন গদ্য-রচনায় ও পত্রালাপে যে কথা বহুভাবে প্রকাশ করেছেন—নারী ও পুরুষের ভিন্নরীতি প্রেমের সেই মৌলিক একত্বের সত্য তাঁর অসংখ্য প্রেমকবিতার ব্যঞ্জনায় গভীরভাবে আভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেষ্ঠ প্রেমগাথাগুলি মানবহৃদয়ের বিচিত্র লীলাক্ষেত্রের উপর এক অসাধারণ কল্পনাশক্তির পাতনের ফল; এক অসাধারণ sensibility-র কম্পন থেকে এদের ভাব-ঐশ্বর্য এবং শিল্পরূপ দুই-ই উদ্ভূত। তাই মনে হয়, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের মন যত সংস্কৃত হতে থাকবে, সংকটোত্তীর্ণ জীবনের স্নিগ্ধতর পরিবেশে মানুষের অনুভূতি যতই পরিশোধিত হতে থাকবে, এই জাতীয় আর্টের আবেদনও ততই গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠবে।

৪. রবীন্দ্র-কাব্যের আর একটি পরম বিস্ময় তাঁর মিস্টিক, pantheistic অনুভূতির মানবিক রূপায়ণ। অসীমের স্পর্শানুভূতির নিবিড় চেতনা এর আগে কয়েকজন কবির রচনায়, বিশেষত ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও শেলি-র কাব্যে মর্মস্পর্শী সৌন্দর্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-এর Lines composed a few miles above Tintern Abbey এবং শেলি-র Adonais (বিশেষত শেষাংশ) এই শ্রেণীর মহত্তম রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে এই জাতীয় অনুভূতি অসংখ্য বৈচিত্র্যময় রূপে বাঁধা পড়েছে। শুধু তাই নয়, কবির এই অলৌকিক উপলব্ধির মুহূর্তগুলি প্রকাশিত হয়েছে আমাদেরই এই আনন্দ-বেদনাময় জীবনযাত্রার চির-পরিচিত সুরগুলির ভিতর দিয়ে। এক মহামানবীয় চেতনার রহস্যময় বিদ্যুৎ-ঝলক আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, আমাদেরই হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে,

---

১ 'আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসঙ্গত হয় নি। শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।' "শেষের কবিতা" পৃঃ ১১৪

আমাদেরই প্রাণের ভালাবাসার রঙে রঙীন হয়ে। তাদের অন্তরে গ্রহণ করতে আমাদের বিশেষ কোনো বাধা অতিক্রম করতে হয় না।

এরও মূলে আছে কবির হৃদয়ের সেই গভীর সত্য—তাঁর অন্তরের সহজাত প্রেম। উপনিষদের জীবনদর্শন তাঁর অন্তরে চিরসঞ্চারিত। তার সঙ্গে তাঁর বৈষ্ণবকাব্য-প্রভাবিত রোমান্টিক প্রকৃতি মিশে গিয়ে জাগিয়েছে এক সুগভীর অনুভূতি রঙীন অধ্যাত্মবিশ্বাস। কবি তাঁর চিরধ্যাত বিশ্বপ্রাণের আলোক-উৎসের স্পর্শ চেয়েছেন কোনো পূজা-অনুষ্ঠান বা আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে নয়, শুধু তাঁর অন্তরের সহজাত প্রেম দিয়ে। তাঁর এই অপূর্ব রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সমস্ত জগৎকে কল্পনা করেছেন স্রষ্টার লীলাময় প্রেমের অভিব্যক্তিরূপে; এবং সেই বিশ্বব্যাপ্ত মহাপ্রেমিকের সঙ্গে তিনি সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন শুধুই তাঁর জীবন-নিষ্কাশিত প্রেম দিয়ে। তাই কবির বিশ্বচেতনাভরা অধিকাংশ কবিতাতেই পাওয়া যায় মহত্তম মানবপ্রেমের চিত্রাবলী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবির শিল্পচেতনা যতই সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে, তাঁর এই অনুভূতিগুলির রূপায়ণ হয়ে উঠেছে ততই বেশী হৃদয়ধর্মী: তাদের শিল্পসৌন্দর্য পৌঁছেছে এক অত্যাশ্চর্য আভাসময়তায়। শুধুমাত্র মানুষের ইন্দ্রিয়-রঞ্জিত হৃদয়ানুভূতির আলোকে জীবনের এই মুগ্ধ-ব্যাকুল অর্থান্বেষণ এবং তার এই বিচিত্র রূপোন্মেষ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো কবির কাব্যে পাওয়া যায় না।

৫. রবীন্দ্রনাথের এই গভীর বিশ্বচেতনার অনুভূতিগুলির প্রকাশ আরো জীবন্ত, আরো ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে বিশ্বপ্রকৃতির জীবনোচ্ছল পটভূমির প্রভাবে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির এই সুদূরের চেতনার উৎস; তারই অগণ্য মায়াময় রূপের স্পর্শে কবির চিত্তে জ্বলে উঠেছে এই অলৌকিক চেতনার আলো। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসোজ্জ্বল pantheist মন টেনিসন-এর মত প্রকৃতিকে শুধু জীবনের এক অপরূপ রূপবর্ণময় পটভূমি হিসাবেই দেখে নি, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও শেলি-র মতো সে প্রকৃতির অসীম-বৈচিত্র্যময় অথচ অপরিবর্তনীয় রূপের মধ্যে দেখেছে বিশ্বপ্রাণের অবাধ রহস্যলীলা। পথপাশের নগণ্য বনফুল থেকে মহাকাশের বিপুল নক্ষত্রমালা পর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতির অসংখ্য রূপ কবির অন্তরে জাগিয়েছে এই অলৌকিক স্পর্শ-চেতনার প্লাবন। প্রকৃতির কত অগণিত রূপসমাবেশের স্পর্শে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কত অসংখ্য পরিস্থিতির প্রভাবে যে এই অতীন্দ্রিয় বিশ্বচেতনা হঠাৎ জেগে উঠে অভিনব শিল্পরূপের সৃষ্টি করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। গভীরতম অধ্যাত্মচেতনা রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে এসে পৌঁছেছে আমাদের প্রতিদিনের গৃহ-প্রাঙ্গণে, আমাদের

এই সুখদুঃখ-বিজড়িত জীবনের গভীর স্তরে স্তরে। আমাদের অন্তরের বিকশিত পূর্ণতায়, হৃদয়ের বেদনার্ত কঠিনতায়, জীবনের অপূর্ণ প্রয়াসে, প্রেমোপলব্ধির দুর্লভ মুহূর্তে, বর্ষা-শরৎ-বসন্তের চিরবিস্ময়ভরা রূপলীলার স্তরে স্তরে ধ্বনিত হয়েছে সেই গভীর উপলব্ধির রেশ। সৃষ্টি-উৎসবের তরঙ্গস্পর্শের এই প্রতিক্রিয়া যে শিল্পচেতনার কত বিচিত্র গতিপথে প্রবাহিত হয়েছে, কত অসংখ্য সুরে ধ্বনিত হয়েছে, কত মনোহর বর্ণসংকেতে চিত্রিত হয়েছে, সে কথা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই দান কাব্যের ইতিহাসে অনবদ্য এবং এখানেও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রোমান্টিকদের বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছেন।

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় লিরিক আর্টের ভিতর দিয়ে আমাদের এই দীর্ঘবিবর্তিত সভ্যতার সমস্ত জীবনদৃষ্টির মধ্যে যেন এক সূক্ষ্মতর অনুভূতি-স্পন্দনের সঞ্চার করে দিয়ে গেছেন। এই দিব্যদৃষ্টি মূলত আমাদেরই দেশের সুদূর অতীতের অর্ধবিস্মৃত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অসাধারণ মনীষাবলে আহরিত; কিছুটা বা বিদেশী সাহিত্যের চিন্তাধারার, বিশেষত ইংরাজী রোমান্টিক কাব্যের উদ্বেলিত প্রকৃতিপ্রেম এবং হৃদয়ধর্মিতার প্রভাবপুষ্ট। কিন্তু এই অমূল্য প্রভাবগুলি রবীন্দ্রনাথের মহৎ রোমান্টিক অন্তরের নিজস্ব ঐশ্বর্যের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে গিয়ে আবার জেগে উঠেছে এক অভূতপূর্ব রসসৃষ্টির অমৃতজ্যোতিতে। এই শান্তগভীর রসদৃষ্টি মুহূর্তে মুহূর্তে বিশ্বজগৎ ও জীবনের এক অপরূপ মর্মস্পর্শী ভাষ্য রচনা করেছে মানব-অন্তরের গভীরতম স্পন্দনগুলির বিচিত্র ঐকতানের সুরে। এই দৃষ্টি তাই মানুষের অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের মধ্যে মানুষেরই হৃদয়ানুভূতির অজস্র উপকরণ দিয়ে এক মহান্ সেতু রচনা করেছে। এই হিসাবে, তাঁর অন্তঃপ্রেরণতির মহত্তম উৎস উপনিষদের যা চরম উপলব্ধি—মানবাত্মা ও মহাবিশ্বের সেই গভীর একত্বের বাণীকেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের হৃদয়াভিজ্ঞতার বিপুল ক্ষেত্রে বপন করে সেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের ফসল ফলিয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যে চিত্রিত মানবিক প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, আধ্যাত্মিক আকুতি—সব কিছুর মধ্যেই আছে এক আত্মপ্রসারণের ব্যাকুলতা—যে প্রসারণ মানুষের অন্তঃশক্তিকে ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ অবরোধ থেকে মুক্তি দেয় বিশ্বপ্রেমের, বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন ব্যাপ্তিলোকে। এই দৃষ্টির স্পর্শে তাই সমস্ত জগৎ যেন শেষ পর্যন্ত শুধু মানুষেরই অন্তরের এক অবর্ণনীয় স্পন্দনলীলায় পরিণত হয়। কোথায়, কোন দৃষ্টিপথে শেষ সত্যের সন্ধান আছে কে জানে। কিন্তু এক পরম-মহিমায় বিশ্বদৃষ্টিকে যিনি জীবনের বিচিত্র অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাকে চিরন্তন মানবিক আবেদনে অভিষিক্ত করেছেন, তিনি

নিঃসন্দেহে মহত্তম শ্রেণীর শিল্পী।' মহৎ চিন্তাধারার এই বিচিত্র অনুভূতি-রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্যের মহান্ দার্শনিক কবি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ-কেও বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন।

৬. কিন্তু আর সব কিছুর চেয়ে আশ্চর্য বোধ হয় রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতির সামগ্রিক ভূমিকা। প্রকৃতির বিচিত্র রূপের স্পর্শানুভূতির এই অপূর্ব ঐশ্বর্যময় শিল্পচিত্রণ কাব্যের ইতিহাসে অনন্য। এর অতল গভীরতা, অপরিমেয় বৈচিত্র্য এবং অনুপম চিত্রণ-মাধুরী সামগ্রিক শিল্পমূল্যে আগেকার যাবতীয় প্রকৃতি-কাব্যকে অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে গেছে। মানব-অন্তরে প্রকৃতির গভীর-সঞ্চারী প্রভাবের এই অপরূপ সুষমাময় প্রকাশের মূলেও আছে সেই একই রহস্য-গভীর মিস্টিক্ চেতনার সঙ্গে প্রেমধর্মী অন্তরের রোমান্টিক সৌন্দর্যতৃষ্ণার মিলন। এরই ফলে সমস্ত রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা পাই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির প্রাণের একটি নিবিড় সংযোগ এবং এই সংযোগ-প্রসূত এক বহুমুখী ভাববিনিময়ের ধারা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাব সর্বব্যাপী। তাঁর ভাবাভিজ্ঞতার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয় নি। মোটের ওপর রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকাকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ফেলা যায়:

প্রথমত, কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি অনন্তের অবারিত লীলাভূমি, রহস্যময়, বিশ্ববাণীর অফুরন্ত আনন্দরূপ। যে আনন্দরস মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একান্ত সীমাবদ্ধ, তারই অসীম-বৈচিত্র্যময় লীলার আবর্তন কবি প্রকৃতির অবাধ প্রাঙ্গণে দেখেছেন। কত অসংখ্যবার প্রকৃতির কত বিচিত্র রূপ, কখনও বা বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত দৃশ্যপটটি, এক অলৌকিক প্রাণশক্তির আলোকস্পন্দনে সজীব হয়ে উঠে তাঁর অন্তরকে আহ্বান করেছে বিচিত্র সুরে। এই রোমান্টিক বিশ্বমর্মিতার মূল সুরটি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ, শেলি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একই, এবং আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ-ই নিঃসন্দেহে এই মহৎ দৃষ্টিপথের প্রথম পথিক।[১] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবনের ক্ষেত্রে এই চেতনার যে বিপুল বিস্তার, অন্যান্য অনুভূতির সঙ্গে এই মিস্টিক চেতনার যে বিচিত্র অন্তর্বয়ন এবং এই সব অতিসূক্ষ্ম মিশ্র অনুভূতির যে অপূর্ব সৌন্দর্য রূপায়ণ পাওয়া যায়, পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে তা বিরল।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতি মানবজীবনের এক বিচিত্র-সৌন্দর্যময়, চির-সজীব পটভূমি, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এক চির গতিশীল অথচ

১ অবশ্য ব্লেক-এর তীব্র অথচ অপরিণত মিস্টিক বিশ্বদৃষ্টিকে বাদ দিলে।

চির-অপরিবর্তনীয় আবেষ্টনী। এই প্রাণোচ্ছল পরিবৃতি ঋতুতে ঋতুতে নতুন নতুন রূপ ধরে এসে মানুষের সজীব অন্তরে বিচিত্র আনন্দ-বেদনার স্পন্দন জাগায়। কালিদাসের কথা মনে রেখেও অনায়াসেই বলা যায় যে মানুষের অন্তরে ঋতুরঙ্গের এই আনন্দ-মাতনের সাড়া এমন অপরূপ বৈচিত্র্যের সুরে আর কোনো কবির কাব্যে ধ্বনিত হয় নি। প্রকৃতির রূপচিত্রণ এবং মানুষের অন্তর্গহনে প্রকৃতির সূক্ষ্ম-সঞ্চারী প্রভাবের রস-রূপায়ণ — এই দুটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ সভ্য মানুষকে অবিস্মরণীয় এবং অতুলনীয় সম্পদ দিয়ে গেছেন।

তৃতীয়ত, প্রকৃতির মধ্যে কবি পেয়েছেন ভাবপ্রবণ মানবমনের উদ্বেলিত বাণীর এক অফুরন্ত সংকেতভাণ্ডার। এক গভীর এবং অতিসূক্ষ্ম জীবনচেতনার শিল্পরূপায়ণে প্রাকৃতিক চিত্রাবলীর এই অপূর্ব প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। এই প্রবণতা অবশ্য রোমান্টিক অন্তরে সহজাত এবং শেক্‌স্‌পীয়ার, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্‌, টেনিসন্‌, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবিরা অবশ্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ। কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ভাবলীলার আভাস-চিত্রণে এবং ব্যবহৃত imagery-র বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় আর সকলকেই ছাড়িয়ে গেছেন।

(৭) রবীন্দ্রনাথের লিরিক রচনার আর একটি অমূল্য সম্পদ তার অন্তরের এক অতলস্পর্শী আত্মচেতনার সুর। লিরিক আর্টের মধ্যেই শিল্পী-ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষতম প্রকাশ। আশ্চর্য রকমের নৈর্ব্যক্তিক নাট্যকবি শেক্‌স্‌পীয়ার-এরও খাঁটি লিরিক রচনাগুলিতে এই লক্ষণ ধরা পড়ে। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সনেটগুলি প্রেমব্যাকুলতা, বন্ধুপ্রীতি, বন্ধুবিচ্ছেদ-আশংকা, জাগতিক অবিচারের তীব্র নৈরাশ্য-চেতনা এবং নিজের রচনার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস প্রভৃতি কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির অভ্রান্ত পরিচয় বহন করে। মিল্‌টন-এর অল্পবয়সের এবং মধ্যজীবনের রচনায় পাওয়া যায় এক অটল অধ্যাত্মবিশ্বাস এবং আপনার মহৎ কবি-সম্ভাবনা সম্পর্কে কবির সুগভীর দায়িত্ব-চেতনা। শেলি-র সদাচঞ্চল, অধীর আদর্শোন্মুখ মনের সুস্পষ্ট ছাপ আছে তাঁর কবিতায়। এই ধরণের এক কেন্দ্রীয় আত্মচেতনার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় বিভিন্ন কবির লিরিক কাব্যে। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে ধ্বনিত আত্মচেতনার সুরটি গভীরতা, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য — সব দিক দিয়েই তুলনাহীন। সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোন কবির মধ্যে আপন অন্তরের দুজ্ঞেয় সংগঠন এবং ক্রমবিবর্তনের রহস্য সম্বন্ধে এই বেদনা-বিহ্বল, বিস্ময়-বিভোর সচেতনতা দেখা যায় না। এই চেতনার বিচিত্র বিক্ষেপ রবীন্দ্রকাব্যের মহত্তম সুরগুলির অন্যতম, এবং কাব্যাভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এদের মৌলিকতা চমকপ্রদ।

কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী এই সুগভীর আত্মচেতনা তিনটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রথমতঃ, এই আত্ম-অনুভূতির সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায় কবির অন্তরের এক রহস্যময় দ্বৈত-চেতনায়। অন্তর্লোকের এই বিচিত্র duality-র, এই অনির্দেশ্য জোয়ার-ভাঁটার উদ্বেল চেতনা বার বার কত অসংখ্য রসমধুর ভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে হয়ে উঠেছে "চিত্রা" যুগের কয়েকটি অর্ধ-পরিণত রচনায় এবং "পূরবী" ও পরবর্তী পর্যায়ের কয়েকটি মহৎ সৃষ্টিতে। বাউল জাতীয় কয়েকটি রচনায় এবং পরিণত কালের বহু গানেও আভাসিত হয়েছে কবির এই প্রচ্ছন্ন বাণীসত্তার পরিচয়। অন্তরের অনির্দেশ্য প্রেরণাশক্তির এই ব্যাকুল পরিচয়-প্রয়াস রবীন্দ্রকাব্যে এনে দিয়েছে এক আশ্চর্য দার্শনিক অন্তরান্বেষণের সুর।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের পরিণত রচনায় পাওয়া যায় আপনার কবি-পরিচয় সম্বন্ধে কবির এক সুগভীর পুলক-চেতনা। তিনি যে মূলত শুধুই কবি, বিশ্বের বিচিত্রকে আপনার অন্তরে গ্রহণ করে তাকেই আবার ব্যক্তিত্ব-রঞ্জিত নব-আভাসোজ্জ্বল রূপ দেওয়াই যে তাঁর একমাত্র কাজ—এই আনন্দচেতনা বার বার তাঁর কাব্যে অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে। বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্যের জটিলতা থেকে নিজস্ব শিল্পজগতে ফিরে এসে তিনি বার বার আপনার কবিসত্তাকে নতুন করে আবিস্কার করেছেন এবং সেই আত্ম-অভিনন্দনের পুলককে বিচিত্র সৌন্দর্যের মালায় গেঁথে রেখে গেছেন।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়, আপনার অন্তরের অশান্ত পরিবর্তন সম্বন্ধে কবির এক সুগভীর সচেতনতা। যতই দিন গেছে তাঁর মনের অনিবার্য গতিশীলতা সম্বন্ধে কবি ততই নিবিড়ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন। নিজের চির-বিবর্তনশীল সত্তার এই গভীর উপলব্ধি কবির পরিণত রচনায় এনে দিয়েছে এক স্নিগ্ধ-মধুর আত্মপ্রত্যয়ের সুর। তিনি আপনার অন্তরের প্রচ্ছন্ন বাণী-উৎসকে চিনেছেন সৃষ্টির অম্লান নবীনের এক প্রতিমূর্তিরূপে এবং সেই চেনার অসীম পুলককে ব্যক্ত করেছেন অপরূপ সৌন্দর্যের ভাষায়। আপনার অন্তরের এই অজর তারুণ্যের আনন্দচেতনা এবং সেই চেতনার এই মনোরম শিল্প-রূপায়ণ পৃথিবীর আর কোনো কবির ক্ষেত্রেই ঘটেনি। নিজের জন্মদিনকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ যে সুন্দর কবিতা ও গানগুলি রচনা করে গেছেন সেগুলি — বিশেষত "পূরবী"র মহাবিস্ময়কর 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি[১]—

১ এই কবিতাটি থেকেই রবীন্দ্রনাথ আশীবছর বয়সে তাঁর জীবনের শেষ গান 'হে নূতন' রচনা করেন। কবির অন্তরের চির-নবীনতার এর চেয়ে বিস্ময়কর সাক্ষ্য আর কী থাকতে পারে?

এক মহৎ এবং অভ্রান্ত আত্মচেতনার চরম পরিচয় বহন করে। ইতিহাসে আর কোন কবি আপনারই অন্তরের লীলাবৈচিত্র্যে এমন আশ্চর্যভাবে অনুপ্রাণিত হন নি। কীটস্ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-এর দার্শনিক কাব্যকে আখ্যা দিয়েছিলেন egotistical sublime; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই sublimity এক অভাবনীয় পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে।

(৮) আর একটিমাত্র বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের লিরিক কাব্যের মূল সুরগুলির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করব। রবীন্দ্রকাব্যের সুদীর্ঘ এবং অবিচ্ছিন্ন বিবর্তনের কথা আমরা জানি। এই ধরণের আশ্চর্য ঘটনা আর কোন কবির ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে মনে হয় না। এই বিবর্তনের অন্তত আরো একটি বিশেষত্ব যে সাহিত্যের ইতিহাসে একেবারেই অনন্য তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েক বছরের রচনার এক আশ্চর্য শিল্প-পরিণতি। কবির এই পর্যায়ের রচনায় পাওয়া যায় দৃষ্টির এক অপরূপ স্নিগ্ধোজ্জ্বলতা, এক অপূর্ব mellowness যার মধুরতার কোন তুলনা নাই। এই সব ক্ষেত্রে এক গভীর শিল্পচেতনার অলক্ষ্য প্রভাবে কবির পরিণত অভিজ্ঞতার ধ্যানমূর্তিগুলি পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটে উঠেছে এক সূক্ষ্মসংকেতময় আর্টের মায়াময় বুননে। এই আর্ট এতই গভীরভাবে ইঙ্গিতময় যে একে যেন ধরেও ধরা যায় না, এর সূক্ষ্ম ভাবসূত্রগুলি imagery এবং ধ্বনিসমন্বয়ের অপরূপ কারুকার্যের মধ্যে এমনই নিবিড়ভাবে আভাসিত যে এ যুগের কাব্যতত্ত্বান্বেষীরা এখানে হয়তো কিছুই খুঁজে পাবেন না। এই অপূর্ব রচনাগুলি যেন কতগুলি অব্যক্ত ভাবাভাসের রঙীন তরঙ্গরেখা; তাদের কাঁপনের ঝিলিমিলিতে, তাদের অপরূপ গতিভঙ্গির মধ্যেই তাদের গভীর অর্থের দ্যোতনা।

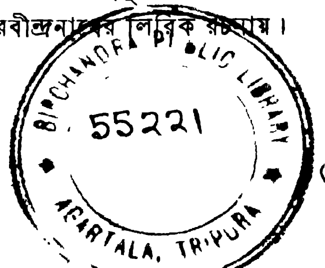
রবীন্দ্র-প্রতিভাকে ঠিকভাবে বোঝার জন্যই অবোধ উচ্ছ্বাসের বাষ্পজাল থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন, কাব্যের জগতেও রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি মানবজীবনের সব ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়নি, সমগ্র সাহিত্যের জগতে তো নয়ই। ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের ব্যাপক বাস্তবতা তাঁর নয়। তাই সাহিত্য-সাধনার ঐ-সব ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্রমুখী প্রতিভা বহু সাফল্য লাভ করলেও সে-সব সাফল্য কখনই তাঁর কাব্য, গান বা ছোটো গল্পের মতো অলৌকিক সার্থকতার স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। তাঁর অধিকাংশ নাটকেরই সংলাপ দৈনন্দিনতার মাপকাঠিতে অস্বাভাবিক। তাঁর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসগুলি ভাবশাসিত এবং কাব্যময়; তাদের মধ্যে বাস্তবের স্বাদ অত্যন্ত ক্ষীণ। "শেষের কবিতা"-র মত অপূর্ব কাব্যধর্মী রোমান্স

একমাত্র তিনিই লিখতে পারতেন ; কিন্তু War and Peace বা "কৃষ্ণকান্তের উইল" তাঁর ক্ষমতার সীমার বাইরে। নৃত্যনাট্য "শ্যামা" বা নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা" তাঁর অনন্য প্রতিভার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার বা ইবসেন্-এর মহত্তম নাটকগুলি তাঁর শক্তির অতীত। 'স্বপ্নমঙ্গল' বা 'জুতা আবিষ্কার'-এর মত কয়েকটি চমৎকার ব্যঙ্গকবিতা তিনি লিখেছিলেন ঠিকই ; কিন্তু Absalom and Achitophel বা Don Juan বা The Bishop orders his tomb at St. Praxed's Church তাঁর এলাকার বাইরে। এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতাগুলিও অনেকাংশেই লিরিকধর্মী।

এই সসীমতাই তাঁকে নিজের ক্ষেত্রে করেছে অনন্য। সাধারণ, দৈনন্দিন বাস্তবের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা তার উপজীব্য পায়নি। তিনি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-অন্তরের কবি ; অন্তর্চেতনার আলোছায়া-বিচিত্রিত স্তরে স্তরে তাঁর বিচরণ। তাই মনের অতি সাধারণ স্তরগুলিও তাঁর মনোযোগের বিষয় নয়। লোভ, ঐশ্বর্যবাসনা, যশাকাঙ্খা, কামুকতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সাধারণ অপরাধপ্রবণতা বা সাধারণ দারিদ্র তাঁর দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রে আসতে পারেনি। তিনি মানুষের মনের সেই-সব স্তরের ছবি এঁকেছেন যেখানে সে পরমাশ্চর্য, যেখানে সে অনির্বচনীয় সুন্দর, যেখানে সে অসংখ্য অপূর্ণতা সত্বেও অপরিসীম মহৎ ; যেখানে সে সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রতীক। জীবনক্ষেত্রের অসংখ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মিশ্র কোলাহলকে তিনি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার কথা ও সুরে অসীম সৌন্দর্যের সংকেতে ব্যঞ্জিত হয়েছে মানুষের হৃদয়ের সেই চিরন্তন আন্দোলনগুলি, পৃথিবীর সেই 'পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলি' যারা 'পরম নম্র, চোখে পড়তে চায়না' যারা, 'হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায় অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে মরেনা,' যাদের 'গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরে নাড়ীতে নাড়ীতে।'[১] যে সব বিচিত্র পরিস্থিতি নিমেষের প্রভাবে জীবনের রঙ দেয় বদলে, অনুভূতির সাগরে আনে বিপুল জোয়ার বা নিদারুণ ভাঁটা, লুপ্ত স্মৃতির ম্লানপটে এঁকে দেয় নতুন বেদনার অস্তরাগ, সুপ্ত জীবনকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলে একটি অপরূপ বেদনার ঝংকারে, একটুখানি রঙ ও রেখার স্পর্শে কল্পলোকে জাগায় উৎসবের মাতন; বিশ্বরূপের কোনো এক মুহূর্তের ইশারায় বিমুগ্ধ অন্তরকে ডেকে নিয়ে যায় সীমাহীন সুদূরের অভিসারে — তাদেরই রস-রূপান্তরিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লিরিক রচনায়।

---

১ "শেষের কবিতা" ৭৭ পৃষ্ঠা।


BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
55221
AGARTALA, TRIPURA

আপাত-সসীম এই অসীম জগৎই গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের জগৎ। এই জগতের অপরিমেয় ঐশ্বর্যকে তিনি তাঁর প্রতিভার যাদুবলে আমাদের সামনে স্তরে স্তরে মেলে ধরেছেন। আগেকার লিরিক কবিরা আমাদের অনেক দিয়েছেন। কিন্তু এত যে বাকি ছিল তা কে জানত? শুধু তাই নয়, যে অনুভূতি-বেদনার বিচিত্র সত্যকে বার বার প্রত্যক্ষ করেছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অগ্নিময় অভিজ্ঞতালোকে, তার মধ্যেও যে নিবিড়তর সত্যের এত অজস্র সম্ভাবনা লুকিয়েছিল তাই বা কে জানত? কে ভেবেছিল কোনো অলৌকিক প্রতিভার অঙ্গুলিস্পর্শে এই অখ্যাত ভাষার কয়েকটি বৈচিত্র্যবিরল সূত্র থেকে এত অনায়াসে গড়ে উঠতে পারে এক বিশ্বজয়ী সৌন্দর্যের মায়াজাল?

লিরিক আর্টের সাধনায় মানুষ রত আছে সভ্যতার প্রত্যুষ থেকে। প্রতিটি প্রাচীন সাহিত্যের সূচনা হয়েছে সরল প্রাণময় কাব্যরচনার ভিতর দিয়ে। এই প্রেরণায় নিহিত আছে মানব-প্রকৃতির গভীর মর্মবাণী। আজ কয়েক হাজার বছর পরে আধুনিক সভ্যতার বিপুল অগ্রগতি এবং অগণ্য বৈপরীত্যের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের হাতে এই প্রেরণা তার চরম সার্থকতার তীর্থে এসে পৌঁছল।[১] এই তীর্থসংগমে এসে ভেঙে গেছে বহু অলীক বাধা; সুদূরতম মিস্টিক্ চেতনার দীপ্তি এসে মিশে গেছে হৃদয়ের সুখদুঃখের ঝলকগুলিতে; ইন্দ্রিয়চেতনার অজস্র রঙীন ইঙ্গিত অসংখ্য ধারায় বয়ে এসেছে আত্মানুভূতির অতল সমুদ্রে; মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের হৃদয়ে বাঁধা পড়েছে নিবিড়তর, সূক্ষ্মতর ভাববন্ধনে; চেতনার গভীর কেন্দ্রে যা ছিল বাণীর প্রচ্ছন্ন আভাস তার অমর রূপায়ণ হয়েছে স্পষ্ট আভাসোজ্জ্বল শিল্পরূপে।

১ এখনকার মত তাই। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পথে নতুন সার্থক শিল্পসৃষ্টি এখন বড়ই কঠিন। কিন্তু তার মানে অবশ্যই এই নয় যে রোমান্টিক লিরিক কাব্যের সম্ভাবনার এখানেই শেষ। এ সম্ভাবনার কোথায় শেষ তা কেউ জানে না, এবং সভ্যতার অভাবনীয় বিবর্তনের স্রোতে নতুন-সব শেলি, কীট্স—রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কিছুই বিচিত্র নয়।

রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের ক্রমবিবর্তন

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি আজ সভ্যজগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত। এমন কোনো দেশ নাই যেখানে তিনি এ যুগের একজন মহামানব হিসাবে সমাদৃত নন। শুধু নোবেল-পুরস্কার বিজয়ী বলে নয়, আধুনিক যুগের একজন মহান আদর্শবাদী চিন্তানায়ক হিসাবেও তিনি সমস্ত পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধেয়। পশ্চিম সভ্যতার প্রাঙ্গণে তাঁর যাদুময় ব্যক্তিত্বের পুনঃপুনঃ আবির্ভাব এবং বিচিত্র কর্মানুসরণ সেদিনের মনীষীদের মনে এক উজ্জ্বল স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি করেছে। তাঁর মহোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের এই নিবিড় প্রভাবের অভ্রান্ত পরিচয় আছে তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত The Golden Book of Tagore-এ সংকলিত বিশ্বমনীষীদের অকুণ্ঠ স্তুতিবাণীতে।

কিন্তু পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে, একজন মহত্তম শ্রেণীর poetic artist হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় পশ্চিম সভ্যতা আজও জানে না। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর একজাতীয় ভাবধারার মহত্বই পাশ্চাত্য মনীষীদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। তাঁর অসাধারণ শিল্প-কুশলতার কথা, তাঁর অসীম-বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিচয় তাঁরা আজও প্রায় কিছুই জানেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত একজন মহান্ অধ্যাত্মবাদী কবি হিসাবেই জানেন; মানব-অন্তরের বিচিত্র বেদনালীলার রূপসাধক হিসাবে তাঁর যে শ্রেষ্ঠ পরিচয় তা তাঁদের কাছে অনেকটাই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বিশ্বমানবের শিল্প-সাধনার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর চরম দানের মূল্যায়ন আজও প্রায় আরম্ভই হয় নি। এই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ পরিচয় অবশ্য খুবই স্বাভাবিক; কারণ, ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" এবং আর কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল অনুবাদ-গ্রন্থের ভিতর দিয়েই[১] কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যা কিছু পরিচয়; এবং এই জাতীয় পরোক্ষ পরিচয় একান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনেকাংশেই ভ্রান্ত না হয়ে যায় না।

---

১ আমার ধারণা, ইংরাজী Gitanjali-র ক্যাব্যোৎকর্ষ কবির আর কোন ইংরাজী অনুবাদগ্রন্থে নেই। কাব্যসৌন্দর্যের দিক দিয়ে Gitanjali-র পরেই পড়ে Chitra ("চিত্রাঙ্গদা") নাটিকাটি। তার পরেই আসে Lover's Gift and Crossing নামক কাব্যগ্রন্থটি। The Gardener, Fruit gathering, Crescent Moon ইত্যাদি আর যে সব অনুদিত কাব্যসঙ্কলন Gitanjali-র কিছু পরেই অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়, আমার ধারণা, সেগুলি কবি প্রকাশ না করলেই ভাল করতেন। Gitanjali-র অপূর্ব সৌন্দর্যরসে পুলকিত পাশ্চাত্য রসিকদের মনে পরবর্তী অনুবাদ-গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই রীতিমত হতাশা ও সন্দেহ জাগায়।

কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের দেশে, রবীন্দ্রনাথের ভাষাভাষীদের মধ্যেও কবির এই শিল্পী-পরিচয় আজও রীতিমত অপরিস্ফুট। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের যে পরিণত রচনাগুলি আর্ট হিসাবে উজ্জ্বল সার্থকতায় উত্তীর্ণ, সেগুলির সঙ্গে তাঁর যে সব রচনা অনেকাংশেই অসংহত ভাবাবেগের বিক্ষেপ বা অনুভূতিহীন তত্ত্বচিন্তার নিষ্প্রাণ অলংকরণ—সেগুলিকে শোচনীয়ভাবে মিশিয়ে ফেলা হয়। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রকাব্যের প্রচলিত সমালোচনায় প্রায়ই দেখা যায় শুধুই কবির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর একঘেয়ে বিশ্লেষণ এবং তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বরাজির বিচার। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র অন্তরাভিজ্ঞতা কোথায়, কী ভাবে এবং কী পরিমাণে সার্থক শিল্পরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং কোথায় তা হয়নি তার বিশেষ কোন খবর আমরা রাখিনা। আমরা প্রায়ই ভুলে থাকি যে কাব্য দার্শনিক তত্ত্বের সাড়ম্বর প্রকাশ নয়, স্পর্শকাতর মানব মনের রূপ-সংহত অনুভূতিবাণী। ক্রোচে-র মতে কাব্যের এই অনুভূতি, এই feeling—'is altogether converted into images, into this complex of images' অতএব এই image-মালার মধ্যেই, এই রূপ-পরিণতির ভিতরেই আর্টের স্বরূপকে খুঁজতে হবে। এই সুচারু, সূক্ষ্মশক্তিময় প্রকাশ ব্যতিরেকে মহত্তম তত্ত্বজ্ঞান বা ভাবানুভূতিরও কিছুমাত্র কাব্যমূল্য নাই।

কবির কাজ জীবনের স্পর্শে জেগে ওঠা বিচিত্র রসানুভূতিকে মূর্ত করে তোলা শব্দসমন্বয়ের সংগীতে, কথার সূক্ষ্ম-ইঙ্গিতময় বিন্যাসে। প্রকাশের এই গভীর-সংকেতবাহী পরিপূর্ণ রূপটিকে গড়ে তোলাই কবির ভাবাতুর সত্তার পরিপূরক, তাঁর কারুশিল্পী সত্তাটির কাজ।[১] কবির স্পর্শকাতর বেদনা-উচ্ছল সত্তার কাঁপনে যখন বহুবর্ণ রসানুভূতির সূত্রগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে উঠে আসে তখন তাঁর রূপপিয়াসী শিল্পীসত্তাটি তার নিপুণ অঙ্গুলীর অলক্ষ্য বুননে সেগুলিকে গেঁথে ফেলে অপরূপ রূপের পরিপূর্ণতায়। কবির অন্তরের বিচিত্র ঐশ্বর্যের এই যে সুললিত, সুসংবদ্ধ, সূক্ষ্ম-সংকেতময় প্রকাশ, এর সমস্ত গূঢ় দায়িত্ব তাঁর এই রূপখেয়ালী শিল্পীসত্তার।

সার্থক কাব্য অবশ্য এক অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তু। তার প্রকাশরূপের মধ্যে কবির অন্তরের রসানুভূতিটি সম্পূর্ণভাবেই রূপান্তরিত হয়। তাই সে অবস্থায় তার মধ্যে ভাব ও রূপের, বাচ্য ও বাচকের কোন সত্যিকারের প্রভেদ থাকতে পারে না। কাব্য যে একটি অখণ্ড রসমূর্তি — অনুভূতির এই মূল সত্যটি মনে রেখে

১ বলা বাহুল্য, কবিমানসের এই দ্বিত্বকে আমি কোন মনস্তাত্ত্বিক সত্য হিসাবে দেখাতে চাইনি। কাব্যসৃষ্টির মুহূর্তে কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বটিই সম্ভবত এক অনির্দেশ্য, অখণ্ড প্রক্রিয়ায় রত হয়। এখানে কবি-ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈতের উল্লেখ নেহাৎই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য।

অবশ্য বাইরের দিক থেকে বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে তার রূপসংগঠনকে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেভাবে দেখলে স্বভাবতই দেখা যায় যে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির দুটি দিক আছে—তার ভাবলোক বা অনুভূতিলোক এবং তার শিল্পরূপায়ণ — আই. এ. রিচার্ডস্ যাকে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় বলেছেন experience এবং তার communication, এবং ক্রোচে যাকে দেখিয়েছেন feeling এবং image-মালার দুটি আপাতভিন্ন উপাদান হিসাবে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দুটি element-এরই গভীর গুরুত্ব,—কোনটিরই তাৎপর্য কম বলা যায়না। উচ্চাঙ্গের শিল্পকীর্তির মধ্যে এই দুটি উপাদানের পরিপূর্ণ সমন্বয় দেখা যায় — যেখানে এক মহৎ এবং নিবিড় ভাবাভিজ্ঞতা এক উজ্জ্বল, সুসংহত, গভীর-আবেদনময় সৌন্দর্যরূপে আভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে কাব্যসৃষ্টির মধ্যে অন্তরাভিজ্ঞতার চেয়ে তার রূপায়ণের, content-এর চেয়ে form-এর তাৎপর্য অনেক বেশী। তার সুস্পষ্ট কারণ এই যে কাব্য বা আর্ট মানেই অনুভূতির এই সফল সঞ্চারণ, এই communication; এবং অনুভূতির এই সংক্রমণকেই টলস্টয় আর্টের প্রাণ বলেছেন। কবির অন্তরে যে অভিজ্ঞতাই বিরাজ করুক না কেন, তার সার্থক রূপভাষণ যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তার কাব্য বা আর্ট হিসাবে কোন অস্তিত্বই নেই। এই সত্যেরই অতিরঞ্জিত ভাষণ আছে ব্রাউনিং-এর সুপরিচিত পংক্তিগুলিতে :

What does it all mean, poet ? Well,
Your brains beat into rhythm, you tell
What we felt only.........
And pace them in rhyme. so side by side.

আর্টের মূল লক্ষণই হচ্ছে প্রকাশের এই যাদু। এই যাদুবলে শুধু কবির নিগূঢ় ধ্যানদৃষ্টির মুহূর্তগুলিই নয়, তাঁর অপেক্ষাকৃত লঘু, চপল, তুচ্ছ অভিজ্ঞতাও মনোহররূপে অভিষিক্ত হয়ে আমাদের বিচিত্র আনন্দ দেয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকবি শেক্স্পীয়ার-এর অসীম-বৈচিত্র্যময় রচনাবলী থেকেই বিভিন্ন স্তরের এবং মূল্যের ভাবপুষ্ট, অথচ নিখুঁতভাবে রূপায়িত কাব্যাংশের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রথমে স্মরণ করা যাক তাঁর The Tempest নাটকের অন্তর্গত কয়েকটি চিরস্মরণীয়

পংক্তি, যেখানে এক অতল-গাম্ভীর্যময় ভাবাভিজ্ঞতার রূপায়ণ হয়েছে অনবদ্য, অনতিক্রমণীয় শিল্পসৌন্দর্যে :

You do look, my son, in a moved sort.
As if you were dismay'd : be cheerful. sir :
Our revels now are ended : these our actors
As I foretold you, were all spirits, and
Are melted into air, into thin air :
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces.
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve.
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind : We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep·········

Measure for Measure থেকে নেওয়া পরবর্তী দৃষ্টান্তটিতে কোনো মহৎ দার্শনিক অনুভূতির পরিচয় নেই ; আছে এক পরিত্যক্তা প্রেমিকার ব্যাকুল অন্তরাক্ষেপ। কিন্তু এখানেও সেই নিবিড় আবেদনময় রূপসৃষ্টির অবর্ণনীয় যাদু :

Take, O take those lips away,
    That so sweetly were forsworn ;
And those eyes, the break of day,
    Lights that do mislead the morn :
But my kisses bring again,
                Bring again ;
Seals of love, but seal'd in vain,
                Seal'd in vain.

আবার Othello থেকে নেওয়া পরের দৃষ্টান্তটিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মনোভাবের প্রকাশ ; এক সাক্ষাৎ শয়তানের মুখে আর একজন সরল উদার মানুষের মনে ঈর্ষার

অমোঘ গরল সঞ্চারিত করে দেওয়ার পৈশাচিক পুলক। কিন্তু এরও রূপায়ণ চরম সার্থকতায় উপনীত হয়েছে :

…Not poppy, nor mandragora.
Nor all the drowsy syrups of the world,
Shall ever medicine thee to that sweet sleep
Which thou ow'dst yesterday.

আবার এর পরেই আমরা লক্ষ্য করব The Tempest থেকে উদ্ধৃত চিন্তাভারহীন খেয়ালের পাখায় ওড়া দুটি fairy song. এদেরও মধ্যে কিন্তু communication-এর বা রূপভাষণের সেই যাদু কিছু কম পরিস্ফুট নয় :

Where the bee sucks, there suck I :
In a cowslip's bell I lie :
There I couch when owls do cry,
On the bat's back I do fly
After summer merrily :
Merrily, merrily, shall I live now,
Under the blossom that hangs on the bough.

Full fathom five thy father lies :
Of his bones are coral made ;
Those are pearls that were his eyes :
Nothing of him doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange,
Sea-nymphs hourly ring his knell :
Hark now I hear them,—ding dong bell.

একই লেখকের রচনা থেকে নির্বাচিত এই দৃষ্টান্তগুলির ভিতরে অভিজ্ঞতাগুলি অবশ্যই বিভিন্ন স্তরের এবং মূল্যের। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার-এর অসাধারণ শিল্পকুশলতায় তার বিশেষ তাৎপর্য, মূল্য এবং আবেদন অনুযায়ী এক একটি বিশিষ্ট এবং নিখুঁত প্রকাশরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পংক্তিগুলির গতিচ্ছন্দ,

শব্দসমাবেশ এবং image-প্রয়োগ—সমস্তই অভিজ্ঞতাটির প্রয়োজনের তাগিদে এক সূক্ষ্ম-সুন্দর দেহরূপে আশ্চর্যভাবে সমন্বিত হয়েছে, এবং এই প্রকাশরূপের মধ্যে-প্রযোজিত প্রত্যেকটি কণাই প্রয়োজনীয়; এর কোথাও বাহুল্যের লেশমাত্র নাই। তাই ব্যক্ত অভিজ্ঞতাগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের ভিন্নতা অনুযায়ী উপরের কাব্যাংশগুলির সামগ্রিক কাব্যমূল্য ভিন্ন হলেও, নিজ নিজ ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকটিরই রূপভাষণ বা communication পরিপূর্ণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ। এই সার্থকতাই আর্টের প্রাণ এবং তার আনন্দের উৎস। এর অভাবে কিম্বা অপূর্ণতায় মহত্তম শ্রেণীর অন্তরাভিজ্ঞতাও শিল্পের গৌরবময় আবেদনলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে না।

কাব্যের ক্ষেত্রে content এবং form-এর, ভাব এবং রূপের এই পরিপূর্ণ মিলনের দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংরাজী লিরিক কাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে আমি আর চারটি বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করছি। বলা বাহুল্য, এদের প্রথমটি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রবার্ট হেরিক্-এর, দ্বিতীয়টি শেলি র, তৃতীয়টি শেলি-রই প্রায় সমসাময়িক কবি ল্যান্ডার-এর এবং শেষেরটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন উনবিংশ শতকের শেষাংশের স্বল্পায়ু কবি আরনেস্ট্ ডাউসন্-এর:

(১)

Whenas in silks my Julia goes,
Then, then, methinks, how sweetly flows
The liquefaction of her clothes !

Next, when I cast mine eyes and see
That brave vibration each way free,
—O how that glittering taketh me !

(২)

Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory—
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken.

Rose leaves, when the rose is dead,
Are heaped for the beloved's bed ;
And so thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on.

(৩)

Ah, what avails the sceptred race !
Ah, what the form divine !
What every virtue, every grace !
Rose Aylmer, all were thine.

Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weep, but never see,
A night of memories and sighs
I consecrate to thee.

(৪)

They are not long, the weeping and the laughter,
Love and desire and hate :
I think they have no portion in us after
We pass the gate.

They are not long, the days of wine and roses :
Out of a misty dream
Our path emerges for a while, then cleses
Within a dream.

প্রথম কবিতাটিতে কবির mood খানিকটা হালকা ধরণের — প্রিয়ার রেশমী পোষাকের উজ্জ্বল; তরল হিল্লোলের মাধুরী ; কিন্তু এই লঘু, অথচ মধুর সৌন্দর্যপানের

অনুভূতিটি এক অপরূপ নিখুঁত ভঙ্গিতে দুটি মাত্র পংক্তির মধ্যে অনিন্দ্য কাব্যরূপে অভিষিক্ত হয়েছে। এতে প্রযুক্ত liquefaction, vibration এবং taketh—এই তিনটি কথার অপূর্ব-আভাসময় ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় কবিতাটির মধ্যে এক মহান্ রোমান্টিক অনুভূতি মাত্র আটটি পংক্তির সংক্ষিপ্ত পরিসরে গ্রথিত কয়েকটি আশ্চর্য-শক্তিময় image-এর ভিতর দিয়ে এক নিবিড় সৌন্দর্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয় কবিতাটি এক মহৎ শোকানুভূতির আশ্চর্য সুসংহত সৌন্দর্যরূপ খ্যাতি। পাঠক লক্ষ্য করবেন, প্রথম চারটি পংক্তিতে আছে সদ্যমৃতা Rose Aylmer-এর অপরূপ রূপ-গুণ-সমন্বিত মূর্তির বিস্ময়-ব্যাকুল স্মরণ; শেষ স্তবকটিতে আছে সেই মহিমময়ী নারীর অপূরণীয় চিরবিচ্ছেদের বেদনা। দুটি অংশেরই শান্ত সংযত ভাষণভঙ্গি অন্তরের নিদারুণ ক্ষতচেতনাকে এক অপূর্ব মধুর করুণ রসে অভিষিক্ত করেছে। সুসংযত স্বল্পভাষণের এই অলৌকিক আবেদনশক্তির ·এর চেয়ে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আর আছে বলে মনে হয় না।

চতুর্থ কবিতাটিতে এক তরুণ জীবন-পথিকের অবর্ণনীয় জীবন-বিতৃষ্ণার অনুভূতি আটটি অপরূপ পংক্তির নিখুঁত গ্রন্থনের মধ্যে পরিপূর্ণ রসপরিণতি লাভ করেছে। বিষাদ, অতৃপ্তি, অবজ্ঞা, অবসাদ, আক্ষেপ ও এক রোমান্টিক রহস্যচেতনার সংমিশ্রণে গঠিত এই mood-টি এর কথা ও ছন্দোগতির মধ্যে এক অনির্বচনীয় চিন্তাকরুণ বেদনামাধুরীতে বিকশিত হয়েছে।

সুচারু শিল্পভাষণের অবশ্য আর একটি দিক আছে, সেটি হচ্ছে সুপরিমিত ও সুসংহত গঠনের। ছোটো ছোটো লিরিকের স্বল্প পরিসরের ..্যও এই গঠনশক্তির বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়; তার বিশেষ দৃষ্টান্ত আছে উপরের শেষ দুটি রচনায়। কিন্তু শিল্পীর এই মহৎ সংগঠন শক্তির স্পষ্টতর এবং পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায় স্তরে-স্তরে বা স্তবকে-স্তবকে, সুগঠিত সৌধের মত গড়ে-ওঠা বৃহত্তর আকারের রচনায়। এই গঠনসৌষ্ঠবও সার্থক শিল্পরূপের এক অপরিহার্য অঙ্গ; কারণ এর অভাবে মহৎ ভাবানুভূতির সূত্রগুলিও এক গভীর, অমোঘ পারম্পর্যে গ্রথিত না হয়ে খানিকটা অসংলগ্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে; এবং গঠনের এই শিথিলতা ভাবের উজ্জ্বল, ঘনীভূত প্রকাশকে দুর্বল করে তোলে।

ইংরেজী সাহিত্য থেকেই আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে এই কথাটিকে আরও স্পষ্ট করতে চাই।

তরুণ বয়সে রচিত মিল্‌টন-এর বিখ্যাত শোকগাথা Lycidas-এ এই গঠনশক্তির এক অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটির শোকানুভূতি গভীর নয়, অনেকটা আনুষ্ঠানিক ধরণের। কিন্তু এই সময়োচিত শোকভাষণের সুরটিকে মিল্‌টন যেভাবে প্রাচীন সিসিলীয় এবং রোমীয় pastoral কবিদের অনুসৃত রীতির অপূর্ব অনুকরণের ভিতর দিয়ে একটি অনিন্দ্যগঠন elegyতে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে বিস্মিত পাঠক উপলব্ধি করেন যে অল্পবয়স থেকেই এই শিল্পসংগঠন-চেতনা মিল্‌টন-এর মধ্যে রীতিমত জাগ্রত ছিল। এতে প্রযোজিত ছন্দটি মূলত iambic pentameter-এর বিচিত্র বিন্যাস; তার মধ্যে মাঝে মাঝে নিপুণ হাতে গাঁথা কয়েকটি trimeter। মূল শোকানুভূতির ভাবরেখাটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য এবং আখ্যায়িকার সাবলীল গতিভঙ্গির প্রয়োজনে মিল্‌টন এই নানাভাবে মেলানো heroic verse-কে অনেকটা blank verse-ধর্মী করে তুলেছেন, অথচ পংক্তিগুলিকে গেঁথেছেন বিচিত্রভাবে সমাবিষ্ট মিলের মধুর বন্ধনে। তাছাড়া এই শোকোচ্ছ্বাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি এক সুন্দর সহজ পারম্পর্যে গাঁথা। সে যুগের নিষ্ঠাহীন অ্যাংগ্লিক্যান্ যাজকদের উপর তীব্র আক্রমণটি অনেক সমালোচকের মতে অপ্রাসঙ্গিক এবং বেসুরো। হয়তো কিছুটা তাই। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই ভীষণ ভর্ৎসনার সুরটি মিলিয়ে যাবার পরেই যখন আবার ফুলে-ফুলে-ছাওয়া কোমলকায়া প্রকৃতির প্রতি সেই অপরূপ আবেদনের সুরটি জেগে ওঠে—

Return, Alpheus; the dread voice is past
That shrunk thy streams; return, Sicilian Muse,
And call the vales, and bid them hither cast
Their bells and flowerets of a thousand hues.
Ye valleys low, where the mild whispers use
Of shades, and wanton winds, and gushing brooks
On whose fresh lap the swart star sparely looks;
Throw hither all your quaint enamelled eyes
That on the green turf suck the honeyed showers
And purple all the ground with vernal flowers…

তখন সেই মাধুরী যেন ঐ ক্ষণিক রুক্ষতার ভূমিকায় দ্বিগুণ মধুর হয়ে বাজে।

শেলি-র Ode to the West Wind এইরকম আর একটি রচনা, যার মধ্যে শিল্পীর এই সংগঠনশক্তির এক বিস্ময়কর পরিচয় আছে! এখানে কবির ভাবাবেগ তীব্র এবং বিচিত্রগামী, এবং তাঁর কল্পনাশক্তি সুদূর দুর্গম পথে উদ্দামবেগে ধাবিত। কিন্তু আমরা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, ভাব-কল্পনার এইবিশ্বপ্লাবী আলোড়ন সত্ত্বেও মূল অভিজ্ঞতাটি এক অমোঘ, অপরূপ বিবর্তনের পথে স্তরে স্তরে অগ্রসর হয়ে এক মহান্ সমাপ্তির শীর্ষে পৌঁছেছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে আছে স্থলে, অন্তরীক্ষে এবং সাগর বক্ষে West Wind-এর গভীর-তাৎপর্যময় ধ্বংসলীলা। চতুর্থ স্তবকে বিশ্বশক্তির এই তাণ্ডবলীলার দৃশ্যটি আশ্চর্য শক্তিবলে নিমেষে স্থানান্তরিত হয়েছে কবির (এবং বৃহত্তর অর্থে মানুষের) অন্তর্লোকে; এবং কবি তাঁর দুঃখ-জর্জরিত দুর্বল হৃদয়ে এই বিপুল বিশ্বশক্তিকে একান্তভাবে বরণ করে নিতে না পারায় ক্ষোভ-অভিভূত। পঞ্চম (শেষ) স্তবকটিতে এক অভাবনীয় দ্রুতচ্ছন্দে কবি এই নিদারুণ হতাশা থেকে এক পরিপূর্ণ অগ্নিময় আত্মপ্রত্যয়ের শিখরে উঠে বিশ্বজয়ী West Wind-কে দীপ্ত আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর মানব হৃদয়-পুনরুজ্জীবনের মহামন্ত্রটিকে দিকে দিকে, নিখিল-মানবের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিতে। এ ছাড়া আর একটি মাত্র বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কবিতাটিতে আগাগোড়াই ভাবের প্রচণ্ড আন্দোলন; কিন্তু এটি রচিত হয়েছে জটিল ইটালীয় ছন্দ terza rima-র নিখুঁতভাবে গঠিত পাঁচটি অনবদ্য স্তবকে। শুধু তাই নয়, সমস্ত কবিতাটিতেই ভাবের গতিবেগ ছন্দের গতিকে আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দ্বিতীয় স্তবকে—যেখানে West Wind-এর প্রচণ্ড তাড়নে মেঘলোক উন্মথিত — সেখানে ছন্দের গতি ঝড়ের উদ্দাম পদক্ষেপেরই প্রতিধ্বনি। আবার, তৃতীয় স্তবকের প্রথমাংশে যেখানে আছে Mediterranean-এর সুখস্বপ্নবিভোর অলস নিদ্রাবেশের বর্ণনা—সেখানে আগেকার উদ্দাম ছন্দ রূপান্তরিত হয়েছে এক স্নিগ্ধ, তরল মধুরিমায়। আবার চতুর্থ স্তবকের শেষে — যেখানে কবি শরাহত পাখীর মত বেদনার্ত হতাশায় ব্যাকুল —সেখানে ছন্দের থেমে-থেমে-যাওয়া অসম পদক্ষেপে এই মর্মন্তুদ বেদনা আশ্চর্যভাবে নিঃশ্বসিত।

ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ-এর মহত্তম রচনা Lines composed a few miles above Tintern Abbey-তেও এই নিখুঁত ভাববিবর্তন এবং গঠনসৌষ্ঠব আমাদের মুগ্ধ করে। কবিতাটির স্নিগ্ধ-মধুর ধ্যানদৃষ্টি তার সার্থক গতিচ্ছন্দ খুঁজে পেয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত blank verse-এর শান্ত পদক্ষেপে। এই অমিত্রাক্ষরের স্নিগ্ধ প্রবাহ ভাববিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে আছে পাঁচ-বছর-পরে-

আবার-দেখা সেই নদী-কল্লোলিত, বনপর্বত-ঘেরা ঘন-সবুজ উপত্যকাটির শান্ত-মধুর রূপের এক অপূর্ব বিবরণ। দ্বিতীয় অংশে কবি তাঁর অন্তরের বিভিন্ন স্তরের উপর প্রকৃতির এই সব অবিস্মরণীয় দৃশ্যের বিচিত্র প্রভাবের কথা বলেছেন। ছোটো তৃতীয় অংশটিতে কবি নিজের জীবনের বহু ঘটনার কথা স্মরণ করে তাঁর অন্তরের উপর প্রকৃতির এই গভীর প্রভাব সম্বন্ধে নতুন করে নিঃসংশয় হয়েছেন। এইখানে কবিতাটির প্রথমাংশ শেষ হয়েছে বলা যায়। এর পরে দীর্ঘ চতুর্থ অংশটিতে কবি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ পরিচয়ের রোমাঞ্চকর ইতিহাসটিকে আমাদের সামনে স্তরে স্তরে মেলে ধরেছেন। প্রকৃতি-প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে শেষে তিনি এসে পৌঁছেছেন এক বিপুল সর্বব্যাপী জীবনদৃষ্টিতে — যেখানে মানুষ এবং প্রকৃতি এক গভীর তাৎপর্যের সূত্রে পরস্পরের হৃদয়ে বাঁধা এবং বিশ্বজগতের এই চেতন-অচেতন পদার্থের সীমাহীন বৈচিত্র্যের মেলা এক অলৌকিক মহাচেতনার তড়িৎপ্রবাহে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতি তাই তাঁর কাছে আজ শুধু ইন্দ্রিয়লোভন মাধুরীর পরিবেশক নয়, সে এক মহান ধ্যানদৃষ্টির উৎস। এখানেই কবিতাটি শেষ হতে পারত। কিন্তু এই অলৌকিক ধ্যানচেতনার দুর্গম শিখরে আমাদের না রেখে গিয়ে কবি শেষ অংশটিতে আমাদের আবার আশ্চর্যভাবে ফিরিয়ে এনেছেন পরিচিত সংসারের স্নেহ-ব্যাকুল আলোছায়া-বিজড়িত প্রাঙ্গণে। তাঁর অন্তরের নিত্যসঙ্গিনী, বোন ডরথার প্রতি এই স্নেহ-ব্যাকুল ভাষণটি কবির এই মহান্ দার্শনিক দৃষ্টিতে এক অপরূপ মাধুরী সঞ্চার করে তাকে একেবারে আমাদের স্পর্শকাতর মানবহৃদয়ের অন্তঃপুরে পৌঁছে দিয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, ঠিক এই অপূর্ব রূপসংহতি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের আর একটি মহৎ রচনা Immortality Ode-এ নেই। প্রথমতঃ, সেখানে form-টি যেন সাধারণভাবেই একটু বেশী বিস্তারিত, এবং দ্বিতীয়ত, অষ্টম স্তবকের শেষে অবস্থিত।

> Full soon thy soul shall have her earthly freight,
> And custom lie upon thee with a weight,
> Heavy as frost, and deep almost as life!

এই পংক্তিগুলি, এবং নবম স্তবকের আরম্ভের—

> O Joy! that in our embers
> Is something that doth live,

That nature yet remembers
What was so fugitive ! —

এই পংক্তিগুলির মধ্যে কোনো সহজ, সুস্পষ্ট যোগাযোগ নেই। সব কিছু সত্ত্বেও এই কবিতাটিও একটি অপূর্ব সৃষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু Tintern Abbey-র মত ভাববিবর্তনের এবং রূপসংগঠনের সেই অনবদ্যতা এতে নেই।

ভাবের, অন্তরাভিজ্ঞতার এই নিখুঁত রূপপরিণতিই সার্থক শিল্পের প্রাণ এবং তার বিশ্বজনীন আবেদনের উৎস।

সভ্যতার ইতিহাসে মহৎ কবির আবির্ভাব হয়েছে বারে বারে এবং দেশে দেশে। সামগ্রিক বিচারে তাঁরা সকলেই মহাকবি, কিন্তু সকলেই ঠিক মহত্তম শ্রেণীর কাব্যশিল্পী বা রূপস্রষ্টা নন। বিশ্বের রসিকজন যাঁদের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্বের আখ্যা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যেও সকলেই ঠিক উচ্চতম শ্রেণীর আর্টিস্ট্ নন। প্রাচীন গ্রীসের তিনজন বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজিক্ নাট্যকারের মধ্যে একমাত্র সফক্লিজ্-ই বোধহয় নিখুঁত-সমন্বিত শিল্পরূপ সৃষ্টির গৌরব দাবী করতে পারেন। হোমারকে পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম মনে করা হয়; কিন্তু তাঁর চরম কীর্তি Iliad-এও কিছু কিছু অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে ল্যাটিন কবি ভার্জিল্ ঠিক উচ্চতম শ্রেণীর রসস্রষ্টা নন; কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পসাফল্য অনবদ্য। আবার ইংরেজী সাহিত্যের কাব্যাকাশেও অসংখ্য জ্যোতিষ্ক। কবিজীবনের শুভতম মুহূর্তে তাঁরা প্রায় সকলেই পরিপূর্ণ শিল্পরূপ সৃষ্টি করে গেছেন; কিন্তু তাঁদের অনেকেরই শিল্পসাফল্য একটানা নয়, আকস্মিক। যাঁরা তাঁদের কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে সাধারণভাবেই এই উচ্চাঙ্গের রূপসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে পড়েন হয়ত মাত্র চারজন—শেক্স্পীয়ার, মিল্টন, ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ ও কীট্স। এঁদের মধ্যে নিছক প্রকাশশিল্পী হিসাবে একমাত্র মিল্টন্-এরই পদক্ষেপ আজীবন আশ্চর্যভাবে অস্খলিত।[১]

আমাদের এই বহুকনিষ্ঠ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর কাব্যশিল্পীর একান্ত অপ্রাচুর্য। রবীন্দ্রনাথের আগে মাত্র একজনেরই আবির্ভাব হয়েছিল: তিনি অবশ্যই মধুসূদন। কিন্তু তিনি এসেছিলেন পূর্বসূরী হয়ে; বিপুল দায়িত্বের বোঝা নিয়ে সম্মুখীন হয়েছিলেন বিপুল প্রতিকূলতার। তাই স্বভাবতই তাঁর শিল্পসাফল্য

১ অবশ্য তাঁর দুর্বল Paradise Regained কাব্যটিকে বাদ দিলে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভাবপ্রেরণার ক্ষীণতাই মূলত এই অসাফল্যের জন্য দায়ী।

অসাধারণ হলেও অসম এবং অসম্পূর্ণ। গত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে অবশ্য কয়েকজন কবির হাত থেকে আমরা কয়েকটি চমৎকার শিল্পরচনা আকস্মিকভাবে পেয়েছি, যেমন, — গোবিন্দচন্দ্র দাসের বিস্মৃতপ্রায় ballad, 'কেন মাতা কাঁদিতেছ রণবার্তা শুনি'; যেমন, — রজনীকান্ত সেনের গভীর-ধ্বনিময় গীতি, 'সেথা আমি কি গাহিব গান'; কিন্তু এই স্তরের সাফল্য এইসব কবির ক্ষেত্রে নিতান্তই আকস্মিক। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখ-যোগ্য; তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর ছন্দচাতুরী এবং শব্দসমন্বয়ের কৌশল মনোমুগ্ধকর; কিন্তু কল্পনানুভূতির গভীরতার অভাবে তাঁর শিল্পসৌষ্ঠব অনেকাংশেই অতি-চমৎকার কাগজের ফুলের মতই আপাতমুগ্ধকর। বাকি থাকেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। কাব্যক্ষেত্রে তাঁরই অনন্য শিল্পীসত্তার প্রকাশকাহিনী এ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমন পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে ধীরপদক্ষেপে, অসংখ্য স্বল্পায়ু পর্যায়ের ধাপে ধাপে। কীট্‌স্ বা রোজেটির মত কোনো আকস্মিক বিদ্যুৎচমক তাঁর শিল্পাকাশকে উদ্ভাসিত করেনি। এমন কি শেলি যে বয়সে তাঁর অত্যাশ্চর্য Ode to the West Wind রচনা করেন অথবা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ যে বয়সে তাঁর কবিজীবনের মহৎ অভিব্যক্তি Lines composed a few miles above Tintern Abbey লেখেন, সে বয়সে কোনো তুলনীয় শিল্পরূপসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর 'বর্ষশেষ' কবিতাটিকে বৃথাই শেলি-র West Wind-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। কবিতাটি ভাবে মহৎ, কিন্তু শিল্পে অপরিণত; তার প্রকাশ-রূপের মধ্যে অতিপ্রসারণের দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট। নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলি বা কীট্‌স যে বয়সে তাঁদের শিল্প-অধিকারের শীর্ষে উপনীত হয়েছেন সে বয়সে রবীন্দ্রনাথের কেবলমাত্র যাত্রা সুরু।

শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার ক্রমবিকাশের পথটি এক দীর্ঘপ্রবাহ মহানদীর গতিপথের মতই বৈচিত্র্যময়, এবং সমস্ত কাব্যের ইতিহাসে আর কোনো কবির প্রকাশরীতি এত অসংখ্য ক্ষণস্থায়ী পর্যায়ের ভিতর দিয়ে এমন অবিরামভাবে বিবর্তিত হয়নি। কবির শিল্পীমনের বিবর্তনের পথে এই অশান্ত পরিবর্তনের ধারা, এই অভাবনীয় বৈচিত্র্যের অবিরত চমক স্বভাবতই আমাদের মনে গভীর বিস্ময় জাগায়, এবং বর্তমান পর্যায়ে আমরা কবির রচনারীতির এই বিবর্তন-ধারাটির উপরেই আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখব। এই সুদীর্ঘ ধারাটিকে অনুসরণ করে আমরা প্রথমে তার

ক্রমিক পরিণতির রূপগুলিকে একে একে চিনে নেবার চেষ্টা করব। মনে রাখা প্রয়োজন, এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিমনের ভাবধারার বিবর্তনের কথা স্বাধীনভাবে বিবেচনা করছি না। রবীন্দ্রকাব্যের প্রকাশশিল্পের বিচিত্র ক্রমপরিণতিই এখানে প্রত্যক্ষ মনোযোগের বিষয়—যদিও ঐ প্রসঙ্গে কবি-অন্তরের ক্রমিক ভাবপরিণতির কথা অনবরতই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গ হয়ে উঠবে; কারণ আর্টের content বা বাচ্যকে বাদ দিয়ে তার form বা বাচকের বিশুদ্ধ আলোচনা সম্ভবই নয়।

বাল্যরচনাগুলি থেকে স্বরু করে প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে সমাপ্ত "মানসী" পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে দেখা যায় এক অসীম প্রাণপ্রাচুর্য শতধারা প্রস্রবণের মত বিচিত্রপথে ধাবিত। এইকালে 'নিষ্ফল কামনা' বা 'ভৈরবী গান'-এর মত মধুর এবং গভীর-ব্যঞ্জনাময় কবিতা বেশ কয়েকটি হয়েছে, কিন্তু কয়েকটি গান এবং একটি মাত্র প্রায় নিখুঁত রচনা 'অনন্ত প্রেম' ছাড়া স্থসংবদ্ধ, বাহুল্যবর্জিত শিল্পরূপ প্রায় একটিও রচিত হয়নি। এই দীর্ঘ সাধনার প্রথম পরিপূর্ণ সার্থকতার সূচনা করে বিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতাটি তার শান্ত-নিপুণ তুলির ছোট ছোট টানে আঁকা অপূর্ব রূপকচিত্রটিতে। এই প্রথম এক অতি-গভীরের নিবিড় অনুভূতি মহৎ শিল্পপরিণতিতে সার্থক হল, মূর্ত হল এক আশ্চর্য-সংক্ষিপ্ত উজ্জ্বল-আভাসময় কাব্যরূপে।

একত্রিশ বছর বয়সে রচিত এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের এক স্মরণীয় বাঁকের উপর অবস্থিত। এখানেই বোধহয় দিশাহারা ভাবোচ্ছল কবিহৃদয় প্রথম আপনাকে নিঃশেষে সঁপে দিল রূপবিলাসী কাব্যশিল্পীর হাতে। এই মিলনের সাময়িক অবসান হয়েছে অসংখ্যবার; কিন্তু এই সব সাময়িক বিচ্ছেদের ফাঁকে ফাঁকে রচিত হয়েছে মিলনের নিত্য-নতুন সূত্র। 'সোনার তরী'-র এই প্রথম রূপসংহতির পর থেকে লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে এক নিশ্চিততর করস্পর্শের আবির্ভাব হয়েছে। এই নতুন-জাগা শক্তির ছাপ আছে "সোনার তরী" পর্যায়ের আরো অনেকগুলি কবিতায়। 'স্বপ্নমঙ্গল'-এর খরোজ্জ্বল প্রকাশ, অসংশয় গতি এবং অনবদ্য পরিণতি এই শক্তির আত্মসচেতনতার অন্যতম পরিচয়। 'যেতে নাহি দিব', 'মানসস্থন্দরী' এবং 'বসুন্ধরা' এই পর্যায়ের তিনটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। তিনটিরই প্রকাশরূপ মহৎ ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত; শুধু যুবক রবীন্দ্রনাথের অসীম প্রাণপ্রাচুর্য এবং অদম্য ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর শিল্পীমনের সীমাচেতনাকে বিভিন্ন পরিমাণে লঙ্ঘন করেছে তিনটি ক্ষেত্রেই। কিন্তু এই

পর্যায়ের শেষে যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র চিত্রটি পাওয়া যায় তাতে যেন আবার সেই প্রথম চিত্রটির পরিপূর্ণ শিল্পচেতনা ফিরে এসে জীবনের একটি বেদনা-রঙীন, রহস্য-মধুর অধ্যায়ের মর্মব্যাকুলতাকে অধিষ্ঠিত করেছে অপরূপ শিল্পমাধুরীর সিংহাসনে। এ ছাড়াও ঠিক এই সময়েই রচিত হয় কবির প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য 'বিদায়-অভিশাপ'। এর অসাধারণ ভাব-ঐশ্বর্যের অপরূপ প্রকাশ কবির পরবর্তী জীবনের মর্মভেদী নৃত্যনাট্যগুলির পূর্বাভাস দেয়।

এই সুসমন্বিত প্রকাশশক্তির আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায় "সোনার তরী"-র প্রায় অব্যবহিত পরেই রচিত "চিত্রা" পর্যায়ের কয়েকটি কবিতায়। এই পর্যায়ের যে কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প অকস্মাৎ তার গৌরবের চরম শীর্ষে উপনীত হয়েছে সেটি হচ্ছে 'উর্বশী'। কবিতাটি অনায়াসেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ode-গুলির অন্যতম। এখানে ছন্দসঞ্চালন নিখুঁত এবং আশ্চর্যভাবে ভাবানুগামী, কথার চয়ন এবং গ্রন্থন অনবদ্য, এবং ছন্দ-তরঙ্গিত শব্দসমন্বয়ের যাদু অবর্ণনীয়। অপূর্ব আভাসময় image-মালার নিখুঁত গ্রন্থনে রচিত আটটি সূক্ষ্মগঠন স্তবকের ভিতর দিয়ে রসঘন ভাবানুভূতিটির বিচিত্রিত অথচ সুসংবদ্ধ রূপায়ণ, এবং শেষ স্তবকের মহৎ climax-টির মৃদু আকস্মিকতা এবং উদাস-বেদনায় অবসান কবিতাটিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিখুঁত রূপ দিয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি শব্দসমষ্টি যেন গভীরের আভাসদীপ্ত, প্রত্যেকটি পংক্তির ধ্বনিতরঙ্গ যেন অন্তরে এক যাদুময় ঐকতানের প্রতিধ্বনি তোলে। একাধারে মনোরম চিত্ররচনা এবং মহৎ ভাবব্যঞ্জনার বাহক এই natural magic এই প্রথম আবির্ভূত হল রবীন্দ্রকাব্যের ক্ষেত্রে, কবির প্রায় চৌত্রিশ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পপরিণতির পথে এই কবিতাটি আর একটি স্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ।

"চিত্রা" পর্যায়ে পৌঁছেই রবীন্দ্রকাব্যকলা সর্বপ্রথম সার্থকতার এক উচ্চ স্তরে উন্নীত হল। 'চিত্রা', 'সন্ধ্যা', 'এবার ফিরাও মোরে', 'সাধনা', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি কবিতার রূপসার্থকতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকতে পারেনা। তবে 'উর্বশী'-র চরম শিল্পসাফল্য অবশ্য এই পর্যায়ের আর কোনো কবিতাতেই নেই। শুধু 'বিজয়িনী' কবিতাটি অপূর্ব রসঘন রূপসৃষ্টিতে 'উর্বশী'-র কাছাকাছি পৌঁছেছে —যদিও 'উর্বশী'-র ছন্দের সেই যাদুময় কম্পন এবং তার অপূর্বগঠন স্তবক-সমাবেশের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য এতে নেই। উপরে উল্লিখিত অন্যান্য কবিতাগুলি সবই সুন্দর—শুধু তাদের দীর্ঘবিস্তৃত রূপের মধ্যে ঘনীভূত আভাসময়তার, concentration of effect-এর অভাব। 'চিত্রা' কবিতাটির ত্রুটি সম্পূর্ণ অন্ত

ধরণের। কবিতাটি সুগঠিত, কিন্তু একটি অলংকৃত thesis-এর মতই রসব্যঞ্জনাহীন। এ ছাড়াও লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই পর্যায়েই প্রথম দুটি সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যকাহিনী রচিত হয়—'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'। মাত্র দু'বছর আগে লেখা মনোরম, কিন্তু অতি-উচ্ছ্বাসময় 'পুরস্কার' কবিতাটির তুলনায় এদের সুসংহত শিল্পরূপের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষণীয়। এই পর্যায়েই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প আপনার অলৌকিক শক্তির পরিচয়ে পুলকিত হল।

"চিত্রা" র পরেই রচিত "চৈতালি"-র প্রথম কবিতা 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ-বনে'-তে এই নতুন-জাগা শিল্পশক্তির আর একটি বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। চারটি নিখুঁত স্তবকে বিন্যস্ত একটিমাত্র মূল image-এর কুশলী বিস্তারের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণের আত্মনিবেদনের বেদনা-আকুতি মূর্ত হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী সৌন্দর্যে। কিন্তু এরই সঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে এই পর্যায়ে এবং এর কিছু পরে রচিত বহুসংখ্যক সনেটের মাত্র কয়েকটিতে এই সুসংবদ্ধ প্রকাশশক্তির পরিচয় আছে। অন্যগুলির সাফল্য সাধারণ স্তরের। শিল্প-পরিণতির এই সার্থক পর্যায়ের মধ্যে এই আপেক্ষিক ব্যর্থতা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

"চৈতালি"-র কবিতাগুলি যেন "চিত্রা" ও "কল্পনা"-র মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সেতু রচনা করেছে। এই সেতুটি পার হয়েই শিল্পভাষণ-রীতির এক অপূর্ব পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে। "চিত্রা"-র সার্থক রচনাগুলিতে অনুভূতি বহুক্ষেত্রেই অন্তর্মুখী; তারা যেন কতগুলি গভীর অন্তশ্চেতনার রসানুভূতি, এবং এক অলক্ষ্য মননশক্তির নিয়ন্ত্রণে সুসংহত। তাদের স্তবক গঠন, শব্দসমাবেশ এবং ছন্দগতির মধ্যেও তাই একটি সুনির্দিষ্ট স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষ ভাবানুবর্তিতা, একটি hard clarity of outline লক্ষ্য করা যায়। "কল্পনা"-র কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের স্টাইল এই নিবিড় তত্ত্বানুভূতির tension থেকে মুক্ত হয়ে এক পরিপূর্ণ কল্পনাবিলাসের স্বতস্ফূর্ততায় পৌঁছেছে। 'বর্ষামঙ্গল', 'স্বপ্ন', 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পরে', 'ভ্রষ্টলগ্ন,' 'শরৎ'; 'হতভাগ্যের গান' 'বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায়,[১] এবং অনেকগুলি গানে পাওয়া যায় রোমান্টিক কল্পনার লীলাময় গতিচ্ছন্দের অনুবর্তী এক সহজ সরস স্বাচ্ছন্দ্য, একটি easy grace—যা এর আগে রবীন্দ্রকাব্যে দেখা

১ 'দুঃসময়' ('যদিও সন্ধ্যা আসিছে'), 'অশেষ' ('আবার আহ্বান ?'), ও 'বর্ষশেষ' এই তিনটি কবিতার আবেদন আমার কাছে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। আমার ধারণা, এদের মধ্যে নিপুণ বাক্য-সমারোহই প্রধান, কাব্যরসের ব্যঞ্জনা অল্প। 'অশেষ' ও 'বর্ষশেষ'-এ কবির অভিজ্ঞতা কোনো ঘনীভূত রসদৃষ্টিতে সংহত হয়নি বলেই তাঁকে পাতার পর পাতা জুড়ে অতৃপ্ত অলংকারের মালা গাঁথতে হয়েছে।

যায়নি। "চিত্রা"-র রচনাগুলিতে প্রযুক্ত অপূর্ব-শক্তিময় phrase ও image-গুলিতে আছে হীরকের চমকপ্রদ কাঠিন্য ও দীপ্তি। "কল্পনা"-র স্টাইলে এই স্পষ্টোজ্জ্বল রেখাঙ্কনের বদলে আছে এক বিচিত্ররঙা আভাসময় অস্পষ্টতা। "চিত্রা"-র নিখুঁত-নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিসমাবেশের বদলে এখানে আছে অনুপ্রাসের পুলকিত রণন এবং কোমল বর্ণালীর লীলায়িত দোলা। অথচ, কল্পনার এই রোমান্টিক বিস্তার সার্থক রচনাগুলিতে কোথাও সুচারু গঠনের অন্তরায় হয়নি।

এই পর্যায়ের 'হতভাগ্যের গান' কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যে এক আশ্চর্য নতুন সুর বয়ে এনেছে। এখানে এক শান্ত-মহিমায় —বজ্রকঠোর, অথচ পুষ্পকোমল — stoicism এক মনোরম বলিষ্ঠ-মধুর রূপে ঘনীভূত হয়েছে।

কিন্তু "কল্পনা"র মহত্তম রচনা 'বৈশাখ' যেন আমাদের কাল-চেতনাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। কারণ এই কবিতাটির স্টাইলের severity, সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিসমাবেশ এবং কঠোর সুসংহত ভাবানুবর্তিতা আমাদের পিছনে-ফেলে-আসা "চিত্রা" পর্যায়ের রচনারীতির কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ভাব-ঐশ্বর্যে এবং চিত্রণ-শক্তিতে প্রায় শেলি-র West Wind-এর সমতুল্য এবং ছন্দসঞ্চালন ও স্তবকগঠনে কলিন্স-এর Ode to Evening-এর স্মৃতিবাহক এই মহৎ ode-টি 'উর্বশী'র মত রবীন্দ্রনাথের একটি পরম আশ্চর্য রচনা। দশটি মন্থরগমন, ঘনীভূত-আভাসময় যুক্তাক্ষর-বন্ধুর স্তবকের ভিতর নিঃশেষে ধরা পড়েছে পৃথিবীর উষ্ণাঞ্চলের গ্রীষ্মঋতুর বাহির ও অন্তর, রূপ ও বাণী সমন্বিত রুক্ষ-উদাস মহাবৈরাগ্যময় মূর্তিটি। এই কবিতায় ব্যবহৃত অভিনব পাঁচ পংক্তির স্তবকটিও কবির ক্রমবিবর্তমান শিল্পশক্তির এক মহৎ সৃষ্টি।

"চিত্রা" ও "কল্পনা"-র এই দুটি স্বয়ংস্বতন্ত্র স্টাইল এই প্রথম রবীন্দ্রকাব্যে প্রায় পাশাপাশি আবির্ভূত হল। কৌতূহলী পাঠক লক্ষ্য করবেন যে এই দুটি বিশিষ্ট রচনারীতি, style-এর এই অপূর্ব duality বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পরবর্তীকালের রবীন্দ্রকাব্যে পাশাপাশি বা অল্পকালের ব্যবধানে বার বার জেগে উঠেছে।

এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করার আগে কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে "কল্পনা"-তেও অতিবিস্তৃত ও অসংলগ্ন রচনা অনেক আছে, এবং পরিমাণের দিক দিয়ে এখানেও কবির শিল্পসার্থকতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র এই পর্যায়ে রচিত গানগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই অপরূপ সার্থকতায় উত্তীর্ণ।

এর পরের দুটি বছর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের আর একটি অবিস্মরণীয়

অধ্যায় রচনা করেছে। যে সাফল্য প্রথম সূচিত হয় "চিত্রা" পর্যায়ের 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি-'তে, তারই চরম পরিণতি "কথা ও কাহিনী"র lyrical narrative-গুলিতে। বিভিন্ন রসে পরিপুষ্ট এবং বিভিন্ন ছন্দ ও স্তবকের অপূর্ব কুশলী বিন্যাসে রচিত এই কাব্যকাহিনীগুলি এই জাতীয় আর্টের উপর কবির চরম অধিকারের স্বাক্ষর বহন করে। বিচিত্র মনোভাবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, সূক্ষ্ম-সংকেতময় দৃশ্যপট রচনায়, ছন্দগতির মনোরম নিয়ন্ত্রণে এবং অপরূপ ধ্বনিসংকেতে অনেকগুলি রচনাই অনবদ্য। সামান্য ক্রটিযুক্ত পয়ারছন্দে লেখা হলেও এই পর্যায়ের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' কবিতাটিতে পাওয়া যায় এক মহৎ বেদনালোকের নিখুঁত মর্মস্পর্শী রূপায়ণ। শিল্পগৌরবে এই কবিতাটি বোধহয় 'বিদায়-অভিশাপ'-এর চেয়েও উজ্জ্বল, এবং এখানেও আমরা কবির শেষজীবনের অপরূপ নৃত্যনাট্যগুলির পূর্বাভাস পাই।

এই পর্যায়েরই আর একটি রচনা আমাদের মনে গভীর বিস্ময় জাগায়; সে হচ্ছে দীর্ঘতর পয়ারে রচিত 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি। এর প্রথম উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে এর মহাপয়ারের আশ্চর্য রকমের অমিত্রাক্ষরধর্মী প্রবাহ। দ্বিতীয়ত, এই কবিতাটির অজস্র image-এর মধ্যে কবি ব্যঞ্জনাময় অলংকরণশক্তির এক অভাবনীয় পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয়ত, জলধির তরঙ্গকল্লোলের মত এর সুগভীর ধ্বনিপ্রবাহ অনিবার্যভাবে Miltonic blank verse-এর মৃদঙ্গধ্বনির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ঠিক এই ধরণের, এই শিল্পছাঁদের কবিতা রবীন্দ্রনাথ বোধহয় আর লেখেননি। কিন্তু এই একটিমাত্র কবিতার sweeping perfection-ই এই জাতীয় রচনারীতির উপর কবির পরিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে।

এর পরেই "ক্ষণিকা" পর্যায়ের কৌতুক-চপল আধো-উদাসীন অনিশ্চয়তার সুর কবির অন্তর্জীবনের এক আসন্ন পরিবর্তনের আভাস আনে। যৌবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অবসান যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে সেটি আধ্যাত্মিকতার সাময়িক প্লাবনে পূর্ণ হতে তখনও কিছু দেরি। "ক্ষণিকা" কবির অন্তর্জীবনের এই ক্ষণিক মাঝডাঙার, এই অন্তর্বর্তীকালীন no-man's land-এর কাব্য। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের poetic art-এর ক্রমবিকাশের পথে এটি একটি পরম আশ্চর্য মুহূর্ত। তাঁর কাব্যরচনা-রীতিতে তখনও যেটুকু আড়, যেটুকু জড়তার আভাস অবশিষ্ট ছিল, তা "ক্ষণিকা"-র এই দায়হীন খেয়ালের স্রোতে ভেসে-চলা কবিতাগুলিতে নিঃশেষে কেটে গেছে, এবং এইখানে তাঁর আগামী কালের অলৌকিক সৌন্দর্যময়

রচনারীতির আর একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। যে পাঠক একদিকে "চিত্রা" ও "কল্পনা" ও আর এক দিকে "গীতাঞ্জলি", "বলাকা" ও "পূরবী" পড়েছেন, তাঁর পক্ষে একই কবির লেখা "ক্ষণিকা"-জাতীয় কোন কাব্যের অস্তিত্বই কল্পনা করা সম্ভব নয়। অথচ, "ক্ষণিকা"-রও বহু কবিতায় কবি এক মনোরম ও অনায়াস সার্থকতা লাভ করেছেন, এবং সমস্ত রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে এই কবিতাগুলির একটি বিশিষ্ট আবেদন আছে। কবির শিল্পশক্তির নমনীয়তা ও অভিযোজন-শক্তির এর চেয়ে বিস্ময়কর প্রমাণ আর কী থাকতে পারে?

এর ঠিক পরেই লেখা "নৈবেদ্য"-কাব্যে পূর্বসূচিত পরিবর্তনটি হঠাৎ এসে পড়ে আমাদের একেবারে আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায়। এই পর্যায়ে যে নিবিড় আত্মনিবেদনের বেদনা-আকূতি প্রথম দেখা দিয়েছে, মূলত তাই বহু বিচিত্র মনোরম সুরে ধ্বনিত হয়েছে "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য" এবং "গীতালি" পর্যায়ে। প্রকাশ-রীতির দিক দিয়েও "নৈবেদ্য"-র কবিতাগুলি পরবর্তী এই তিনটি গীতিগুচ্ছের পূর্বাভাস বহন করে। "নৈবেদ্য"-র কবিতাগুলিকে সহজেই গান এবং সনেট্—এই দুটি বিভাগে ফেলা যায়; কিন্তু সুরসিক পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই পর্যায়ের গানগুলির অন্তত অর্ধেকের ভিতরে গঠনের যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং কথার যে সহজ ও সার্থক বিন্যাসের শিল্পাবেদন আছে, সনেট্গুলির অধিকাংশের মধ্যেই তা নেই। আমাদের প্রাক্-রবীন্দ্র সাহিত্যে ইটালীয় এবং ইংরাজী সনেটের মাঝামাঝি এক বিচিত্র-সৌন্দর্যময় গঠন পাওয়া যায় একমাত্র মধুসূদনেরই কয়েকটি চতুর্দশপদীতে। সনেটের বিশিষ্ট সৌন্দর্যটি নির্ভর করে তার চোদ্দোটি পংক্তির বিচিত্র সঞ্চালন এবং সংগঠনের কারুকৌশলের উপর। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সনেট্ ঠিক সনেট্-ই নয়, নিছক সাতটি পয়ার-দ্বিপদীর সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের এই সনেট্গুলির সঙ্গে মধুসূদনের অনবদ্য রচনা 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন'-এর তুলনা করলেই তফাৎটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর', 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি', 'তোমার ন্যায়ের দণ্ড' প্রভৃতি[১] নেহাৎ অল্প কয়েকটি উচ্চাঙ্গের রচনাকে বাদ দিলে দেখা যায় যে সনেট্-নামধারী এই সপ্তপয়ারের সংকীর্ণ এবং একঘেয়ে কাঠামোটির ভিতরে কবির প্রেরণা সার্থক পরিণতি লাভ করতে পারে নি। এই পর্যায়ের আটাত্তরটি সনেটের ভিতর অনেকগুলিই মোটের উপর ভাল, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। একই

১ এই পর্যায়ের সার্থকতম সনেট্গুলির পাশে স্থান পাবার মত একটি অপূর্ব সনেট্ "চৈতালি"-তে আছে: 'দাও ফিরে সে অবণ্য, লও এ নগর'।

সময়ে রচিত গানগুলির অধিকাংশের উজ্জ্বল শিল্পোত্তরণের পাশে সনেট্‌গুলির আপেক্ষিক অনৌজ্জ্বল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এর পরের কাব্যগ্রন্থ "স্মরণ" কবির সদ্যমৃতা পত্নীর উদ্দেশে রচিত শোকগাথা। ভাবসম্পদ ও প্রকাশমাধুরী —দুদিক দিয়েই এই কবিতাগুলি একান্ত অনুজ্জ্বল, এবং রবীন্দ্রনাথের এই একটি মাত্রই কাব্যগ্রন্থ যার সাহিত্যিক মূল্য প্রায় নগণ্য। কিন্তু পরোক্ষভাবে এই অনুজ্জ্বল প্রচেষ্টাগুলি রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার উপর এক গভীর আলোকপাত করে। এগুলি থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন কালের Pastoral কবিদের মত বা Lycidas-রচয়িতা মিল্‌টন্‌-এর মত রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুভূত নয় এমন কোনো মনোভাবকে সাজিয়ে-গুছিয়ে মনোরম শিল্পরূপ দিতে পারতেন না।[১]

এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে কবি এক অপূর্ব প্রাণময় সরলতায় পৌঁছেছেন "শিশু" কাব্যের রচনাগুলিতে। এই পর্যায়ের অনেক রচনাই অবশ্য সাধারণ স্তরের। কিন্তু সার্থকতর রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় শিশুমানস-চিত্রণে প্রযুক্ত এক মর্মস্পর্শী নিরলংকার সরলতা। এদের অপরূপ খেয়ালী ভাষা সুকুমার শৈশবকল্পনার স্বচ্ছ শিশিরসিক্ত। 'জন্মকথা', 'খেলা', 'বিজ্ঞ' 'বীরপুরুষ', 'ছুটির দিনে', 'লুকোচুরি', 'বিদায়' প্রভৃতি "শিশু"-র সার্থক রচনাগুলি রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের নতুন কোনো অগ্রগতির পরিচয় না দিলেও তার ক্রমবর্ধমান নমনীয়তা এবং অভিযোজন-শক্তির আর এক আশ্চর্য পরিচয় বহন করে। এই নতুন অভিজ্ঞতালোককে তিনি সহজেই শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন, শুধু তাই নয়; এই নতুন উপাদান থেকে তিনি কয়েকটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি করে গেছেন।

এর পরের দুটি কাব্যগ্রন্থ "উৎসর্গ" ও "খেয়া"-র মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর কোনো চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। কেবল, "চৈতালি"-র 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে' কবিতাটিতে লক্ষিত গভীর ভাবানুভূতির সুসংহত, আভাসদীপ্ত রূপকচিত্রণের ক্ষমতা আরো ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত 'প্রসাদ' ('হায় গগন নহিলে') 'অনাবশ্যক' ('কাশের বনে') এবং 'কৃপণ' ('আমি ভিক্ষা করে') প্রভৃতি এই সময়ের কয়েকটি রচনায়।

---

১ আমার বক্তব্য এই যে কবি সাধারণ মানুষ হিসাবে যতই দুঃখ পেয়ে থাকুন, সে দুঃখ তাঁর অন্তরতম শিল্পীসত্তাকে, তাঁর inner creative self-কে গভীরভাবে আলোড়িত করতে পারেনি। অন্যপক্ষে, তাঁর জীবনে এই জাতীয় এমন ঘটনা আছে যা তাঁর সৃজনীশক্তিকে আজীবন আশ্চর্যভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। হয়তো একই কারণে "পূরবী"-র সত্যেন্দ্রনাথ-স্মরণে লিখিত কবিতাটি আগাগোড়া নিপুণ অলংকারে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত প্রাণহীন।

"ক্ষণিকা" থেকে "খেয়া" পর্যন্ত প্রসারিত আপেক্ষিক শূন্যতা এবং অনিশ্চিত প্রস্তুতির পর্ব এখানেই শেষ। এর পরেই "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"-তে কবি এক সুসম, সুনিয়ন্ত্রিত, পরিপূর্ণ স্টাইলের সন্ধান পেয়েছেন। সহজেই লক্ষ্য করা যায় এই তিনটি গ্রন্থের প্রায় সমস্ত কবিতাই গানের সংক্ষিপ্ত অথচ সূক্ষ্ম-বৈচিত্র্যময় কাঠামোয় রচিত। "গীতাঞ্জলি"-তে নিছক ভক্তিরস অপেক্ষাকৃত প্রবল, এবং এর কোনো কোনো কবিতায় একটু আড়ষ্টতা, imagery-র একটু স্থূলতা, একটু সচেতন সংগঠনের প্রয়াসচিহ্ন এবং একটু বর্ণবিরলতা ধরা পড়ে। কিন্তু "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"-তে গভীর ভক্তিরসের সঙ্গে মিশে গেছে গভীরতর জীবনপ্রীতি, জীবন-বিস্ময় এবং সৌন্দর্যমোহ। এই কবিতাগুলির প্রকাশরূপের মধ্যে তাই পাওয়া যায় আরো বেশী স্বতস্ফূর্ততা, আরো মনোহর পংক্তিবিন্যাস, আরো উজ্জ্বল-আভাসময় কথার সমাবেশ এবং অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের ঝলক। এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ কবির প্রথম পর্যায়ের lyricism-এর শীর্ষে এসে পৌঁছেছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের প্রায় সমস্ত রচনাই গান এবং এইরকম ঘটনা রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে এই প্রথম। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের শিল্পসাফল্য প্রায় নিখুঁত। শিল্পসার্থকতার এই বিপুল অনুপাত শুধু আগেকার কাব্যগুলিতে নয়, পরবর্তী কোনো কাব্যগ্রন্থেও পাওয়া যায়না। মনে রাখা প্রয়োজন আগেকার এক-একটি কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি মাত্র কবিতায় যে পরিপূর্ণ শিল্পসৌষ্ঠব বর্তমান তার বিস্ময়কর উপস্থিতি এই তিনটি গীতিগুচ্ছের অধিকাংশ রচনায়।

রবীন্দ্রকাব্য পড়তে পড়তে বিচক্ষণ পাঠককে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। সেটি এই যে রবীন্দ্রনাথ যখনই কোন একটি সুন্দর, পরিপূর্ণ, প্রয়োজনানুগ প্রকাশরীতির সন্ধান পেয়েছেন, তার সামান্য কিছুদিন পরেই যেন তিনি সেটিকে একেবারে পরিত্যাগ করার জন্য ব্যাকুল। "গীতাঞ্জলি"-পর্বের এই পরিপূর্ণ সুন্দর স্টাইলকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে দিয়ে "বলাকা" পর্বের সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচের এক প্রকাশরীতিকে অবলম্বন করার মধ্যে কবির এই চিরচঞ্চল, পরিবর্তন-পিয়াসী শিল্পী-অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়।

পঁয়তাল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন বছর বয়সের মধ্যে রচিত "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি" কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতি-কল্পনাকে বেঁধে রেখেছিলেন কয়েকটি মাত্র পংক্তির বিচিত্র বিন্যাসে গঠিত ছোটো-ছোটো গানের সূক্ষ্ম কাঠামোর মধ্যে। সুকোমল

মিতভাষিতা এবং সুষ্ঠু আত্মশৃঙ্খলার এই শিল্পবন্ধন থেকে তিনি এক উচ্ছ্বসিত অগ্নিময় আত্মপ্রকাশের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন তাঁর সুবিখ্যাত "বলাকা-"কাব্যে। "বলাকা"র কয়েকটি মাত্র কবিতাই সুনির্দিষ্ট স্তবকে বাঁধা; বাকি প্রায়, সবগুলিই অনিশ্চিত দৈর্ঘ্যের পংক্তিসমন্বয়ে রচিত। কবির "বলাকা" পর্যায়ের অন্তরাবস্থার মধ্যে আছে এক সুদূরপিয়াসী ব্যাকুলতা, একটি গভীর অন্তঃপ্রগতিকামী অস্থিরতা, যা পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই সময়ের আকাশপ্রসারী দীপ্ত-রঙান image-গুলির অতিপ্রাচুর্যে, পংক্তিগুলির অনিশ্চিত দৈর্ঘ্যে এবং ছন্দের উচ্ছ্বসিত আবেগময় সঞ্চালনে। আকাশচারী কল্পনার এই অবাধ অগ্ন্যুচ্ছ্বাস, ছন্দের এই পুলকিত দ্রুতসঞ্চারণ আমাদের অনিবার্যভাবে শেলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, এবং রবীন্দ্র-কাব্যের এই পর্যায়টিই নিঃসন্দেহে শেলি-র পরিণত কাব্যশিল্পের সবচেয়ে কাছাকাছি। এক বিপুল, বিশ্বপ্লাবী সত্যানুভূতির মহাশক্তিময় শিল্পায়ন হিসাবে এই যুগের 'বলাকা' কবিতাটি শেলি-র Ode to the West Wind-এর সঙ্গে তুলনীয়। আমার মনে হয়, ভাবসংহতি এবং নিখুঁত শিল্প-পরিণতির দিক দিয়ে এ কবিতাটি Ode to the West Wind-এর চেয়েও মহত্তর সার্থকতা লাভ করেছে।

কিন্তু শেলির কবিতার বিশেষ ক্রটিগুলিও "বলাকা"-র কাব্যশিল্পে পরিস্ফুট। "বলাকা" কাব্যের কবিতাগুলির শিল্পোত্তরণ নিতান্তই অসম। এতে 'বলাকা'-র মত মহাবিস্ময়কর কবিতা আছে যার মহৎ শিল্পোৎকর্ষ অনতিক্রমণীয়। "পথের প্রেম" (৪৩)-এর মত নিখুঁত শিল্প-সৌষ্ঠবময় রচনা এতে আছে। আরো আছে কয়েকটি নিখুঁতভাবে উত্তীর্ণ মাঝারি এবং ছোটো আকারের কবিতা; যেমন 'মাধবী' (১৪), 'দুই নারী,' (২৩), 'আবার' (২৬), 'তুমি আমি, (২৯) 'পূর্ণের অভাব' (৩১), 'সন্ধ্যায়' (৩২), 'মানসী' (৩৫) ও 'চেয়ে দেখা' (৪০)। এগুলি যেন এক-একটি নিশ্চল, অনির্বাণ, বহুবর্ণ অগ্নিশিখা। কিন্তু এদেরই সঙ্গে মিশে আছে অবিশ্বাস্য বাহুল্যময়, অসংহত এবং অনুজ্জ্বল অনেকগুলি রচনা। 'শাজাহান' নিঃসন্দেহে একটি অপূর্ব-সৌন্দর্যময় রচনা; কিন্তু এর মধ্যেও কিছু অতিভাষণ, কিছু অসংবৃত image-বাহুল্য এবং ছন্দ ও মিলের কিছু দুর্বলতা ধরা পড়ে। এই একই ধরণের ক্রটির ছোঁওয়া আছে সুবিখ্যাত 'ছবি' কবিতাটিতে। এই ক্রটিগুলি আরো বেশী প্রকট 'বিচার' (১১) 'রূপ' (১৬) এবং 'যাত্রা' (১৮)-জাতীয় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ-প্রেরণাময় কবিতাগুলির অনুজ্জ্বল আড়ষ্টতায়। আবার 'ঝড়ের খেয়া'র (৩৭) মত কবিতায় অগভীর অনুভূতির গড়ে-তোলা উত্তেজনা প্রকাশরূপের নিষ্প্রাণ আড়ম্বরে পরিস্ফুট।

"বলাকা"-ই রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত-আবেগময় কাব্যরচনার শেষ-পর্ব। এর

শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির দীপ্ত-মধুর প্রকাশ-ঐশ্বর্য অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত রোমান্টিক কল্পনার প্রথমার্ধের সমস্ত সম্পদ এখানে সংগৃহীত। এই পর্যায়ের অনেক রচনায় যে দুর্বলতা লক্ষণীয়, সংক্ষেপে সে হচ্ছে এক বাঁধনছেঁড়া কল্পনার দুর্বার স্বেচ্ছাচারিতা, যা আপনার গতির আবেগে বার বার শিল্পচেতনার বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে দিক্-বিদিকে। মহত্তম শিল্পসার্থকতা এবং বিস্ময়কর অসার্থকতার বিচিত্র সমাবেশ এই পর্যায়ে।

এর পরবর্তী "পলাতকা"-কাব্যে বিশেষ কোনো নতুন শিল্পপরিণতির পরিচয় নেই। মোটের ওপর "বলাকা"-রই প্রকাশরীতি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে কতকগুলি কাব্যকথিকা রচনায়। শুধু, এই পর্যায়ের 'নিষ্কৃতি' কবিতাটিতে কবির উদ্বেলিত আকাশপ্লাবী কল্পনা এক তীব্র ব্যঙ্গরস এবং এক নিবিড় করুণরসের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে একটি পরিপূর্ণ শিল্পরূপ। ব্যঙ্গরসের সঙ্গে এই সুকোমল করুণ মাধুরীর অপরূপ সমন্বয় এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের সার্থকতম এবং মৌলিকতম সৃষ্টিগুলির স্তরে উন্নীত করেছে।

এর পরেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পজগতে এসেছে এক গভীর পরিবর্তন। উচ্ছ্বসিত ভাবাবাগের অবারিত ছন্দসঞ্চালন এবং অতৃপ্ত image বুননের পর্ব এখানেই শেষ। "বলাকা" এবং "পূরবী"-র মধ্যে ন'-বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। এর মাঝখানে "শিশু ভোলানাথ" প্রকাশিত হয় বটে ; কিন্তু তার মধ্যে কোনো নতুন পরিণতির আভাস পাওয়া যায়না। এই আপেক্ষিক নীরবতার পর্বে গান রচনাই বেশী। এই শান্ত, সুদীর্ঘ, অন্তঃপ্রস্তুতির শেষে যে দুটি গ্রন্থ নতুন বিস্ময়ের ঢেউ তুলে আবির্ভূত হল তারা হচ্ছে "লিপিকা" (১৯২২) এবং "পূরবী" (১৯২৫)।

"লিপিকা"র অন্তত প্রথম চোদ্দোটি রচনা নিছক কাব্য, এবং এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষা। এগুলিতে এবং "পূরবী-"র অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যায় একটি শান্ত-মধুর স্মৃতিগুঞ্জনের সুর ; জীবনের উপর একটি স্নিগ্ধ-গভীর সংবেদনশীল রসসৃষ্টি এবং জীবন-পরপারের মহারহস্যের এক স্নিগ্ধ-ব্যাকুল পরিচয়-প্রয়াস যার করুণ মধুরতার তুলনা আগেকার রবীন্দ্রকাব্যে বিরল। "লিপিকা-"র প্রথমাংশের রচনাগুলিতে পাওয়া যায় গদ্যছন্দের এক অপূর্ব যাদুময় সঞ্চালন, যা সাধারণ কথার ভঙ্গী সম্পূর্ণ বজায় রেখেও অতিগভীর ভাবরাজিকে নিবিড়ভাবে আভাসিত করে। এদের মধ্যে প্রতিফলিত ভাষার আশ্চর্য সূক্ষ্ম কারুকার্য, ধ্বনির অপূর্ব প্রতিধ্বনিময় সমাবেশ এবং অপরূপ ব্যঞ্জনাময়

অল্পভাষিতা যে অসাধারণ শিল্পচেতনার স্বাক্ষর বহন করে তা রবীন্দ্র-কাব্য-শিল্পের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক নতুন এবং অভাবনীয় আবির্ভাব।

মূলত এই একই দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকাশরীতির পরিচয় আছে "পূরবী" কাব্যে। "বলাকা"-র ব্যাকুল উদ্‌গ্রীব পদক্ষেপের বদলে "পূরবী"-র ছন্দগতিতে আছে এক স্মৃতিবিভোর চিন্তাকরুণ মন্থরতা যা নিঃসন্দেহে এক শান্ততর, গভীরতর জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন। এর imagery-র রঙে "বলাকা"-র সেই খরোজ্জ্বল দীপ্তি নেই, এতে আছে এক স্নিগ্ধতর, কোমলতর বর্ণালীর বিচিত্র বুনন। "বলাকা"-র অধিকাংশ কবিতা স্তবকহীন, তাদের মধ্যে অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পংক্তির সমাবেশ। "পূরবী"-র স্নিগ্ধ-গভীর ভাবলোকের প্রকাশে কবি আবার ফিরে এসেছেন ছন্দের বিচিত্র কাঠামোর মধ্যে। বহু বিচিত্র গঠনের এবং আশ্চর্যভাবে ভাবানুগামী স্তবকরচনার কারুকৌশল রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের প্রকাশরীতির একটি পরম বৈশিষ্ট্য। "লিপিকা"-য় কাব্যধর্মী গদ্যছন্দের উপর যেমন রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক অধিকারের পরিচয় আছে, "পূরবী"-তে তেমনি ধরা পড়েছে পদ্যছন্দের বহুবিচিত্র রূপের ওপর তাঁর অতুলনীয় অধিকার। এই মহাশক্তিশালী, অথচ অপূর্ব কোমল ও সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাময় প্রকাশরীতির প্রথম ব্যাপক পরিচয় এই পর্যায়ের কাব্যে, এবং "লিপিকা" ও "পূরবী"-তেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা প্রথম এই নতুন ধরণের পরিপূর্ণতা লাভ করল। তাঁর পরবর্তী জীবনের যাবতীয় কাব্যে পাওয়া যায় এই মৌলিক শিল্পরীতিরই বহু-বিচিত্র পরিণতি।

"পূরবী"-কাব্যের বৈচিত্র্যও মনোরম। প্রেমের বিচিত্র অন্তর্বেদনার অভিব্যক্তি, চিরপলাতক অন্তর্বাণীর ব্যাকুল অন্বেষণ, জীবনের রহস্যময় ওপারের আহ্বান —প্রত্যেকটি মহৎ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই কবি বারবার নিবিড়-সৌন্দর্যময় নিখুঁত শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি বিশ্বকাব্যের অন্যতম বিস্ময় বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। তা-ছাড়া এর অন্তত আরো চোদ্দোটি কবিতা—'গানের সাজি', 'বকুলবনের পাখী', 'আহ্বান', 'আনমনা', 'বিস্মরণ', 'আশা', 'অবসান', 'তারা', 'দান', 'আশঙ্কা', 'শেষ বসন্ত', 'প্রভাতী', 'আকন্দ' ও 'অন্ধকার'—সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষে মহৎ আর্টের পর্যায়ে পড়ে।[১] মনোরম শিল্পসাফল্যের

১ এদের মধ্যে 'আহ্বান' এবং 'অন্ধকার' এই দুটি কবিতার শিল্পরূপকে আমি একেবারে নিখুঁত বলতে পারি না। এদের কোথাও কোথাও একটু সাড়ম্বর আড়ষ্টতা, একটু অতিবিস্তারের আভাস আছে। কিন্তু এই সামান্য ত্রুটি এদের মহত্বকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না। একটিমাত্র স্তবকের আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থএর Immortality Ode-কে মহৎ কাব্য বলে গ্রহণ করতে কোন বিচক্ষণ পাঠকের বাধে না

এই গুণগত এবং পরিমাণগত বিপুলতা "বলাকা"-র মহৎ কীর্তিকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু এই বিস্ময়কর সার্থকতা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাফল্যের অদ্ভুত অসমতা এখানেও কম পরিস্ফুট নয়। "পূরবী"-র অনেক কবিতাই নিতান্ত মাঝারি স্তরের; অনেকগুলি তত্ত্বমূলক কবিতায় পাওয়া যায় এক অদ্ভুত দীপ্তিহীন বাক্যবিন্যাস। গুরুগম্ভীর 'সাবিত্রী' কবিতাটিও এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। তবে, সাধারণভাবে "বলাকা" এবং "পূরবী"-র শিল্পক্রটির মধ্যে এক জাতিগত প্রভেদ আছে। "বলাকা"-র অসার্থক রচনাগুলির অধিকাংশের মধ্যেই সুদৃঢ়, সুচারু শিল্পবন্ধনের অভাব। "পূরবী"-র অনুজ্জ্বল প্রচেষ্টাগুলির ব্যর্থতার জন্য দায়ী, হয় অন্তঃপ্রেরণার আপেক্ষিক ক্ষীণতা, নয়তো অতিসচেতন শিল্পপ্রয়াসের আড়ষ্টতা। সাফল্য এবং ব্যর্থতা—দুয়েরই এই শ্রেণীগত প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প-পদ্ধতির এক গভীর পরিবর্তনের পরিচয় দেয়।

এর অল্প কয়েক বছর পরে প্রকাশিত "বনবাণী" কাব্যে পাওয়া যায় "পূরবী"-রই স্টাইলের নূতনতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ। অধিকাংশ কবিতাই সুন্দর, শিল্পসার্থক, কিন্তু চমকপ্রদ নয়। শুধু একটি কবিতা 'নীলমণিলতা' মহৎ ভাব-ঐশ্বর্যে এবং অতিবিস্ময়কর শিল্পসৌষ্ঠবে অনায়াসেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্যে পরিগণিত হবার যোগ্য। আর একটি মনোরম শিল্পকীর্তি এতে আছে: 'নিবিড অমা তিমির হতে', —ফাল্গুনের মধু-মদির শুক্লরজনীমালার এক মায়াময় রূপকচিত্র। সেটি অবশ্য গান।

"বনবাণী"-র পরবর্তী কাব্য "মহুয়া"-তে কবি আবার ফিরে গেছেন এক অপরূপ প্রাণোচ্ছল লীলাচপলতায়। এই পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের বিচিত্র লীলার অভিব্যক্তি; তার বিভিন্ন সুরের বিচিত্র আকুতির রসরূপায়ণ। এদের অনেকেরই সৌন্দর্য মুগ্ধকর, কিন্তু শিল্পগ্রন্থনা একটু আলগা, একটু এলোমেলো এবং অসতর্ক। এই শৈথিল্য কিন্তু "বলাকা"-পর্বের মত কল্পনা-আবেগের অবারিত উচ্ছ্বাসের ফল নয়; এ একান্তই খেয়ালপ্রসূত। কবি যেন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আবার কাজ নিয়েই খেলা করেছেন, কিছুমাত্র দায়িত্ব না রেখে। কিন্তু প্রেমের বিচিত্র রাগরূপ নিয়ে এই দায়হীন খেয়ালখেলার মধ্যেও কবির আশ্চর্য শিল্প-অধিকারের অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। 'নাম্নী'-অংশের রচনাগুলিতে কবি নারী-ব্যক্তিত্বের বহুবিচিত্র রূপের যে মধুর রসঘন ছবিগুলি এঁকেছেন সেগুলি প্রতীকধর্মী আভাসচিত্রণের মহৎ স্তরে উন্নীত। এ-ছাড়া সামগ্রিক

শিল্পসৌষ্ঠবে অতুলনীয় দুটি বিস্ময়কর কবিতা এতে আছে—'নববধূ' এবং "শেষের কবিতার"-র অন্তর্গত 'বিদায়'। দুটি ক্ষেত্রেই মহত্তম স্তরের ভাবাভিজ্ঞতা নিবিড়-আভাসময় পরিপূর্ণ সৌন্দর্যমূর্তিতে রূপায়িত হয়েছে। এ-ছাড়া আরো অনেকগুলি মাঝারি এবং ছোট আকারের কবিতায় প্রেমের বিচিত্র ভাবরাজির মনোরম শিল্পরূপায়ণ হয়েছে। এই শেষোক্ত রচনাসমূহের অন্তত অর্ধেকগুলি গান[১]। "শেষের কবিতা"-র অন্তর্গত আরো দুটি কবিতাও ('সুন্দর তুমি চক্ষু ভরিয়া' এবং 'তব অন্তর্ধানপটে') এই সর্বাঙ্গসুন্দর প্রেমগাথাগুলির দলে পড়ে, এবং এগুলি ঠিক গান না হলেও নিঃসন্দেহে গীতধর্মী।

কবির এই পর্যায়ের শিল্পসাফল্য "বলাকা" ও 'পূরবী'-র শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি-গুলির স্তরের, কিন্তু আরো অনায়াস-প্রসূত। "মহুয়া"র শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপগুলিতে "বলাকা"র অধীর দ্রুতসঞ্চারণ বা 'পূরবী'-র অন্তর্লীন বিষাদ-মধুর মন্থরতা—কোনটাই নেই। এই স্টাইলের ভারসাম্য নিখুঁত। "কল্পনা" পর্যায়ে কবির রচনাভঙ্গীতে আমরা প্রথম যে easy grace যে spontaneous perfection লক্ষ্য করেছি তারই আর এক অপূর্ব পরিণতি "মহুয়া"-র এই মনোরম রচনাগুলিতে।

কিন্তু কয়েক বছর পরে প্রকাশিত পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "পরিশেষ" নিশ্চয়ই সেদিনের পাঠকের মনে হতাশা এনেছিল। নিশ্চয়ই তাঁদের মনে হয়েছিল, এবার সত্যিই বুঝি শেষ। অল্পসংখ্যক কয়েকটি কবিতাকে বাদ দিলে "পরিশেষ"-এর রচনাগুলিতে একদিকে অভিজ্ঞতার অভিনবত্ব ও তীব্রতার অভাব, আর একদিকে প্রকাশের অনুজ্জ্বল ধূসরতা। "চিত্রা" এবং "পূরবী" পর্যায়ে লক্ষিত সেই নিগূঢ় অন্তর্বাণীর অন্বেষণের সুর এখানে আবার ফিরে এসেছে; কিন্তু তার প্রেরণায় এবার সৃষ্ট হয়েছে একটিমাত্র উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপ—'বিচিত্রা'। আর তিনটিমাত্র মহৎ সাফল্যের দৃষ্টান্ত এই পর্যায়ের মধ্যে আছে—'বিস্ময়' ('আবার জাগিনু আমি') 'প্রতীক্ষা' ('তোমার স্বপ্নের দ্বারে') এবং বহুপরিচিত 'প্রশ্ন' ('ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত') কবিতাটি। আরো দুটি সুন্দর কবিতা এতে আছে—'প্রবাসী' ও 'নূতন'। কিন্তু এগুলি আসলে গান।

কিন্তু "পরিশেষ"-এর এই আপেক্ষিক দীনতা আশ্চর্যভাবে ঢাকা পড়ে

---

১ যেমন 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'আমার নয়ন তব নয়নের', 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে', 'প্রাঙ্গনে মোর শিরীষশাখায়', 'অজানা জীবন বাহিনু' ("গীতবিতান"-এ—'জানি তোমার অজানা নাহি'), 'বাহির পথে বিবাগী হিয়া', 'বিবশ দিন, বিরস কাজ' ("গীতবিতান"-এ 'বিবশ দিন বিরল কাজ')।

যায় মাত্র এক মাস পরে প্রকাশিত "পুনশ্চ" কাব্যে। এখানে যেন রবীন্দ্রনাথ একাত্তর বছর বয়সে আবার এক বিস্ময়কর নতুন মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। "লিপিকা"-র প্রথমাংশের রচনাগুলিতে যে গদ্যকাব্যের পরীক্ষা প্রচ্ছন্ন ছিল তারই পরিপূর্ণ সমারোহে আবির্ভাব "পুনশ্চ"-তে।

প্রথম পরীক্ষার ফল হিসাবে "পুনশ্চ"-র সাফল্য অভাবনীয়। এক বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতালোকের রূপায়ণে এই সম্পূর্ণ অপরীক্ষিত আঙ্গিকের অসংকোচ প্রয়োগের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতার এবং আত্মবিশ্বাসের পরিচয় আছে। কিন্তু শিল্পবিচারের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এর সামগ্রিক সার্থকতাকে মাঝামাঝি স্তরের বলেই মনে হয়। অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যায়, এই প্রাথমিক পর্যায়ে গদ্যছন্দের উপর রবীন্দ্রনাথের অধিকার এখনও অনিশ্চিত। বহু কবিতার বহু জায়গায় পংক্তি-বিভাগগুলি নিতান্তই বেমানান। বহুক্ষেত্রেই পংক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্যের এবং স্বচ্ছন্দ গতির অভাব। এ ছাড়াও আছে অতিভাষণের বিপদ। তা সত্ত্বেও কবিতাগুলির অধিকাংশই উচ্চাঙ্গের শিল্পসৌষ্ঠবযুক্ত না হলেও মোটের উপর সুন্দর।

এই মাঝামাঝি স্তরের শিল্পসাফল্যের মধ্যে অম্লান মহিমায় জেগে আছে কয়েকটি মহৎ কীর্তি। 'কিনু গোয়ালার গলি' হঠাৎ আমাদের এই স্তরের শিল্প-সৌন্দর্যের চরম শিখরে নিয়ে যায়। 'বাজিরাও পেশোয়ার হবে'-তেও পাওয়া যায় প্রায় এই স্তরেরই সার্থকতা। এই স্তরের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে 'খ্যাতি' ('ভাই নিশি') কবিতাটি। আর একটি বিশেষ সৃষ্টি হচ্ছে এক অপূর্ব-ব্যঞ্জনাময় ছন্দসঞ্চালনে রচিত 'খেলনার মুক্তি'-র মহৎ রূপক-কাহিনীটি। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, এই কবিতাগুলি ঠিক গদ্যছন্দে নয়, মিলহীন পদ্যছন্দে রচিত। কিন্তু এই অর্ধমুক্ত ছন্দের কুশলী সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে কবি এই কবিতাগুলিতে জীবন-পরিবেশের ছিন্ন রূঢ় বাস্তব এবং অন্তরের মহৎ ভাবলোকের মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু এই পর্যায়ের অন্তত একটি নিছক-গদ্যছন্দে রচিত কবিতা এক মহত্তম শ্রেণীর জীবনাভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণ শিল্পসার্থকতায় রূপায়িত করেছে। এই 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি একটি ছোটো মহাকাব্য এবং রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনের পথে এটি আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ। কবির স্থির-গম্ভীর বেদনাদৃষ্টির স্রোত এখানে গদ্যছন্দের বন্ধুর ভূমিতে আপনার প্রকাশের জন্য নিখুঁত খাত কেটে নিয়েছে। এ ছাড়াও আছে খাঁটি গদ্যছন্দে লেখা আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি—'সুন্দর' (প্লাটিনমের আংটির

মাঝখানে')। এর সংক্ষিপ্তোজ্জ্বল রূপটির মধ্যে এক গভীর অব্যক্ত অনুভূতির অন্তরে মননের সন্ধানী আলোকরেখার লীলা এক সুন্দর রসপরিণতি লাভ করেছে।

এই ছাড়াও এই নতুন শিল্পরীতির প্রয়োগ ঘটেছে কয়েকটি নিখুঁত ব্যঙ্গ-কৌতুক-মিশ্রিত গদ্যকথিকায়। এদের মধ্যে দুটি অনবদ্য রচনা 'ক্যামেলিয়া' ও 'ভীরু'।

এই সময় থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তার অভিব্যক্তি খুঁজে বেড়িয়েছে পদ্যছন্দ এবং গদ্যছন্দের দ্বৈত পথে। "পুনশ্চ"-র ঠিক পরেই প্রকাশিত "বিচিত্রিতা"-য় কবি আবার ফিরে গেছেন তাঁর চিরপ্রিয় এবং চির-অনুগত পদ্যছন্দের আসরে। এই কবিতাগুলি এক হিসাবে সমস্ত রবীন্দ্রকাব্যে অনন্য : এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা এক একটি চিত্রের ভাব-রূপায়ণ। এই হিসাবে এদের আর্ট অপেক্ষাকৃত সচেতন ; কিন্তু এই সচেতনতা সার্থকতম দৃষ্টান্তগুলিতে কিছুমাত্র আড়ষ্টতার ছাপ রেখে যায়নি। বিভিন্ন ছাঁদের স্তবকে রচিত এই কবিতাগুলির গতিচ্ছন্দে পাওয়া যায় এক মন্থর ভাববিভোরতার আভাস, যা বারবার "পূরবী"-র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এদের প্রায় অর্ধেকগুলির প্রকাশরূপ মোটের উপর নিখুঁত ; কিন্তু মাত্র কয়েকটি কবিতাতেই কতগুলি গভীর অন্তর্ভেদী অভিজ্ঞতা এক সূ'্ম-আভাসময় শিল্পরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে। কবির নিজেরই আঁকা ছবির প্রেরণায় রচিত 'পুষ্প' কবিতাটিতে একটি গভীর রসানুভূতি এক অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্যে রূপায়িত হয়েছে। আবার শ্রীনন্দলাল বসুর 'পসারিণী' এবং গগনেন্দ্রনাথের 'ছায়াসঙ্গিনী'-র **interpretation** হিসাবে কবি যে-দুটি অপরূপ-সৌন্দর্যময় কবিতা সৃষ্টি করেছেন তাদের তুলনা পাওয়া ভার গগনেন্দ্রনাথের আর একটি ছবির প্রেরণায় লেখা সূক্ষ্ম-গভীর মনোদর্শনময় 'কালো ঘোড়া' কবিতাটিরও শিল্পোত্তরণ চমকপ্রদ। এই পর্যায়ের সার্থকতম রচনাগুলির মধ্যে দুটি প্রধান বিশেষত্ব লক্ষণীয় : প্রথমত, সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক দৃষ্টির নিখুঁত কল্পনা-রঙীন রূপায়ণ এবং এই রূপায়ণে প্রযুক্ত এক সূক্ষ্মতর সংকেতলিপি ; এবং দ্বিতীয়ত, অন্যের শিল্প-অভিজ্ঞতার অন্তর্গহনে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করে তার থেকে নতুন-ব্যঞ্জনাময় স্বাধীন শিল্পরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। এ ছাড়াও এই পর্যায়ের কতগুলি কবিতায় লক্ষণীয় এক নতুন-জেগে-ওঠা গভীর-সংকেতময় চিত্রধর্মিতা।

কিন্তু এর ঠিক পরের গ্রন্থ "শেষ সপ্তক"-এ আবার "পুনশ্চ"-তে অনুসৃত গদ্য-কাব্যরীতি ফিরে এসেছে। এর প্রত্যেকটি কবিতাই খাঁটি গদ্যছন্দে রচিত। কিন্তু

এখানেও শিল্পসাফল্য নিতান্তই অসম। কয়েকটি অনবদ্য শিল্প-সৌষ্ঠবময় রচনা এতে আছে: তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে' (৮৩) 'একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে' (২), 'ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন' (৩), 'যৌবনের প্রান্তসীমায়' (৪), 'কেউ চেনা নয়' (১২), রাস্তায় চলতে চলতে' (১৩), 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' (২৮), 'অন্য কথা পরে হবে' (১৫২)। এদের মধ্যে এবং আরো অনেকগুলি মাঝারি স্তরের কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, গদ্যছন্দের সঞ্চালনে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অগ্রগতি এবং এই নতুন রীতির উপর তাঁর নিশ্চিততর অধিকারের ছাপ। 'পূরবী'-র অপরূপ-ছন্দে-গাঁথা শান্ত-উচ্ছ্বাসময় 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটিতে যেমন রবীন্দ্রনাথ আপনার অন্তরের অম্লান চিরনবীনকে উদ্বোধিত, অভিনন্দিত করেছেন, "শেষ সপ্তক"-এর 'পঁচিশে বৈশাখ'-এ তিনি তেমনি তাঁর সমগ্র জীবনের মহান বিবর্তনধারার এক অপূর্ব স্নিগ্ধ-গম্ভীর অথচ রসমধুর শিল্পচিত্র এঁকেছেন। জীবনের এই চলচ্চিত্রগুলির ঈষৎ-বিশ্লেষণী ধারাবাহিকতা অদ্ভুত সার্থকতা লাভ করেছে এই আশ্চর্য শক্তিশালী মুক্তছন্দের ভিতর দিয়ে।

অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে যে-গুলিতে কবি এক গভীর অনুভূতির ভিতর দিয়ে গভীর সত্যোপলব্ধিতে পৌঁছেছেন সে-গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যপক্ষে, প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বমূলক কবিতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত আড়ষ্ট ও অনুজ্জ্বল। এ ছাড়াও কয়েকটি নিখুঁত এবং প্রায়-নিখুঁত কবিতাকে বাদ দিলে, অধিকাংশ রচনাতেই ধরা পড়ে কবির চিরদিনের শিল্প-ত্রুটি—অতিভাষণ এবং অতিবিস্তার। কিন্তু এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে গদ্যছন্দের মহৎ প্রয়োগ ছাড়াও ভাষার এক সূক্ষ্ম-আভাসময় কোমল ঔজ্জ্বল্য পাঠককে অভিভূত করে। এখানে কবির স্টাইল যেন রোমান্টিক আভাসচিত্রণের এক নতুন স্তরে এসে পৌঁছেছে, যার প্রথম পরিচয় ছিল "বিচিত্রিতা"-য়।

এর পরের কাব্যগ্রন্থ "বীথিকা"-য় করি আবার ফিরে গেছেন পদ্যছন্দে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে নেমে এসেছেন এক আপেক্ষিক অনুজ্জ্বলতায়। বিষয়ের দিক দিয়ে "বীথিকা"-র বৈচিত্র্য মনোরম; অন্তর্জীবনের বহু বিচিত্র নাটকীয় মুহূর্তের পরিচয় এতে আছে। কিন্তু চেতনার আপেক্ষিক আলস্যের ভিতর দিয়ে এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তীব্রতায় ফুটে উঠতে পারেনি। "পরিশেষ"-এর কবিতাগুলির মত এদের শিল্পরূপও তাই অনেকটা বর্ণহীন। যে-কয়েকটি শিল্পোত্তীর্ণ রচনা আছে তাদের অধিকাংশই গান। বাকিগুলির মধ্যে যে দুটি অনন্য সৃষ্টি আছে তাদের

একটি হচ্ছে অবিস্মরণীয় 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি। কবির চুয়াত্তর বছর বয়সে লেখা এই নির্বাক-করা প্রেমগাথাটিতে যৌবনের মধুরতম ইন্দ্রিয়মোহের রসমাধুরী ও উদ্বেল প্রেমতৃষা যেন কোন অভাবনীয় যাদুবলে মিশে গেছে সব-ফেলে-আসা বার্ধক্যের কৌতুক-মুখর বিষাদ-মধুর কল্পনালীলার সঙ্গে। এই দিক দিয়ে কবিতাটি বোধ হয় সমস্ত বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য। বহু বিচিত্র ভঙ্গি, বহু বিভিন্ন সুর এখানে মিলিত হয়েছে এক নিখুঁত রূপের নিবিড় আবেদনজালে। এর অপরূপ দেহরচনায় সমন্বিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহু-বিবর্তিত শিল্পচেতনার সমস্ত মহৎ সম্পদ। এই কবিতাটি সহজেই "ক্ষণিকা"-র রচনাগুলিকে মনে পড়িয়ে দেয়; কিন্তু কী আশ্চর্য তফাৎ। এই অপরূপ মায়াময় সূক্ষ্মতা এবং এই স্নিগ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের সর্বজয়ী সার্থকতার নির্দেশক।

এই পর্যায়ের দ্বিতায় অপূর্ব সৃষ্টি—'মাটিতে-আলোতে'। কিন্তু এই মহৎ রচনাটিতেও শিল্পচেতনার শৈথিল্য ধরা পড়ে ছন্দসঞ্চালনের আপেক্ষিক দুর্বলতায় ও অন্তত একটি দীর্ঘ image-এর অসংলগ্নতায়। শিল্পচেতনার এই অলসতা "বীথিকা"-র অধিকাংশ কবিতায় এনে দিয়েছে বক্তব্যের অতিবিস্তার এবং সংগঠনের বহুবিধ দুর্বলতা।

কিন্তু এর পরেই কবির পঁচাত্তর বছর বয়সে প্রকাশিত দুটি গদ্যকাব্যগ্রন্থে কবির পরিণত কাব্যশিল্প আবার এক বিস্ময়কর সার্থকতার স্তরে পৌঁছেছে। প্রথমে প্রকাশিত "পত্রপুট" গ্রন্থের প্রায় আগাগোড়াই পাওয়া যায় কবির কল্পনা-দৃষ্টির এক আশ্চর্য প্রখরতা। অভিজ্ঞতাগুলির মহান নিবিড়তা স্তরে স্তরে মূর্ত হয়ে উঠেছে অসাধারণ উচ্চাঙ্গের শিল্পরচনায়। এখানে গদ্যছন্দের সঞ্চালন আরো সুন্দর, আরো ভাবানুগামী, এবং ভাষার বুননে এক উজ্জ্বলতর স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতর ইঙ্গিতময়তা প্রতিভাত। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মিলিত ক্ষেত্রের উপর এক বহুপরিণত, উৎসুক ধ্যানদৃষ্টির পাতনে উদ্ভূত এক-একটি বিপুল অভিজ্ঞতার কল্পনা-মনন-মিশ্রিত নিবিড় রূপ পরিপূর্ণ মহিমায় ধরা পড়েছে "পত্রপুট"-এর গভীর-আভাসোজ্জ্বল, তীক্ষ্ণতর, বলিষ্ঠতর স্টাইলে। এই গ্রন্থের আঠারোটি কবিতার অন্তত অর্ধেকগুলি সামান্য শিল্প-ত্রুটি সত্ত্বেও অনায়াসেই মহৎ আর্টের পর্যায়ে পড়ে। এদের মধ্যে দুটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের চিরবিস্ময়কর সৃষ্টিগুলির গৌরবলোকে উত্তীর্ণ। তাঁদের মধ্যে একটি হচ্ছে "সঞ্চয়িতা"-য় 'পৃথিবী' নামে সংকলিত এই পর্যায়ের তৃতীয় কবিতাটি। মোহিতলালের কল্পিত ত্রুটিগুলির[১] উপস্থিতি সত্ত্বেও এই কবিতাটির

১ মোহিতলাল মজুমদার: "সাহিত্যবিতান"

আবেদন প্রচণ্ড। এখানে এক বিপুল বিশ্বচারী কল্পনাদৃষ্টির মহান সামগ্রিকতায় অসংখ্য বৈপরীত্যের অত্যাশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে ; পৃথিবীর দৃশ্যপটের অগণ্য বৈচিত্র্যের উপর ঘটেছে এক অতিমানবীয় ধ্যানদৃষ্টির মহোজ্জ্বল আলোকপাত ; অসংখ্য মন-ধাঁধানো প্রচণ্ড-শক্তিময় চিত্রাবলী একটি বিপুল ধ্যানচিত্রে আশ্চর্যভাবে সমাবিষ্ট হয়েছে। এতে ব্যবহৃত মহাশক্তিময় গদ্যছন্দের বহুবিচিত্র গতিভঙ্গীতে এই বিপুল অভিজ্ঞতাটির মহান নিশ্বাসের ছন্দ প্রতিধ্বনিত।

"পত্রপুট"-এর আর একটি পরম বিস্ময় হচ্ছে পঞ্চম রচনাটি : 'সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে'। এখানে কবির অন্তর্ভেদী ধ্যানদৃষ্টিতে জেগে উঠেছে সমগ্র জীবনক্ষেত্রের মর্মস্থলে ভাসা এক বিচিত্র অসঙ্গতির মহাবেদনাময় irony-র মূর্তি। এই অতিগভীর-ব্যঞ্জনাময় কবিতাটিতে আছে এক বেদনা-নিবিড় রহস্য-বিহ্বলতার শান্ত সত্যোপলব্ধিতে অবসান, এবং এই অভিজ্ঞতাটি অপরূপ ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে এক চমকপ্রদ সৌন্দর্যময় প্রকাশরূপে। এই কবিতাটির সবচেয়ে বিস্ময়কর গুণ বোধহয় অপূর্ব কৌশলে গঠিত স্তবক-পরম্পরার ভিতর দিয়ে এর গূঢ় ভাবরূপটির নিখুঁত বিবর্তন। এর আরো একটি বিস্ময়কর গুণ হচ্ছে এর ভিতরে ঘটনাময় দৈনন্দিন বাস্তবের সাধারণ জগৎ এবং এক মহৎ ধ্যানদৃষ্ট ভাবলোকের মধ্যে কল্পনাশক্তির আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ আনাগোনা। পরিপূর্ণ শিল্পরূপায়ণের দিক দিয়ে এ কবিতাটি 'পৃথিবী'-র চেয়েও বিস্ময়কর।

মাত্র চার মাস পরে প্রকাশিত "শ্যামলীর"-র সাধারণ শিল্পসার্থকতা প্রায় "পত্রপুট"-এরই স্তরের। এর স্টাইলও আপাতদৃষ্টিতে "পত্রপুট"-এরই স্টাইলের অনুবর্তী। তবু সুরসিক পাঠক এই দুটি কাব্যধারার মধ্যে স্বাদের এক সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভব করবেন। "পত্রপুট-"এর কল্পনার বিপুল বহিঃপ্রসার এবং প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতর ছাঁদ ও তীক্ষ্ণোজ্জ্বলতার বদলে এখানে আবার ফিরে এসেছে "পূরবী" এবং "বিচিত্রিতা"র প্রেমগাথাগুলির সেই উৎসুক করুণ অন্তর্মুখীতা এবং "শেষ সপ্তক"-এ সূচিত সেই কোমল ·পেলবতার আভাস। "চিত্রা" ও "কল্পনা" পর্যায়দুটির রচনারীতির মধ্যে যে বিস্ময়কর পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করেছি, বহু বিচিত্র বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সেই সুক্ষ্ম রসবৈষম্যই যেন আবার ফিরে এসেছে "পত্রপুট" ও "শ্যামলী"র এই দুটি বিশিষ্ট রচনাভঙ্গিতে।

অল্প কয়েকটি অসার্থক রচনাকে বাদ দিলে "শ্যামলী-"র অধিকাংশ কবিতারই শিল্পোত্তরণ খুবই উচ্চাঙ্গের—যদিও বহু ক্ষেত্রেই একেবারে নিখুঁত নয়। এদের মধ্যেও তিনটি চরম স্তরের শিল্পসৃষ্টি পাওয়া যায় 'বাঁশিওয়ালা,' 'মিল-ভাঙা' এবং

'শ্যামলী'। 'শ্যামলী' কবিতাটিতে অপরূপ কোমল ছন্দসঞ্চালন এবং নিবিড় ভাবব্যঞ্জক imagery-র একান্ত সহজ আহ্বান ও গ্রন্থনে বাঁধা পড়েছে আমাদের এই সবুজ পৃথিবীর প্রতি আসন্নবিদায় প্রেমিক-কবির আর একটি অপূর্ব সম্ভাষণ। 'পত্রপুট'-এর কবিতাটিতে কবি ধরিত্রীকে দেখেছেন তার অসংখ্য বৈপরীত্য-সংহিত, নিষ্ঠুর-মহিমময় রূপে। "শ্যামলী"-তে তিনি সেই ধরিত্রীকেই দেখেছেন বর্ষার শ্যামল ছায়ায় ঘেরা, এবং তার মধ্যে যেন চিনেছেন এক চির-কোমলা অথচ চির-উদাসীনা প্রেমিকাকে, যে ভালবাসে, কিন্তু বেঁধে রাখতে চায়না, যে আজ তার দীর্ঘ-প্রণয়ধন্য কবিকেও শান্ত হেসে বিদায় দিতে প্রস্তুত। ভাবের, mood-এর এই গভীর পার্থক্যের জন্য "পত্রপুট"-এর কবিতার সেই গুরুগম্ভীর grand style-এর বদলে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে এক অপরূপ স্নিগ্ধ-করুণ কোমলতার ভাষা। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে রচিত একই মৌলিক বিষয়ের উপর এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন-আবেদনময় কবিতা রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের অভাবনীয় পরিণতির চরম পরিচয় বহন করে।

"শ্যামলী"-র অন্য দুটি শ্রেষ্ঠ কবিতার সামগ্রিক শিল্পমূল্য এমনিই উচ্চস্তরের। 'বাঁশিওয়ালা'-য় কবির বিদ্যুৎবাণীস্পৃষ্ট মুক্তিকামী নারী-অন্তরের মহান জীবনাকৃতি, এবং 'মিল-ভাঙা'-য় ট্র্যাজিডি-অতিক্রান্ত বহুপরিণত-প্রেমিক-অন্তরে অকালসমাপ্ত বসন্তের নিদারুণ স্মৃতিছায়াপাত যে নিখুঁত-সমন্বিত সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাময়, পদে-পদে-বিহ্বল-করা শিল্পরূপে ব্যক্ত হয়েছ তা শব্দাভাসের সূক্ষ্মতায় এবং এক অবর্ণনীয় কোমলতার আবেদনে "শেষ সপ্তক"-এ প্রযোজিত স্টাইলেরই চরম পরিণতি। 'মিল-ভাঙা' কবিতাটিতে ভাববিবর্তন. ছন্দ-সঞ্চালন, image-গ্রন্থন এবং ধ্বনিসমাবেশ —সবই যেন পৌঁছেছে এক অভাবনীয় সৌন্দর্যের স্তরে। এই অলৌকিক সৌন্দর্যের অমৃতাভাস যেন রবীন্দ্রনাথেরও সমস্ত পূর্বকীর্তিকে ছাড়িয়ে গেছে।

এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে সাধারণভাবেই সজাবতার আপেক্ষিক অভাব ধরা পড়ে। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত "প্রান্তিক" ও "সেঁজুতি"-তে এই ঘনায়মান ম্লানতা পরিস্ফুট। এই কবিতাগুলির মধ্যে আভাসিত কবির জীবনান্ত-সম্মুখীন শান্ত চেতনার বিচিত্র মানস-প্রতিক্রিয়াগুলি তাঁর অন্তর্বিবর্তনের এই অন্তিম পর্যায়ের উপর গভীর আলোকপাত করে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, দু-একটি উজ্জ্বল সৃষ্টিকে[১] বাদ দিলে, এই অভিজ্ঞতাগুলির

[১] এদের মধ্যে আছে "প্রান্তিক"-এর অন্তর্গত সাতজোড়া মহাপয়ারে রচিত আশ্চর্য সুন্দর সনেট—'যাবার সময় হল বিহঙ্গের'।

পরিস্ফুটন দুর্বল। এদের শিল্পরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ, আভাসবিরল, বৈশিষ্ট্যহীন।

কিন্তু এর কিছু পরেই ১৩৪৩-এর বৈশাখে প্রকাশিত পদ্যগ্রন্থ "আকাশপ্রদীপ"-এ আবার কবির শিল্পশক্তির এক অপ্রত্যাশিত ঊর্ধ্বগতি লক্ষিত হয়। এখানে কবির ক্ষণ-আচ্ছন্ন শিল্পচেতনা আবার জেগে উঠেছে এই জীবনের রহস্য-রঙীন পরিবেশের ফিরে-পাওয়া স্পর্শে। "আকাশপ্রদীপ"-এর অধিকাংশ কবিতার শিল্পরূপ যে সাধারণভাবে পূর্ববর্তী পর্যায়ের রচনাগুলির চেয়ে উন্নত, শুধু তাই নয়; এদের মধ্যে আছে দুটি অনবদ্য সুষমাময় সৃষ্টি: 'বধূ' ('ঠাকুরমা দ্রুততালে') এবং 'শ্যামা' ('উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ')। এখানে ভাষার মধ্যে জেগে উঠেছে বহু-বাধা-অতিক্রান্ত এক অপূর্ব স্নিগ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য, অপরূপ ব্যঞ্জনাময় imagery-র অতি-সাবলীল শিল্প-গ্রন্থন এবং অতিনিবিড় ভাবানুভূতির এক মৃদুস্পর্শময় সংকেত-আভাসন। এই অতিসূক্ষ্ম-ইঙ্গিতময় শব্দসমাবেশ এবং ধ্বনিচিত্রণের যে অভিনব শক্তির পরিচয় এই দুটি কবিতায় পাওয়া যায় তার সম্ভাবনার এখানেই শেষ নয়।

এর ঠিক এক বছর পরে প্রকাশিত "নবজাতক"-এ আবার কবির শিল্পচেতনায় ভাটা পড়েছে। স্তিমিত চেতনার মন্থর স্রোতে ভেসে-ওঠা বিশ্বজীবনের বিচিত্র অন্তর-রহস্যের এই প্রশ্নানুভূতিগুলি যে প্রকাশরূপে ব্যক্ত হয়েছে তার মধ্যে একটি শান্ত সৌন্দর্য থাকলেও তাতে আগেকার চমকপ্রদ আভাসনশক্তির অভাব।

কিন্তু এর মাত্র কয়েক মাস পরে প্রকাশিত (১৯৪০) "সানাই" গ্রন্থে আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আবার কবির সামগ্রিক শিল্পচেতনার এক পরম বিস্ময়কর পুনরভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়। রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনের সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এই পর্যায়টিই বোধহয় সবচেয়ে আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিত। কবির এতদিনের অনুসৃত সমস্ত শিল্পরীতির সমস্ত বিচিত্র ঐশ্বর্য যেন এক অভিনব সূক্ষ্মরূপে পুনরাবির্ভূত হয়েছে "সানাই"-এর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে। এখানে ছন্দের সূক্ষ্ম-রণিত স্বতস্ফূর্ত পদক্ষেপে আশ্চর্যভাবে জেগে উঠেছে অতিগভীরের দ্যোতনা; কল্পনায় ফিরে এসেছে এক অপরূপ নতুন বর্ণালির মায়াজাল; imagery-র মধ্যে জেগে উঠেছে মনোরম রূপচিত্রণের মধ্যে আভাসিত অতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ঝিলিমিলি। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, 'সানাই' ('সারারাত ধরে') বা 'যক্ষ' ('যক্ষের বিরহ চলে') জাতীয় কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রচনাকে বাদ দিলে এ পর্যায়ের অধিকাংশ সার্থক রচনাই হয় গান, নয় তো স্পষ্টভাবেই গীতধর্মী। অশীতিবর্ষ কবির চরম-পরিণত মনের এই কল্পনা-

তারুণ্যের অপরূপ তরঙ্গোচ্ছ্বাস যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল-আভাসময় অপূর্ব-সৌন্দর্য-বিভোর আর্টে অভিষিক্ত হয়েছে তার তুলনা সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও নেই।

কাব্যকলার বিচিত্র রূপসাধনার ক্ষেত্রে কবির শিল্পচেতনার এই শেষ মহৎ প্রয়াস। এর পরে তিনি আরো একবছর বেঁচে ছিলেন এবং ঐ অল্প সময়ের ভিতরে গুরুতর অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর শেষ কয়েকটি গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি রচনা করেন। কিন্তু এই পর্যায়ে তিনি জীবনের রস-রঙীন বেদনা-মধুর আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন জীবন-মৃত্যুর ছায়াময় সীমান্তদেশে। এই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁর চেতনাকে স্বচ্ছ বাষ্পের মত বহু দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত করে কবি যেন ঐ দুটি পারের মধ্যে আকস্মিক প্রেরণার মুহূর্তে-মুহূর্তে এক গভীর অর্থের সেতু রচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলিতে তাই পাওয়া যায় একটি আশ্চর্য visionary quality। কিন্তু এই vision গুলির রূপায়ণের মধ্যে কোন শিল্পপ্রয়াসের লেশমাত্র নেই। চেতনার আকস্মিক জোয়ারের স্রোতে তারা যেভাবে বেরিয়ে এসেছে ঠিক সেইভাবেই যেন জমাট বেঁধে গেছে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে 'ধূসর গোধূলিলগ্নে' ("জন্মদিনে"), 'সংসারের প্রান্ত জানালায়' ("আরোগ্য"), 'রূপ-নারাণের কূলে', 'প্রথম দিনের সূর্য', 'দুঃখের আঁধার রাত্রি', 'তোমার সৃষ্টির পথ' ("শেষলেখা") প্রভৃতি এই পর্যায়ের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা মিলহীন পদ্যছন্দে রচিত, অথচ এদের মধ্যে কোনও মিলের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। এদের মধ্যে লক্ষিত প্রকাশের একান্ত-স্বতস্ফূর্ত অচেতন-অলংকৃত প্রত্যক্ষতা এবং এক আশ্চর্য অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্ততা কবিতাগুলির মধ্যে যেন দূরশ্রুত মন্ত্রোচ্চারণের রহস্য-নিবিড় আবেদনের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত সচেতন শিল্পপ্রয়াস পরিত্যাগ করেও তাই এই পর্যায়ের অনেকগুলি রচনা আর্টের পরম সার্থকতায় উত্তীর্ণ।

আঙ্গিকের দিক থেকেও কবির এই অন্তিম রচনাগুলি তাঁর শিল্পী-অন্তরের উপর আলোকপাত করে। "মহুয়া" পর্যায়ের পর থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের দ্রুত পরিবৃত্তি (alternation)। কবির কাব্যপ্রেরণার দুটি ঈষৎ-ভিন্ন প্রয়োজনের পরিপূরক বলেই এই দুটি প্রকাশরীতি এত দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর পূর্ণ-পরিণত কাব্যে প্রযুক্ত হয়েছে। গদ্যছন্দ যে কবির বার্ধক্যকালের একটি অভিনব খেয়ালমাত্র নয়, তা যে কবির পরিণত প্রতিভার এক অপরিহার্য প্রয়োজনেই উদ্ভূত, বিচক্ষণ পাঠকের কাছে তার অজস্র প্রমাণ কবির

গদ্যকাব্যের অবর্ণনীয় উৎকর্ষেই আছে। কিন্তু এই সত্য তাঁর বিদায়ক্ষণের অকৃত্রিম অন্তর্ভাষণগুলিতেও আভাসিত। এই শেষ-পর্যায়ের মন্ত্রোপম রচনাগুলিতে যেন গদ্য ও পদ্যছন্দের বিশিষ্ট দুটি আবেদন এক হয়ে মিশে গেছে এক স্বতোৎসারিত শান্ত-গম্ভীর প্রকাশভঙ্গিতে। এদের মধ্যে যেন মিলহীন, দৈর্ঘ্যনিশ্চয়তাহীন গদ্যছন্দেরই স্বাধীন অনির্দেশ্য পদক্ষেপে সঞ্চারিত হয়েছে পদ্যছন্দের এক অতিমৃদু নিয়ন্ত্রণীস্পর্শ। বিচিত্র আঙ্গিকের সাধক কবির সর্বশেষ প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে গদ্য ও পদ্যছন্দের এক মহাশক্তিময় মিলিত মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের বিবর্তনের এই ধারাবাহিক আলোচনাটির মধ্যে আমরা তাঁর কাব্যসৃষ্টির একটি দিককে প্রায় বাদই দিয়ে গেছি। সে হচ্ছে তাঁর গীতরচনার জীবনব্যাপী ধারাটি। কাব্যকলার এই পর্যালোচনায় অবশ্য আমরা রবীন্দ্রনাথের গান বলতে বোঝাব শুধু তাঁর গানগুলির কাব্যরূপকেই। সংগীত হিসাবে এদের মূল্য ব্যতিরেকেও পরিপূর্ণ গীতিকাব্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে এদের বিশিষ্ট স্থান। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যশিল্পের মূল লক্ষণগুলির অনুধাবন এবং মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের শেষে তাঁর সেই বিপুল-সংখ্যক গীতি-কবিতাগুলির স্বরূপ এবং মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য

১

রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের এই সুবিপুল ধারাটির অনুসরণের পথে রীতিমত স্থিরচিত্ত পাঠকের মনেও এক বিভ্রান্ত বিস্ময় ক্রমশই ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এই বিস্ময়-বিমূঢ়তার কারণ রবীন্দ্রকাব্যের ধারাটির গতিপথে অসংখ্য রূপবদলের চমক, অভাবনীয় বৈচিত্র্যের বিহ্বল-করা সমাবেশ।

একই কবির কাব্যে এত অসংখ্য রকমের প্রকাশরূপের মেলা, এত বিচিত্র artistic effect-এর সমাবেশ সমস্ত বিশ্বকাব্যের ইতিহাসেও দুর্লভ। "চিত্রা", "কল্পনা", "কথা", "ক্ষণিকা", "গীতিমাল্য", "বলাকা", "পূরবী", "মহুয়া", "পুনশ্চ", "শেষ সপ্তক", "পত্রপুট", "শ্যামলী", "সানাই", "শেষ লেখা"—এদের প্রত্যেকটিতেই একই ব্যক্তিত্বের ক্রমবিবর্তিত জীবন-প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ হয়েছে এক-একটি অনুপম-বৈশিষ্ট্যময় শিল্পরীতিতে। আবার তাঁর শিল্পসাধনার ক্রমবিকাশের এক-একটি পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু এক-একটি বিশেষ ধরণের রূপসৃষ্টি করেছেন, তাই নয়; তাঁর সমগ্র কাব্যকীর্তির মধ্যে শিল্পরচনার অগণিত বৈচিত্র্য বিকীর্ণ। মহৎ দার্শনিক দৃষ্টির অনুভূতিব্যঞ্জক গুরুগম্ভীর ode-এর পাশে পাওয়া যায় ক্ষণিক জীবনানুভূতির এক একটি ঘনীভূত মুহূর্তের আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ। মনোরম রত্নমালার মত ছোট ছোট লিরিকের পাশে অম্লান মহিমায় জেগে আছে 'বিদায়-অভিশাপ' বা 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'-এর মত মহৎ নাট্যকাব্য। বিচিত্র পদ্যছন্দে গাঁথা অপূর্ব-সঙ্গীতময় সৃষ্টির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মুক্তছন্দে গাঁথা তীক্ষ্ণোজ্জ্বল রচনা। অগ্নিময় কল্পনার উদ্‌গ্রীব পদক্ষেপের পাশেই ধ্বনিত হয়েছে স্নিগ্ধ-গভীর জীবনপ্রীতির স্মৃতিবিভোর, চিন্তাকরুণ পদধ্বনি। অপূর্ব image-গ্রন্থনের অমোঘ পারম্পর্যে গঠিত, অলঙ্কারের চরম গৌরবে অভিষিক্ত রচনার ফাঁকে ফাঁকে পাওয়া যায় হৃদয়ের সরল বেদনাবাণীর আশ্চর্য রকমের অনলঙ্কৃত মর্মস্পর্শী প্রকাশ। স্তবকে স্তবকে, বিপুল মহিমায় ধীরে ধীরে শতদল-পদ্মের-মত ফুটে-ওঠা 'উর্বশী' বা 'বলাকা' বা 'আহ্বান'-এর মত magnificent সৃষ্টির পাশেই ছড়ানো আছে অল্প কয়েকটি পংক্তির অনবদ্য গ্রন্থনে রচিত এমন সব ক্ষীণকায় epigram-জাতীয় কবিতা যাদের মধ্যে এক-একটি মহৎ ভাবলোক এক-একটি বিস্ময়কর সৌন্দর্যমূর্তিতে সংগৃহীত হয়েছে।

ইংরেজী কাব্যের ক্ষেত্রে একটিমাত্র ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, কোন কাব্যশিল্পীই বোধহয় এই আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। মিল্‌টন-এর কাব্যে Nativity Ode থেকে Samson Agonistes পর্যন্ত একটি মহাবৈশিষ্ট্যময় স্টাইলেরই কয়েকটি ক্রমবিবর্তিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর সার্থক রচনাগুলিতে অপরূপ মর্মস্পর্শী সরলতা এবং মিলটন্‌-এর প্রভাবপুষ্ট এক সুগম্ভীর ধ্বনিময় গরিমা—এই দুরকম শিল্পরীতির আভাস পাওয়া যায়। শেলি-র একটিমাত্র স্টাইলই আছে বলে মনে হয়। কীট্‌স্‌-এর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, কিন্তু অবকাশ ছিল কম। Endymion থেকে Ode to a Nightingale পর্যন্ত যেন একই মূল প্রকাশরীতির পরিপূর্ণতর, বিশুদ্ধতর প্রয়োগ দেখা যায়। শুধু Ode on a Grecian Urn-এ এবং শেষের দিকের আরো কয়েকটি রচনায় শব্দ-সমন্বয়ের অবর্ণনীয় যাদুর সঙ্গে জেগে উঠেছে এক গভীরতর মননশীলতা এবং এক মহত্তর ভাববিবর্তন-রীতির আভাস। কিন্তু এই অলৌকিক-শক্তিময় কবির শোচনীয় অকালমৃত্যু তাঁর এই নতুন শিল্প-সম্ভাবনাকে আর কোন পরিণত রচনায় দানা বাঁধতে দেয়নি। টেনিসন্‌-এর style-এর মধ্যে কিছু মনোরম বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু মোটের উপর তাঁর দুটি বিশিষ্ট প্রকাশপদ্ধতি; একটি তাঁর English Idylls এবং Idylls of the King-জাতীয় মধ্যযুগীয় আখ্যায়িকায় ব্যবহৃত, এবং অন্যটি নিয়োজিত তাঁর অপরূপ-সঙ্গীতময় লিরিক এবং lyrical narrative-গুলিতে। আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে একমাত্র ব্রাউনিং-এর স্টাইলেই অনেক বৈচিত্র্যের সমাবেশ আছে বলে মনে হয়। নিঃসন্দেহে বহু রকমের চমকপ্রদ artistic effect-এর অধিকারী তিনি। তাঁর বিশিষ্ট নাট্যকাব্যে প্রযুক্ত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বধর্মী স্টাইল সত্যিই তার রোমাঞ্চকর বৈচিত্র্যে আমাদের চমক লাগায়। কিন্তু ব্রাউনিং-এর স্টাইলের এই বৈচিত্র্য খাঁটি লিরিকের ক্ষেত্রে নয়, কতগুলি নাটকীয়[১] পরিস্থিতি এবং অন্তরাবস্থার রূপায়ণের ক্ষেত্রে, এবং এই বৈচিত্র্য অনেকাংশেই কল্পিত পাত্র এবং পরিস্থিতির বৈচিত্র্যেরই প্রতিফলন। দ্বিতীয়ত, স্থিরভাবে লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে যে ব্রাউনিং-এর স্টাইল আপাতদৃষ্টিতে যতটা বৈচিত্র্যরঞ্জিত মনে হয়, আসলে ততটা নয়। তাঁর বহু আপাত-ভিন্ন প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সত্যিকারের তফাৎ সামান্যই।

ইংরেজী সাহিত্যে শুধু একজন কাব্যশিল্পী রূপসৃষ্টির এই অপূর্ব বৈচিত্র্যের

১। এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে dramatic অর্থে, theatrical অর্থে নয়।

দিক দিয়ে অনায়াসেই রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ। তিনি অবশ্যই শেক্স্পীয়ার। Love's Labours Lost থেকে The Tempest পর্যন্ত সাঁইত্রিশটি ক্রমবিবর্তিত নাটকের মধ্যে এবং তাঁর বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সনেটের ভিতর বিষয়বস্তু এবং মনোভাবের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যকে তিনি যে আশ্চর্য রকমের বিচিত্র শিল্পসৌন্দর্যে ব্যক্ত করেছেন তার তুলনা নেই। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে artistic effect-এর এই অসীম বৈচিত্র্যে তিনি অনায়াসেই বিশ্বসাহিত্যের শীর্ষে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন তাঁর বিশিষ্ট ক্ষেত্র হচ্ছে নাট্যকাব্য, যেখানে প্রকাশরূপের এই বৈচিত্র্য অনেকটাই স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। সে-ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পভাষণের এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য তাঁর অতুলনীয় objective vision-এরই পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথের পরম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিছক লিরিকধর্মী কাব্যের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব, অভাবিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, এবং এই দিক দিয়ে তিনি বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারেই অনন্য। তাঁর এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য-তরঙ্গিত কাব্যক্ষেত্রকে একমাত্র ঋতুরঙ্গময়ী ধরিত্রীর স্বতঃবিবর্তিত রূপমালার সঙ্গেই তুলনা করা যায়। এই বিচিত্র শিল্পরূপরাজি কোন পর্যায়েই সচেতন, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়। স্টাইলের অভিনব ভঙ্গিগুলি কবির অবিরাম-বিবর্তিত চেতনার বিভিন্ন মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ার প্রেরণায় অনিবার্যভাবেই জেগে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের যে কোন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির প্রকাশভঙ্গির আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সেই স্টাইল অপূর্ব ভাবানুগামী। সে-সব ক্ষেত্রে ভাবাভিজ্ঞতা ও প্রকাশরূপের এমন এক অলৌকিক সমন্বয় ঘটেছে যে সেই ভাবলোকের অন্য কোনো রকম সার্থক রূপায়ণ কল্পনাতীত। এই আশ্চর্য-রকমের বিচিত্র শিল্প-আবেদনময় লিরিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর আর সব কবিদের বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছেন।

রবীন্দ্র-কাব্যকলার সামগ্রিক পর্যালোচনায় আর একটি পরম আশ্চর্য চোখে পড়ে। সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সার্থক কবিজীবনের বিলম্বিত আরম্ভ এবং তার বিস্ময়কর প্রসার সুদীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিরা, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী রোমান্টিকরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত অল্পবয়সেই তাঁদের অলৌকিক সৃজনীশক্তির চরম শীর্ষে উপনীত হয়েছেন, এবং সেই দ্রুত-পরিণত শিল্পশক্তির অন্তত দু-একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তও সেই বয়সেই জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে শেলি-র সাতাশ বছর বয়সে রচিত Ode to the West Wind, কীট্স্-এর পঁচিশ বছরের মধ্যে লেখা অবর্ণনীয়-সৌন্দর্যময় ode-গুলি এবং রোজেটি-র মাত্র উনিশ বছর বয়সে লেখা The Blessed Damozel। সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের

কাব্যশিল্পের পরিণতি রীতিমত বিলম্বিত। তাঁর প্রথম চরম পর্যায়ের শিল্পকীর্তি 'উর্বশী' রচিত হয় তাঁর চৌত্রিশ বছর বয়সে। শুধু তাই নয়, 'উর্বশী'-র সমসাময়িক অনেক রচনাতেই তাঁর কাব্যকলার অপরিণতি সুস্পষ্ট। তাঁর শিল্পশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ তখনও কিছু দূরে।

রবীন্দ্রনাথের মত অমিতশক্তিশালী কবির কাব্যশিল্পের এই বিলম্বিত পরিণতি নিঃসন্দেহে বিচক্ষণ পাঠকের মনে গভীর কৌতূহলের উদ্রেক করে। কিন্তু আরো বেশী বিস্ময়কর হচ্ছে সেই কাব্যশিল্পের সুদীর্ঘ এবং অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব। আবার তার চেয়েও অভাবনীয় কবির দীর্ঘজীবনের শেষ তৃতীয়াংশে এই আর্টের পরিপূর্ণতম বিকাশ। মনে রাখা প্রয়োজন, "লিপিকা" ও "পূরবী"-তে যে নতুন প্রকাশরীতির প্রথম সূচনা তার আবির্ভাব কবির প্রায় ষাট বছর বয়সে[১], এবং এই মৌলিক শিল্পরীতির শেষ চরম প্রয়োগ ঘটেছে কবির প্রায় আশী বছর বয়সে রচিত "সানাই"-য়ে। পৃথিবীর খুব কম মহাকবিই বার্ধক্যকালে মহৎ কাব্য রচনা করে গেছেন। সাতচল্লিশ বছরের মধ্যেই তাঁর সমস্ত কীর্তি শেষ করে শেক্‌স্‌পীয়ার রহস্যময়ভাবে সরে দাঁড়ান শিল্পক্ষেত্র থেকে। গ্যয়টে-র যৌবনে রচিত Faust-এর প্রথমাংশই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর স্মরণীয় কাব্যকীর্তি প্রায় সবই তাঁর চল্লিশ বছরের আগেকার। ব্রাউনিং-এর শেষজীবনের কীর্তি তেমন কিছু চমকপ্রদ নয়। শুধু অন্ধ মিল্‌টন তাঁর Paradise Lost শেষ করেন উনষাট্ বছরে এবং Samson Agonistes সম্ভবত তার আরো চার বছর পরে। কিন্তু মিল্‌টন-এর তেষট্টি বছর বয়সে রচিত এই অমর নাট্যকাব্যের মধ্যে তাঁর শিল্পীজীবনের আসন্ন অবসানের ছায়া সুস্পষ্ট—যে বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এর অপরূপ স্নিগ্ধ-গভীর আলোর নতুন আভা ফুটে উঠেছে। আর একজন ইংরেজ কবি—টেনিসন্ অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই মত সুদীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও Crossing the Bar-এর মত একটি মহত্তম শ্রেণীর কবিতা রচনা করে গেছেন[২]। কিন্তু ঐ অমর রচনাটি তাঁর বার্ধক্যের ঘনায়মান গোধূলির মধ্যে হঠাৎ-জেগে-ওঠা একটিমাত্র পরম প্রেরণায় অগ্নিশিখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছে পৃথিবীর আর কোন কবির ক্ষেত্রে তার কাছাকাছি কোনো কিছু ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের সার্থক কাব্যশিল্প তাঁর দীর্ঘজীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বেঁচে ছিল—শুধু একথা বললে প্রায় কিছুই বলা হয়না। "চিত্রা"-"গীতাঞ্জলি"-"বলাকা"-অতিক্রান্ত বহুপরিণত

১ "লিপিকা"-র প্রথমাংশের লেখাগুলি সুরু হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

২ এই আশ্চর্য কবিতাটি রচিত হয় কবির একাশী বছর বয়সে।

রবীন্দ্র-কাব্যশিল্প যেন এক অভাবনীয় নবজন্ম লাভ করল কবির ষাট্ বছর বয়সে, এবং সেই পুনর্জাত কাব্যকলা শিল্পীর জীবনের ষাট থেকে আশী বছরের মধ্যে বহুবিচিত্র ভাব এবং রূপের স্তরে স্তরে অবর্ণনীয় মহিমায় ফুটে উঠে তাঁর আগেকার মহৎ কীর্তিকেও ছাপিয়ে গেল। এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে যে এই অসময়ের ফসলই কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। পরিপূর্ণ বার্ধক্যের ক্ষেত্রে কাব্যের এই যাদুময় ফসল ফলানো পৃথিবীর কোনো দ্বিতীয় কবির ভাগ্যে ঘটেনি। গভীর অন্তঃপরিণতির সঙ্গে এক চিরতরুণ হৃদয়ের অপরূপ কল্পনারাগের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যশিল্পে যে অসীম সৌন্দর্য এবং অবর্ণনীয় আভাসধর্মিতা জেগে উঠেছে তা মানবসভ্যতার এক অতুলনীয় সম্পদ।

২

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে বেছে একত্র করলে দেখা যায়, তারা সম্মিলিত গুণগত এবং পরিমাণগত উৎকর্ষে বাস্তবিকই অতুলনীয়। কিন্তু তাঁর কাব্যরচনার বিরাট ক্ষেত্রটিকে সমগ্রভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর শিল্পসৃষ্টি-প্রয়াসের মধ্যে মিশে আছে অসাধারণ সার্থকতার সঙ্গে অনেক অদ্ভুত অসার্থকতা, অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে অনেক বিচিত্র ব্যর্থতা। বিভিন্ন ভাবানুভূতির বহুবিচিত্র রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ ত্রুটিগুলিও তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি এবং সংগঠনের উপর গভীর আলোকপাত করে।

যদি ধরে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সুরু তাঁর পঁচিশ বছর বয়স থেকে, তাহলে দেখা যাবে যে সুদীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর ধরে তিনি অবিরতভাবে কাব্যরচনা করে গেছেন, এবং তাঁর সৃষ্টি পরিমাণে বিপুল। কিন্তু তাঁর গানগুলিকে বাদ দিলে তাঁর প্রায় চল্লিশটি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত আনুমানিক দু-হাজারটি পূর্ণাঙ্গ কবিতার মধ্যে কতগুলিই বা উচ্চাঙ্গের শিল্পসার্থকতায় উপনীত হয়েছে? পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনার ভিত্তিতে শান্ত, নিরপেক্ষ মনে, নিছক কাব্যবোধের দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে কবির এই শিল্পসার্থক কবিতাগুলির সংখ্যা বোধহয় আড়াইশোর বেশী নয়।[১] আগেই বলেছি, শিল্পসাফল্যের এই পরিমাণও আশ্চর্য এবং অনতিক্রান্ত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সামগ্রিক উৎপাদনের অনুপাতে এই সাফল্যের পরিমাণ কম, এবং রীতিমত কম। কারণ এই অনুপাত মেনে নিলে আমরা

১ এই হিসাব অবশ্য নিতান্তই মোটামুটি ধরণের।

কবির প্রতি আটটি কাব্যপ্রয়াসের মধ্যে পাই সাতটি আপেক্ষিক ব্যর্থতা। এই ধরণের অসার্থকতা অবশ্য ইংরেজী সাহিত্যে মিল্‌টন ছাড়া আর প্রায় প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পরিমাণে ঘটেছে। কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথ এত অসংখ্য রকমের poetic style -এর উপর তাঁর চরম অধিকারের অভ্রান্ত পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ শিল্পব্যর্থতা যেন আরো বেশী বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করে।

বাইরের দিকে থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার দ্রুত পরিণতির পথে দুটি বিশেষ বাধা ছিল। প্রথমত, বাংলা সাহিত্যে কোনো সুদার্ঘ, সুদৃঢ় কাব্য-ঐতিহ্যের অভাব, এবং দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম-আভাসময় উচ্চাঙ্গের লিরিক-রচনার প্রয়োজনের অনুপাতে সেকালের বাংলা ভাষার আপেক্ষিক অপরিণতি। এই একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল শেক্‌স্‌পীয়ার্‌কে। তাই তাঁর প্রথম যুগের স্টাইলে এবং তাঁর অল্পবয়সে লেখা অধিকাংশ সনেটের এবং কাব্য-আখ্যায়িকার প্রকাশরূপে ধরা পড়ে অনেক আশ্চর্য দুর্বলতা এবং কিড্‌, লিলি, মার্লো প্রভৃতি পূর্ববর্তী লেখকদের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম যুগের কাব্যের দুর্বলতার প্রধান কারণ অনেকটা একই। তাই যতদিন না তাঁর স্টাইল পরিপূর্ণভাবে আত্মসচেতন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে ততদিন তাঁর অপরিণত এবং অর্ধপরিণত রচনায় বৈষ্ণব এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব রীতিমত প্রবল।

কিন্তু এই ব্যাখ্যা কেবল আংশিকভাবেই সত্য। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার এই পরিমাণগত শিল্পব্যর্থতা তাঁর প্রায় সারাজীবনেরই সঙ্গী। "বলাকা"-পর্বে, "পূরবী"-পর্বে এবং শেষজীবনের অপূর্ব শিল্প-পরিণতির যুগেও তিনি চরম সার্থকতা এবং মাঝামাঝি স্তরের সাফল্যের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর এবং শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে কবির এই বিচিত্র এবং বহুবিস্তৃত শিল্পত্রুটিগুলির বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের মহত্তম সৃষ্টিগুলির প্রকাশরূপে এক অপরূপ অনবদ্য গঠনসৌষ্ঠবের পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই; কিন্তু তাঁর অন্যান্য অধিকাংশ রচনাতেই ধরা পড়ে এই সুষ্ঠু, সুসংহত গঠনেরই অভাব। রবীন্দ্রনাথের ভাবোদ্বেল অন্তরের সুস্পষ্ট প্রবণতা অতিভাষণের, অতিবিস্তারের দিকে। কিন্তু কবিতায় এবং যে-কোনো আর্টের ক্ষেত্রেই এই অমিতভাষিতা হানিকর; কারণ এই বেশী-বলা আর্টের ঘনীভূত আবেদনকে তরল করে দেয়। আর্ট এক সুচারুগঠন, স্বয়ং সম্পূর্ণ, নিখুঁত-সমন্বিত জগৎ; অবান্তরের কোনো স্থান সেখানে নেই। তাই গঠনের এই উজ্জ্বল

সংহতি সার্থক আর্টের এক অভ্রান্ত লক্ষণ। এই সংগঠন-সৌষ্ঠবের অভাব রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতায়। অপরিণত যুগের রচনায় এই ত্রুটি তো খুবই ব্যাপক; পরিণত বয়সের বহু রচনাতেও এই ত্রুটি রীতিমত স্পষ্ট। বলাকা-র বিখ্যাত 'শাজাহান' কবিতাটি নিঃসন্দেহে এক মহৎ সৃষ্টি; কিন্তু এরও সংগঠন যথেষ্ট দৃঢ় নয়; এর মধ্য অংশে অতিপ্রসারণের দুর্বলতা ধরা পড়ে। ঐ পর্যায়েরই 'বলাকা' কবিতাটির মহৎ ভাবসংহতি এবং নিবিড় আভাসময়তা 'শাজাহান'-এ নেই। সুপরিচিত 'ছবি' কবিতাটিতেও এই অতিবিস্তারের আভাস আছে। এই ত্রুটি "বলাকা" ও "পূরবী" পর্যায়ের অনিশ্চিত দৈর্ঘ্যের পংক্তিমালায় রচিত অনেক কবিতাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী প্রকট রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে—যেখানে কোনো স্তবক বা পরিমিত চরণের বাঁধন কবির সীমাচেতনাকে বিশেষভাবে জাগিয়ে রাখেনি। "পুনশ্চ"-র অন্তত অর্ধেক কবিতায় এই অসংলগ্ন অতিপ্রসারণের দুর্বলতা ধরা পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তার পরেও, অর্থাৎ গদ্যছন্দের উপর কবির অধিকার দৃঢ়তর হবার পরেও, এই জাতীয় ত্রুটি বার বার তাঁর বহু মহৎ-সম্ভাবনাময় রচনাকে দুর্বল করে দিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে "শেষ সপ্তক"-এর প্রথম কবিতাটিরই উল্লেখ করা যায়। নায়িকার জীবিতকালে নায়ক তার অকুণ্ঠ-প্রেমের অজস্র দান শুধু উদাসীনভাবে গ্রহণ করেই গেছে, তার দুর্লভ মূল্য বুঝতে পারে নি। কিন্তু আজ—

আজ তুমি গেছ চ'লে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত।
তুমি আস না।
এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখেছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

কিন্তু কবিতাটিকে এই বেদনা-উপলব্ধিটির শীর্ষে থেমে যেতে না দিয়ে কোন্ অদ্ভুত খেয়ালের বশে কবি তার পরে—

তোমার প্রেমের দান দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।—

এই দুটি clumsy লাইন যোগ করে এই সুন্দর কবিতাটিকে ঘাটে এনে ডোবানোর যোগাড় করছেন। "শেষ সপ্তক"-এ আর একটি মহৎ কবিতার মধ্যেও আমরা আর্টের সুষ্ঠু, সুসংহত ভাবরূপায়ণের উপর এই থামতে-না-জানা ব্যাখ্যামূলক মনোভাবের হানিকর প্রভাবের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাই। এই গ্রন্থের ত্রয়োদশতম কবিতাটি ('রাস্তায় চলতে চলতে') নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্য সৃষ্টি। কিন্তু আমরা কবিতাটি একাগ্রমনে পড়লেই বুঝতে পারব যে তৃতীয় স্তবকের শেষে কবিতাটি এক অপূর্ব সৌন্দর্যের শিখরে ওঠার পরে কবি অদ্ভুতভাবে সেই সৌন্দর্য-আবেদনকে কিছুটা খর্ব করেছেন শেষ স্তবকের অকারণ-বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি যোগ করে। শেষ স্তবকটি একটু অন্যরকম বা আরো সুসংক্ষিপ্ত হলে হয়তো কবিতাটি এক নিখুঁত সমাপ্তি লাভ করতে পারত; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় শেষাংশটি এই অপরূপ গদ্যকবিতাটিকে কাব্যের ইন্দ্রলোক থেকে তত্ত্ব-বোঝানো গদ্যের স্তরে বেশ খানিকটা নামিয়ে আনে। আবার "শ্যামলী"র মহৎ সম্ভাবনাময় প্রথম কবিতাটি ('দ্বৈত') ঘনীভূত ঔজ্জ্বল্যে সুরু হয়েছে, কিন্তু শেষার্ধের অনাবশ্যক অতিবিস্তার এবং পুনরাবৃত্তিতে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দৃষ্টান্তগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায়, কারণ এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকটি রচনারই ত্রুটি শেষপ্রান্তে। "শেষ সপ্তক"-এর দুই ('একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে') এবং তেতাল্লিশ সংখ্যক ('পঁচিশে বৈশাখ চলেছে') কবিতা, "পত্রপুট"-এর 'পৃথিবী', "শ্যামলী"-র বাঁশিওয়ালা' এবং 'মিল-ভাঙা' প্রভৃতি যে সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা পরিপূর্ণ উন্মেষ লাভ করেছে তাদের অপরূপ সমাপ্তিগুলি লক্ষ্য করলেই পূর্বোল্লিখিত রচনাগুলির শেষাংশের দুর্বলতা আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সাধারণভাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ এবং গদ্যে-রচিত অনেক কবিতাই শিল্পসার্থকতার অনেক উচ্চতর স্তরে উঠতে পারতো যদি তাদের প্রকাশরূপ আরো সংক্ষিপ্ত, আরো বাহুল্যবর্জিত হোত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে এই অত্যাবশ্যক গঠন-চেতনার, এই shaping faculty-র ক্রিয়া স্থানে স্থানে অভাবনীয় সার্থকতায় উত্তীর্ণ; কিন্তু সাধারণভাবে দেখতে গেলে তাঁর কাব্যে এই নির্মাণশক্তির আবির্ভাব অদ্ভুত অনিশ্চিত এবং অসম।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পরচনার আর একটি গুরুতর ত্রুটি তাঁর কবিতায় imagery-র অত্যধিক এবং অনেক ক্ষেত্রে অনুপযোগী ব্যবহার। এই ত্রুটিরও মূলে আছে কবির

মনের উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রবণতা এবং তাঁর রোমাণ্টিক কল্পনার দুর্বার মাতন। রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের অন্যতম প্রধান সম্পদই হচ্ছে তার অপরূপ-আভাসময় imagery। মানুষের গভীর অন্তর্লোকের ছায়াময় মর্মবাণী অপূর্ব সৌন্দর্যমূর্তিতে আভাসিত হয়েছে প্রধানত তাঁর অমিত-শক্তিময় imagery-র ভিতর দিয়েই। কিন্তু সেই পরম গৌরবের সামগ্রীই শিল্পবিরুদ্ধ অতিপ্রয়োগের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কাব্যের অগৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর poetic style-এ আমরা যে অতিবিস্তারের দোষ লক্ষ্য করেছি তার জন্য কবির এই অত্যধিক image-গ্রন্থনের, এই অতিরিক্ত অলংকরণের প্রবণতা অনেকাংশেই দায়ী। এই দুর্বলতা কবির পরিণত কালের বহু রচনাতেও রীতিমত স্পষ্ট। 'শাজাহান'-এ এবং "বলাকা"-র আরো অনেক কবিতায় এই অপরিমিত image-প্রয়োগের নেশা এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। 'চঞ্চলা' (৮), 'বিচার' (১১), 'রূপ' (১৬) প্রভৃতি কবিতায় অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার খেয়াল-স্রোতে ভেসে আসা অসংখ্য image-এর চাপে ভাবাবেদনের শ্বাসরোধ ঘটেছে। "পূরবী" পর্যায়ের 'যাত্রা' কবিতাটির মধ্যে অসংখ্য image-এর ভিড় যেন নিশ্বাসের অবকাশ কেড়ে নেয়। 'সাবিত্রী'-র মত গভীর রচনাতেও জায়গায় জায়গায় ভেসে-আসা image এর চাপে ছন্দের স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ পীড়িত হয়ে-এক কৃত্রিমতার আভাস জেগে উঠেছে। "পূরবী"-র 'ক্ষণিকা' কবিতাটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের একটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি। কিন্তু সপ্তম স্তবকে কবিতাটি শিল্প-আবেদনের এক উচ্চস্তরে ওঠার পর শেষ স্তবকটির নিষ্প্রাণ ছন্দ-মেলানো image-গ্রন্থন কবিতাটিকে এক শোচনীয় অনুজ্জ্বলতায় নামিয়ে এনেছে। কাব্যপ্রেরণার মহত্তম মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথের গুরুতর শিল্পত্রুটির বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে এই অবিস্মরণীয় কবিতাটির সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পমূল্যের শেষ দুটি স্তবক উদ্ধৃত করছি :

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা ; সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধার মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।

খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।

প্রথম স্তবকটির শিল্পোৎকর্ষ এবং এই সর্বাঙ্গীণ শিল্পসৌষ্ঠবের মধ্যে প্রতিফলিত রহস্য-গভীর বেদনা-নিবিড় সৌন্দর্যাভাস রসগ্রাহী পাঠককে গভীর তৃপ্তি দেয়। দ্বিতীয়, অর্থাৎ শেষ স্তবকটির প্রথম দুটি পংক্তির মধ্যেও এই সৌন্দর্যশক্তির অবনতির কোনো লক্ষণ নেই। 'চঞ্চলের মালার মণিকা'-র মত অপূর্ব ভাবদ্যোতক এবং শ্রুতিমধুর image-এর উপস্থিতিই তার অভ্রান্ত লক্ষণ। কিন্তু তার পরেই—কেন কে জানে—কবির সমস্ত সৃষ্টিকারী কল্পনাদৃষ্টি-ই যেন তার মহৎ উদ্ভাবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে হঠাৎ এক নিম্নতর স্তরে নেমে এসেছে। Creative vision-এর এই স্তরচ্যুতির অনিবার্য ফল ক্ষীণায়িত কল্পনার দিশাহারা ভ্রমণ এবং এলোমেলো আভাসবিরল image-এর প্রাণহীন সমাবেশ। আশ্বিনের প্রভাতের আলোই কবির সত্তাকে বার বার অবিস্মরণীয়ভাবে আন্দোলিত করেছে ; আশ্বিনের গোধূলি-আলো-কে তিনি এক বিশেষ বিস্ময়রূপে শুধু এখানেই দেখলেন। আকাশের ভিতর থেকে পৃথিবীর উপর শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা নেমে আসা একটু অদ্ভুত। ঝড়ের পক্ষেও নিজে হাতে করে বিদ্যুতের টিকা কপালে পরা খুব স্বাভাবিক নয়। এই কষ্টকৃত image-গ্রন্থনের প্রভাব ছন্দের আড়ষ্টতার মধ্যে পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যেও এই জাতীয় ত্রুটির পরিমাণ কম নয়। এই অসংবৃত image-বাহুল্য এবং অতিবিস্তারের ছাপ আছে "পুনশ্চ"'র বহু কবিতায় ; সবচেয়ে বেশী বোধহয় ঐ পর্যায়ের প্রথম রচনা 'কোপাই'-এ। এই ধরণের দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের রচনায় অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু মোটেই অবর্তমান নয়। যেখানে দু-একটি শক্তিময় image-এর প্রয়োগে যাদুময় শিল্প-আবেদনের সৃষ্টি হতে পারতো তেমন অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ খেয়ালের-স্রোতে-ভেসে-আসা বহুসংখ্যক ভাল-মন্দ-মাঝারি image-এর জড়াজড়ি সৃষ্টি করে তাঁর কাব্যের শক্তিকে খর্ব করেছেন। অথচ যেখানে তাঁর মহত্তম imagery-র ব্যবহারে কবির কল্পনাদৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণী শিল্পচেতনা স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করেছে সেখানে সেই image-সমৃদ্ধ কাব্যের আবেদন অবর্ণনীয়। এই অবর্ণনীয় রূপমালায় গাঁথা সৌন্দর্যাভাসের চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে কবির একটি ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং একটি গদ্যকবিতা থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

এদের অনবদ্য সৌষ্ঠবের পটভূমিকায় রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ববর্ণিত ত্রুটিগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

তারপরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।

('শেষ বসন্ত' : "পূরবী")

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের প্রথম দরদ ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝ্‌নদীতে সারিগান গাইব যখন,
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

('মিল-ভাঙা' : "শ্যামলী")

দুটি কাব্যাংশই image-সমৃদ্ধ শিল্পমাধুরীর অমরাবতীতে উত্তীর্ণ। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, এই সার্থকতার মণিদীপগুলিকে ঘিরে আছে কোথাও নির্বিশেষ ধূসরতা, কোথাও বা গভীর অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রয়োগের আলোচনাপ্রসঙ্গেও আমাদের একই ধরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলিকে একত্র করলে দেখা যায়, ছন্দরচনার ক্ষেত্রে তাঁর অধিকার সত্যিই বিস্ময়কর। পদ্যছন্দ এবং মুক্তছন্দ—

দুটি মাধ্যমের উপরেই তাঁর সমান প্রতাপ। প্রথম থেকেই তাঁর কাব্য ছন্দরচনার মনোরম বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের শেষার্ধের রচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাবদ্যোতক ছন্দরচনার ক্ষেত্রে যে অপূর্ব উদ্ভাবনী এবং সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বকাব্যের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই। তবু শিল্পরচনার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ছন্দের প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথের পারদর্শিতা আশ্চর্য রকমের অসম। প্রথমত, আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, কবির পয়ারের ব্যবহার বহু-ক্ষেত্রেই নিখুঁত নয়। পংক্তির মাঝখানে বিরতিচিহ্ন প্রয়োগের ফলে বহুক্ষেত্রেই তাঁর পয়ারের ছন্দপতন ঘটেছে—যে ত্রুটি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত বিপুলকায় "মেঘনাদবধ" কাব্যের কোথাও পাওয়া যায় না। এই ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের পয়ারের ব্যবহারের মধ্যে এতই ব্যাপক যে এর দৃষ্টান্ত কোনো বিচক্ষণ পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন হয় না। শুধু এই দুর্বলতার বিশেষ রূপটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি ছন্দপতিত পয়ার-পংক্তি উদ্ধৃত করছি :

অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন ভাসিছ তুমি
... ...
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে ('মানসসুন্দরী' : "সোনার তরী")

মৌন অপমানে ; নূপুর রয়েছে পড়ি
... ...
গৌর কণ্ঠতটে। সহাস্য কটাক্ষ করি ('বিজয়িনী' : "চিত্রা")

কে সে অভাগিনী। অর্জুনজননী সে যে।
... ...
আনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে ('কর্ণকুন্তীসংবাদ' : "কাহিনী")

অবশ্য পরিণত কালে রবীন্দ্রনাথ পয়ার খুব কমই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আঠারো অক্ষরের দীর্ঘতর যে-পয়ার তিনি "চিত্রা" পর্যায় থেকে সুরু করে পরিণত বয়সের অনেক রচনায় রীতিমত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যেও বার বার একই জাতীয় আকস্মিক ছন্দপতনের দুর্বলতা লক্ষিত হয়। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা রবীন্দ্রনাথের তিনটি পূর্ণ-পরিণত রচনা থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি লক্ষ্য করতে পারি' :

আজো নাই শেষ ; রবির আলোক হতে একদিন ('কৃতজ্ঞ' : "পূরবী")
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণ দ্বারে ('প্রত্যাগত' : "মহুয়া")
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে ('প্রণাম' : "পরিশেষ")

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সাতজোড়া পয়ারের সমাবেশে গঠিত সনেটের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ছন্দসঞ্চালন প্রায়ই নিখুঁত নয়। আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে পরিণতকালে রবীন্দ্রনাথ পয়ার খুব কমই ব্যবহার করেছেন, মহাপয়ারও অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তাঁর 'চৈতালি-নৈবেদ্য'-যুগের সনেটের আড়ষ্ট কাঠামোটিকে প্রায় নিঃশেষে বর্জন করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প যতই পরিণত হয়ে উঠছে, তার পক্ষে যে-কোন রকমের পূর্ব-নিদিষ্ট ছকে-ফেলা ছন্দের কাঠামো ততই অপ্রয়োজনীয় এবং অনুপযোগী হয়ে উঠেছে।

অত্যধিক বাঁধা-ধরা ছন্দের সংকীর্ণ কাঠামো যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের স্ফুরণকে পরোক্ষভাবে ব্যাহত করেছে, অত্যধিক অনির্দিষ্টতার স্বাধীনতাও তেমনই বার বার তাঁর কাব্যশিল্পে এনেছে বিপর্যয়। তাই তাঁর ছন্দপ্রয়োগের আর এক দুর্বলতা ধরা পড়ে অনিশ্চিত দৈর্ঘ্যের পংক্তিতে গঠিত বহু রচনায়। এই জাতীয় ছন্দবিন্যাসের প্রথম ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় "বলাকা" পর্বে, এবং প্রয়োগের এই প্রথম পর্যায়েই এর দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট। এই পর্বেরই কয়েকটি কবিতায়, বিশেষত 'বলাকা' কবিতাটিতে এই ছন্দরীতিরই অপূর্ব সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু 'ছবি,' (৬), 'চঞ্চলা' (৮), 'উপহার' (১০), 'বিচার' (১১), রূপ (১৬), প্রভৃতি কবিতায়, এমনকি 'শাজাহান'-এও এই অনিশ্চিত দৈর্ঘ্যের পংক্তির সমাবেশ গঠনের মধ্যে এক অতিবিস্তারের শৈথিল্য এনে দিয়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই শৈথিলতার প্রধান কারণ দুই, চার, ছয় বা আট অক্ষরের (আধ, এক, দেড় বা দুই পর্বের) ছোট ছোট পংক্তির অত্যধিক ব্যবহার এবং তার ফলে মিলের অত্যন্ত ঘন ঘন প্রয়োগ। এই একই ত্রুটির ছাপ আছে সুন্দর 'ছবি' কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;

সে যে আজ হল কত কাল।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।

অথবা 'শাজাহান'-এর এই অংশটিতে :

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস।

এই অতিখণ্ডিত পংক্তিগুলি এবং এই পায়ে-পায়ে-ঠেকা মিলের ঝোঁক ভাবকে অতি-বিস্তারের অশুভ পথের দিকে টানে, এবং সেই ভাবের অনুধাবন-পথে আমাদের বার বার অকারণে থেমে-থেমে মোড় ফেরায়। উপরের দুটি দৃষ্টান্তে যে ত্রুটির আভাসমাত্র পাওয়া যায় তার শোচনীয় আতিশয্যের ছাপ আছে। এই পর্যায়ের 'বিচার (১১), 'দেওয়া নেওয়া' (১২) 'রূপ' (১৬) প্রভৃতি কবিতায়। একই ছন্দে লেখা এই যুগেরই 'বলাকা' (৩৬), 'তুমি আমি' (২৯), 'চেয়ে দেখা' (৪০) প্রভৃতি সর্বাঙ্গ-সুন্দর কবিতার দীর্ঘতর পংক্তিসমাবেশের সঙ্গে তুলনা করলে এই ত্রুটির প্রকৃতি এবং গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এই জাতীয় ছন্দবিন্যাস রবীন্দ্রনাথ আবার বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর শেষজীবনের "বীথিকা' ও "আকাশপ্রদীপ"-এর বহু কবিতায়। "বলাকা"-পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যে স্থানে স্থানে এই ছন্দপদ্ধতির আকস্মিক প্রয়োগের মধ্যে দৃঢ়তর শিল্প-অধিকার এবং মনোরম গঠন-সৌষ্ঠবের পরিচয় পাওয়া যায়। "পূরবীর" 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির নিখুঁত ছন্দবিন্যাস এই জাতীয়। কিন্তু এখানে সেই অনাবশ্যক পংক্তিবিভাগ বা অত্যধিক মিলের ভিড় নেই।

এখানে প্রত্যেকটি পংক্তির শেষ ভাবেরই ক্ষণিক বিরামের সূচনা করে। এই অমিতশক্তিশালী ছন্দবিন্যাসই প্রযুক্ত হয়েছে "শেষের কবিতা"র সুবিখ্যাত শেষ কবিতাটিতে। "পলাতকা"র 'নিষ্কৃতি' এবং "মহুয়া"র 'সাগরিকা'-তেও এই ছন্দবিধির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। "মহুয়ার" আরো অনেক কবিতায়, বিশেষত 'নাম্নী' অংশের রচনাগুলিতে এই ছন্দবিধির প্রয়োগ অনেকাংশেই সার্থকতায় উত্তীর্ণ। "আকাশপ্রদীপ"-এর 'বধূ' ('ঠাকুরমা দ্রুততালে') এবং 'শ্যামা' ('উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ') কবিতাদুটিতেও এই ছন্দের সূক্ষ্ম-দোলাময় প্রয়োগ অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু "বলাকা- পর্বের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দবিন্যাসরীতি পরবর্তীকালে অনেক ও বেশী সূক্ষ্মগতি ও নমনীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি সার্থকতার ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ছোট পংক্তির এবং অত্যধিক মিলের ব্যবহার বর্জিত হয়েছে। সে-সব ক্ষেত্রে পংক্তিগুলির গড দৈর্ঘ্য 'ছবি' বা 'চঞ্চলা' বা 'শাজাহান'-এর চেয়ে অনেক বেশী এবং প্রায় কোথাও-ই পর-পর দুটি অতিহ্রস্ব পংক্তিরও ব্যবহার দেখা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর কবিজীবনের শেষ-তৃতীয়াংশের এই চরম শিল্পপরিণতির যুগেও রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দের প্রয়োগে বার বার অদ্ভুত রকমের শৈথিল্যের পরিচয় দিয়েছেন। "পূরবী"র অপূর্বগঠন 'পঁচিশে বৈশাখ'-এর সঙ্গে তুলনা করলেই ঐ পর্যায়েরই একই ছন্দে রচিত 'লিপি', 'পদধ্বনি', 'শেষ' প্রভৃতি কবিতার ছন্দবিন্যাসে সেই একই অত্যধিক পংক্তিবিভাগ এবং মিলবৃদ্ধির দুর্বলতা ধরা পড়ে। শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থ "বীথিকা"-র বহু কবিতায় এই দুর্বলতা অত্যধিক প্রকট। এই যুগেও কবির এই জাতীয় ছন্দে গাঁথা অনেক কবিতায় পাওয়া যায় শোচনীয়, অবিশ্বাস্য শৈথিল্য। যেমন 'মিলনযাত্রা'-র এই দুটি পংক্তিতে—

হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অনুকূল

—যেখানে মিলের জন্য অনুকূলের সাহায্য নিতে কবির বাধেনি: অথবা 'বনস্পতি'-র প্রথম কয়েকটি পংক্তিতে—

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,

হে তরু নবীন
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে।

—যেখানে তিনটি অতিহ্রস্ব এবং চারটি ন্-করান্ত পংক্তিকে পর পর বসাতে মহাকবির শিল্পচেতনা সংকুচিত হয়নি। এ জাতীয় গুরুতর ত্রুটি এ-পর্যায়ের রচনায় মোটেই বিরল নয়।

একই ছন্দরীতির ব্যবহারে সাফল্যের এই গুরুতর অসমতা কবির শিল্প-প্রবণতার উপর গভীর আলোকপাত করে। এই ছন্দপদ্ধতি তাঁর বাঁধনছেঁড়া প্রসারণ-ব্যাকুল রোমান্টিক কল্পনাকে বার বার আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু এই অবাধ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কবি অনেক সময়েই অমিতাচারের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু যেখানে তাঁর স্বভাববাঞ্ছিত এই স্বাধীন ছন্দগতি তাঁর পরিণত অন্তরের সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে ফল হয়েছে আশ্চর্য।

দেখা যায়, ছন্দের অতিনির্দিষ্ট কাঠামো রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পে বার বার এনে দিয়েছে এক অনুজ্জ্বল আড়ষ্টতা; আবার অবাধ স্বাধীনতার অনির্দিষ্টতাও তাঁর রচনাশিল্পকে বার বার নিয়ে গেছে তরল অতিবিস্তার এবং অসংলগ্ন অলংকরণের পথে। তাই তাঁর প্রতিভার অনুকূল মধ্যপথটি তিনি যেন খুঁজে পেয়েছেন বহুবিধ স্তবক-গঠিত কাব্যরচনায়। সেখানে অবাধ স্বাধীনতাও নেই, আবার দৃঢ় বন্ধনের আড়ষ্টতাও নেই। কারণ তাঁর পরিণতকালের স্তবক-গঠিত মহৎ রচনাগুলিকে লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব, তাদের প্রত্যেকটিতেই এক একটি মহান অন্তরাভিজ্ঞতা তার বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী এক-একটি বিশেষ গঠনের স্তবক বা ছন্দবিন্যাস সৃষ্টি করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের-পদ্যছন্দে রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অধিকাংশই স্তবকে গাঁথা। তাঁর কবিজীবনের উচ্ছ্বাসবহুল দীর্ঘ প্রথমার্ধেও এই জাতীয় বিশিষ্টধর্মী ছন্দরচনার ক্ষেত্রে কবির অসাধারণ সাফল্যের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সহজেই মনে পড়ে 'সোনার তরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'উর্বশী', 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে' ("চৈতালি"), 'বর্ষামঙ্গল', 'বৈশাখ', 'অভিসার', হোরিখেলা' 'আমি যদি জন্ম নিতেম', 'তবে আমি যাই গো তবে যাই' ("শিশু"), 'আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম' ("খেয়া") প্রভৃতি রচনা। এমন কি "বলাকা"-পর্বে—যেখানে অনিশ্চিত দৈর্ঘ্যের পংক্তিরচনারই প্লাবন, সেখানেও—'সবুজের অভিযান'

(১) 'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো' (২) 'সর্বদেহের ব্যাকুলতা' (৩৮) এবং 'পথের প্রেম'-এর (৪৩) মত অপূর্ব স্তবকে-গাঁথা রচনা বিদ্যমান। কিন্তু এই ধরণের **stanzaed verse**-রচনা অভাবনীয় উৎকর্ষ এবং অপরূপ বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে "পূরবী" পর্যায়ে। শুধু "পূরবী"-তেই অন্তত পনেরো-ষোলটি পরিপূর্ণ শিল্পসার্থক রচনা আছে যাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কবি এক একটি অভিনব সূক্ষ্মগঠন স্তবকমালা প্রয়োগ করেছেন। সেগুলি যেমন সুগঠিত তেমনি পরিপূর্ণভাবে ভাবানুগামী। এই বিশেষ-নিমেষের প্রেরণায় উদ্ভূত বিশেষ গঠনের ছন্দবিন্যাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প সবচেয়ে ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের ব্যবহারেও অসাধারণ, অনতিক্রমনীয় নৈপুণ্যের ফাঁকে ফাঁকে পাওয়া যায় বহু বিচিত্র দুর্বলতা। এ ক্ষেত্রেও ত্রুটিগুলি স্বভাবতই একই জাতীয়। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবগত অতিবিস্তারের প্রবণতা এবং তার ফলে কাব্যশিল্পের জমির মধ্যে আল্‌গা বুননের দৌর্বল্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর বহু গদ্যকবিতার বহু জায়গায় পংক্তিবিভাগের অযৌক্তিকতা লক্ষিত হয়। মুক্তছন্দে রচিত কাব্যের প্রত্যেকটি পংক্তির পরে যে সূক্ষ্ম বিরতি আসে সেটি ঠিক জায়গায়, অর্থাৎ ঠিক কথাটির পরেই আসা দরকার, এবং রবীন্দ্রনাথের সার্থকতম গদ্যকবিতাগুলির মধ্যে এই রীতি আশ্চর্য সহজ ও সুন্দরভাবে অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই কবি পংক্তি শেষ করেছেন ভুল জায়গায়, যার ফলে ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি বার বার ব্যাহত হয়েছে। এই ত্রুটি "পুনশ্চ" এবং "শেষ সপ্তক"-এর বহু জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। এই দুর্বলতার বিশেষ ধরণটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করার জন্য সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করছি। নিচের পংক্তিগুলিতে এই জাতীয় দুর্বলতা পরিস্ফুট :

হাজার মনিবের পিত্ত-পাকানো
ফরমাসটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার করে রাখে। ("শেষ সপ্তক" : ষোলো)

এখানে পংক্তির শেষ হয়েছে অদ্ভুতভাবে 'পিত্ত-পাকানো'-র পরে, 'ফরমাসটাকে'-র পরে নয়। আবার নিচের দুটি দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটিতেই আমরা দেখতে পাব প্রথম

পংক্তির শেষ শব্দটিকে অনাবশ্যকভাবে একটি নতুন পংক্তিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে :

সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে। ("শেষ সপ্তক" : নয়)
সংসারটা অনেকটাই মার্কামারা কাজের
মালখানা। ("শেষ সপ্তক" : উনিশ)

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রথম পংক্তির শেষের বিরামটি অনাবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে থামার কথা নয় সেখানে আমাদের মনকে ভাবানুসরণের পথে অকারণে থামিয়ে দেয় বলে এই ত্রুটি শিল্প-আবেদনের পক্ষে হানিকর।

কিন্তু এই দুটি গৌণ ত্রুটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের প্রয়োগে দু-জাতীয় গুরুতর দুর্বলতা দেখা যায়। প্রথমত শিল্পচেতনার শিথিলতার মুহূর্তে কবি অনেক সময়ই অনেক কবিতার মধ্যবর্তী এক-একটি পংক্তিতে ছন্দের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। ছন্দগতির এই বিজড়িত, অসুন্দর পদক্ষেপের ছাপ আছে নিচের প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে :

যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে ('কোপাই' : "পুনশ্চ")

আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও ("শেষ সপ্তক" : আঠারো)

উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা। (ঐ : সাতাশ)

সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর। (ঐ : আটাশ)

ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়। ('অমৃত' : "শ্যামলী")

এর চেয়েও গুরুতর এবং অদ্ভুত একটি দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যে স্থানে স্থানে ধরা পড়ে। এই ত্রুটি অবশ্য ছন্দের নয়, কিন্তু ছন্দের সামগ্রিক আবেদনের উপর এর প্রভাব আছে বলে এর আলোচনা এই প্রসঙ্গেই করছি। এই দুর্বলতা আছে কোনো কোনো গদ্যকবিতার এক-একটি পংক্তির মধ্যে সাধু এবং চলিত

শব্দের বিসদৃশ সমাবেশের মধ্যে। এই জাতীয় গুরু-চণ্ডালী একটু বেশী হলেই গদ্যকাব্যকে প্রহসনে পরিণত করতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় এই ত্রুটি কবির মুক্তছন্দে রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে প্রায় পাওয়াই যায় না। এই জাতীয় গুরুতর অনবধানের ছাপ আছে নিচের দৃষ্টান্তগুলিতে

বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস। ("শেষ সপ্তক" : চার)
যা ছিল অপ্রোজ্জ্বল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে (ঐ সাত)

রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে (ঐ : পনেরো)

তার আসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে (ঐ : চল্লিশ)

বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হল অট্টহাস্য ("পত্রপুট" : এক)

বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তা'র ('আমি' : "শ্যামলী")

শেষের দৃষ্টান্তটি বিখ্যাত 'আমি' কবিতাটির একটি সুস্পষ্ট কলঙ্ক। "পুনশ্চ"-র 'নাটক' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে গদ্যছন্দকে "অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ।" এই রাজপ্রতাপই তিনি দেখিয়েছেন তাঁর মুক্তছন্দে বাঁধা মহত্তম সৃষ্টিগুলিতে। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের মধ্যে লক্ষ্য করি যে শিল্পসৃষ্টির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত মুক্তছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবির সাফল্য নিতান্তই অসম।

কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাফল্যের এই ব্যাপক অসমতা সত্যিই এক আশ্চর্য ঘটনা। অলৌকিক সার্থকতার অধিকারী এই মহাকবির এই আপেক্ষিক ব্যর্থতার বিপুল পরিমাণ আমাদের বার বার অবাক করে দেয়। কত বিচিত্র প্রকাশ-পদ্ধতির স্রষ্টা তিনি; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই চরম সাফল্যের মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কিন্তু একথাও অভ্রান্ত সত্য যে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পচ্যুতির পরিমাণও বিপুল। যে বিষয়গুলিতে তিনি অতুলনীয় শক্তিশালী, অনেক সময়ে ঠিক সেই বিষয়গুলিতেই, আঙ্গিক-প্রয়োগের ঠিক সেই ক্ষেত্রগুলিতেই তিনি শোচনীয়ভাবে দুর্বল। তাঁর imagery অপরূপ রূপসৃষ্টি এবং আশ্চর্য সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনার

সমন্বয়ে একান্তই অতুলনীয়। আবার **imagery**-র দুর্বলতা, অতিপ্রাচুর্য এবং অবান্তরতাই তার অসংখ্য রচনার ক্ষেত্রে গুরুতর বিপর্যয় এনেছে। পদ্যছন্দ এবং এবং মুক্তছন্দ—দুটি মাধ্যমের উপরেই তাঁর পরিপূর্ণ অধিকারের স্বাক্ষর আছে তাঁর বিচিত্রগঠন রচনাগুলিতে। আবার অসংখ্য ক্ষেত্রে ছন্দেরই শিথিল ও অপটু প্রয়োগ তাঁর কাব্যের শিল্পসৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর মহৎ রচনাগুলির সামগ্রিক শিল্পসংগঠন অনবদ্য। আবার তাঁর বহুসংখ্যক কবিতার মধ্যে এই সুসংহত সংগঠনেরই অভাব।

কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনার এই অদ্ভুত ওঠানামার, এই **restless fluctuation**-এর মূল কারণ তাঁর গভীরভাবে রোমান্টিক, আবেগময়, এবং কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি। তাঁর অন্তরের সূক্ষ্ম-গভীর প্রাণশক্তির এই দুর্দম অতি-প্রাচুর্যই তাঁর কাব্যের সুচারু শিল্পবন্ধনকে বার বার ছিন্ন করেছে। আমরা দেখেছি অন্তরের অবিশ্রান্ত ভাবোচ্ছ্বাসের তাড়নায় এবং পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের তাগিদে তিনি কেবলই নতুন নতুন রচনারীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তাঁর দুর্বার বাঁধনছেড়া ভাব-কল্পনা তাঁকে প্রায় কোনো প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেই একটানা সাফল্য লাভ করতে দেয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যলোকের যে-কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা দেখতে পাই একই ধরণের দৃশ্য: বহুবিচিত্র শিল্পব্যর্থতার সঙ্গে মাঝামাঝি স্তরের সাফল্যের সমাবেশ এবং সেই মিশ্র পটভূমির মাঝে মাঝে কতগুলি অলৌকিক শিল্পসৌষ্ঠবের মূর্তি। এই অসমতার দৃশ্যের আশ্চর্য ব্যতিক্রম ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্যকীর্তির শুধু একটিমাত্র অংশে—তাঁর গানের ক্ষেত্রে। কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণের এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই কবির শিল্পসাফল্যের পরিমাণ বিপুল, বিস্ময়কর। সেখানে সামগ্রিক চিত্রটি একান্তই বিপরীত; সেখানে অসার্থকতাই ব্যতিক্রম।

৩

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীর্তির ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন করা হয় তাঁর বিপুল সংখ্যক গানের ক্ষেত্রটিকে বাদ দিয়ে। এর চেয়ে গুরুতর ভুল আর কিছু হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গানগুলি একই সঙ্গে দুরকম বিভিন্ন আর্টের চরম সার্থক দৃষ্টান্ত। প্রথমত তারা মহত্তম শ্রেণীর কণ্ঠসংগীত, যাদের মধ্যে কাব্যে গাঁথা নিবিড় ভাবসংকেত গভীরতর মহিমায় ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে অপরূপ সুরের সংযোগে। এই আর্ট কাব্য ও সংগীতের নিবিড় সম্মিলনে সৃষ্ট এবং এর আবেদনের নিমেষ-সঞ্চারী

তীব্রতা অতুলনীয়। কিন্তু সুরকে, সংগীতাংশকে বাদ দিলে এদের আর একটি শিল্পরূপ প্রকাশিত হয়; সে হচ্ছে এদের নিছক কাব্যরূপ। এই কাব্যরূপগুলির শিল্পসৌন্দর্য এক অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের এই গীতি-কবিতাগুলির শিল্পলক্ষণ বিচার করার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। অভিজ্ঞ পাঠককে বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সব গান-গুলিই নিছক কাব্য হিসাবে বরণীয় নয়। সারাজীবনে তিনি আনুমানিক যে দু-হাজার গান রচনা করেছেন তাদের মধ্যে অনেকগুলিই শুধু গান হিসাবেই উজ্জ্বল, কাব্য হিসাবে নয়। প্রথমত, এমন কতগুলি রচনা আছে যেগুলির ঠিক কোন কাব্যগঠন নেই, যেগুলি শুধু কয়েকটি কথার অর্ধসংলগ্ন সমাবেশ; সুরের বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হলে তবেই তাদের গভীর অন্তঃসংযোগ ধরা পড়ে। কবিরই ভাষায়, সুরহারা অবস্থায় তারা শিখাহীন প্রদীপের মত। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন গীতি-নাট্য এবং নৃত্যনাট্যে গাঁথা এমন কতগুলি গান আছে যাদের কাব্য হিসাবে কোনো পৃথক অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়না। এগুলিকে আবার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা যায়: প্রথমত, নাট্যসংলাপের বহু ছোটো ছোটো সুর-বসানো অংশ, এবং দ্বিতীয়ত, প্রথম যুগের নাটকগুলিতে গাঁথা কতকগুলি হাসির গান। এদের সার্থকতা নাটকগুলির অন্তর্গত বিশেষ পরিস্থিতিগুলির মধ্যেই, স্বাধীন কাব্য হিসাবে নয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গীতরচনা থেকে কাব্য হিসাবে অপরিস্ফুট এই বিভিন্ন শ্রেণীর রচনাগুলিকে বাদ দিলে আনুমানিক যে পনেরোশটি গীতিকবিতা অবশিষ্ট থাকে, চমকপ্রদ, মহোজ্জ্বল রূপ-পরিণতিতে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যকীর্তির এক প্রধান অংশ।

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার সাধনায় সাফল্যের যে অবিরত ওঠানামা দেখা যায়, তাঁর শিল্পশক্তির চরম উন্মেষের যুগেও তা রীতিমত প্রকট। রবীন্দ্রনাথের সার্থকতম কবিতাগুলি অভাবনীয় সৌন্দর্যময়; কিন্তু সেই সব চরম সৌন্দর্যসৃষ্টির পর্যায়েই অসংখ্য কবিতায় তাঁর আপেক্ষিক শিল্পব্যর্থতাও বিস্ময়কর। মনে রাখা প্রয়োজন, এই অপেক্ষাকৃত অসার্থক কবিতাগুলির ভাবাভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই গভীর এবং মহৎ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের প্রকাশরূপে বহু গুরুতর শিল্পত্রুটি রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, ভাবের বিপুল বৈচিত্র্য সত্বেও তাঁর গীতরচনার ক্ষেত্রে কবি সাধারণভাবেই শিল্পসার্থকতা লাভ করেছেন; সেখানে সমস্ত ভাববৈচিত্র্যই নিখুঁত শিল্পসৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকের মধ্যে শুধু এই গানের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় সার্থক

রূপরচনার এই বিপুল অনুপাত। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিল্পশক্তি বায়ুকম্পিত দীপশিখার মতই চঞ্চল; গীতরচনার ক্ষেত্রে সেই দীপশিখা যেন এক নিষ্কম্প জ্যোতির্লোকের সৃষ্টি করেছে।

অনেকে হয় তো বলবেন যে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই অনিশ্চিত শিল্পসার্থকতার কারণ হচ্ছে অত্যন্ত বেশী লেখা—**over-production**; এবং সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই ধরণের **prolific** কাব্য-রচয়িতাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এই রকম অনিশ্চিত এবং আংশিক সাফল্যই ঘটেছে। কথাটি নিঃসন্দেহে ঠিক। কিন্তু, কথা হচ্ছে, গানও তো রবীন্দ্রনাথ কবিতার অনুপাতে কম লেখেননি; সেখানেও তো **production** কম নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বিপুল সংখ্যা সত্ত্বেও এই গীতিরচনাগুলির এক বৃহৎ অংশ পরিপূর্ণ শিল্পসার্থকতায় উত্তীর্ণ। কবিতার ক্ষেত্রে যে অতি-উৎপাদন সুন্দর রূপরচনার পক্ষে গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, গীতরচনার বিপুল সার্থকতার ক্ষেত্রে সে বাধা যেন আপনা থেকেই সরে দাঁড়িয়েছে।

এর থেকে বোধহয় একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়: যে কোনো কারণেই হোক, গান জাতীয় কয়েকটি পংক্তির বিচিত্র বিন্যাসে রচিত গীতিকাব্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা তার স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষের অনুকূলতম ক্ষেত্রটির সন্ধান পেয়েছে। পরিপূর্ণ আত্মসংযোগের শুভ মুহূর্তে ছাড়া তিনি ode-জাতীয়, মহৎ ভাবের স্তরে-স্তরে-বিকশিত, নিখুঁত-সমন্বিত কাব্যরূপ সৃষ্টি করতে পারেন নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণাঙ্গ কবিতার ভাবরাশি অনেক সময়েই বাঁধভাঙা নদীস্রোতের মত ছড়িয়ে পড়েছে; শিল্পসংহতির নিখুঁত খাতে প্রবাহিত হয়নি। অর্থাৎ তাঁর বিশিষ্ট কল্পনা-স্পন্দনের গতিচ্ছন্দকে ব্যাহত না করে তাকে সহজেই একটি সুষ্ঠু, স্বয়ংসম্পূর্ণ নৃত্যকলার সুচারু ভঙ্গিমায় বন্দী করতে পারে এমন একটি ধ্রুব শিল্পবন্ধনের সন্ধান তিনি তাঁর বহুবিস্তৃত কাব্যক্ষেত্রে পাননি। শিল্পী-অন্তরের সেই প্রকাশ-পরিপূর্ণতার সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাঁর গানের সূক্ষ্ম-বিচিত্রিত ঠাটে। সেইজন্যই যে-যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের সাফল্য নিতান্তই অনিশ্চিত তার মধ্যেও হঠাৎ-জেগে-ওঠা তিনটি গীতিগুচ্ছ, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"-তে অধিকাংশ গানেরই শিল্পরূপ আশ্চর্য সুন্দর। আবার, কবির শেষজীবনে রচিত "বীথিকা"-র বিপুলসংখ্যক কবিতার অসংলগ্ন অতিবিস্তারের মধ্যেও ঐ সময়েই রচিত এবং ঐ গ্রন্থেই সংকলিত গানগুলির প্রত্যেকটিই অপূর্ব রূপ-পরিণতি লাভ করেছে। কবির যে-কোনো পর্যায়ের গীতরচনার মধ্যেই সার্থকতার এই বিস্ময়কর অনুপাত চোখে পড়ে।

বিষয়টিকে আর একদিক থেকে দেখলেও বোধ হয় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আমরা দেখেছি, বেশী স্বাধীনতা বা বেশী বাঁধন—কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তির বিকাশের অনুকূল হয়নি। তাঁর কাব্যপরীক্ষার একদিকে আমরা দেখতে পাই অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পংক্তিমালার অবাধ স্বাধীনতা, অন্যদিকে চতুর্দশপদীর আড়স্ট কাঠামো। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার অনুকুল মধ্যপথটি খুঁজে পেয়েছেন বিচিত্র গঠনের স্তবকে রচিত কবিতায়। অর্থাৎ, তাঁর বিশিষ্ট সৃজনীশক্তি বা শিল্পপ্রতিভা ছন্দের ছোটো ছোটো কাঠামোর মধ্যেই, ছোটো ছোটো **rhythmic period**-এর মধ্যেই তার সবচেয়ে সার্থক প্রকাশ খুঁজে পেয়েছে। সেখানে বিশেষ ভাবাবেগটির অনন্য পদক্ষেপ বিশেষ স্তবকের ছন্দগতিটির মধ্যে নিবিড়-ভাবে আভাসিত। কিন্তু এও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই-জাতীয় স্তবকে-গাঁথা কবিতাগুলিও অসার্থক হয়েছে সেখানেই যেখানে কবির অন্তঃপ্রেরণার ক্ষীণতা ছন্দের পুনরাবর্তিত স্তবক-গ্রন্থনাকে অনুজ্জ্বল, একঘেয়ে করে তুলেছে ; অথবা যেখানে একটি স্বল্পায়ু ভাবাবেগ নিঃশেষিত হবার পরেও কবি তাঁর স্তবকমালাকে অনাবশ্যকভাবে প্রলম্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতরচনাগুলির মধ্যে আছে অতি-স্বাধীনতা এবং অতি-বন্ধনের মাঝামাঝি এই স্তবকগুলিরই রূপ ও আবেদন। কিন্তু স্তবকে রচিত কোনো কোনো কবিতায় পুনরাবৃত্তি এবং অতিপ্রসারণ-জনিত যে ভাবহারা নির্জীবতা লক্ষিত হয় তার চিহ্নমাত্র এই গানগুলির অধিকাংশের মধ্যে নেই, কারণ একটি বা দুটি স্তবকের মধ্যে তাদের উজ্জ্বল সমাপ্তি। তাই এই স্তবকোপম গীতিকবিতাগুলির মধ্যেই লিরিস্ট্ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ এবং পরিমিত প্রকাশের আদর্শ ক্ষেত্র। এদের এই সীমিত, অথচ অনির্দিষ্টভাবে সীমিত ক্ষেত্রে তাঁর কবিমানস অনুভব করেছে একটি মৃদু বন্ধনের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যরচনার স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার পটভূমিকায় তাঁর গীতরচনার এই ধারাটিকে লক্ষ্য করলে আমাদের মন আর একটি বিস্ময়কর তথ্যের সম্মুখীন হয়, এই আবিষ্কারটিও একই সিদ্ধান্তের দিকে নির্দেশ করে। আমরা জানি, শেক্‌স্‌পীয়ার-এর নাট্য-প্রবাহের মধ্যে তাঁর রচনারীতির একটি অপূর্ব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমাংশে রচিত বিখ্যাত সনেটমালার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে স্টাইলের যে অভাবনীয় পরিণতি দেখা যায়, তাঁর সমসাময়িক-নাটকগুলির ভাষণ-রীতির মধ্যে সে পরিণতি তখনও অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথের **poetic style**-এর **development**-ও তেমনি কবিতার চেয়ে

গীতরচনার ক্ষেত্রে অনেক বেশী দ্রুত। তার প্রমাণের অভাব নেই। যে-যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রয়াস তাঁর নিজেরই ধারণায়[১] তখনও ঠিক কবিতার রূপ পায়নি, সেই "ভানুসিংহের পদাবলী"-র একান্ত অপরিণতির মধ্যেও 'শুনলো শুনলো বালিকা'র মত একটি মধুর রসঘন গীতরচনা অম্লান ঔজ্জ্বল্যে জেগে আছে। তার পরের যুগেই "কড়ি ও কোমল"-এ—যেখানে কবির "কাব্য-ভূসংস্থানে" সবেমাত্র "ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করছে",[২] সেখানেও—অপরিণত ও অর্ধপরিণত কবিতাগুলির মাঝে মাঝে এমন কয়েকটি সুন্দর গীতরচনা চোখে পড়ে যাদের আপেক্ষিক রূপসংহতির মধ্যে আগামী দিনের অভাবনীয় পরিণতির আভাস আছে। এদের মধ্যে একটি গান 'ওগো শোনো কে বাজায়'-এর রূপনির্মিতির মধ্যে এমনই এক পরিপূর্ণতা আছে যে একে অনায়াসেই কবির আর দশ বছর পরের রচনা বলে ভুল হ'তে পারে।

"কল্পনা"-র অপরূপ গীতরচনাগুলির মধ্যেও রূপ-পরিণতির যে অপূর্ব সার্থকতা এবং যে আশ্চর্য্য concentration of effect-এর পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সহজেই বোঝা যায় যে কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা তখন বিবর্তনের যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, গীতরচনার ক্ষেত্রে তা ইতিমধ্যেই এক পরিপূর্ণ ও অনায়াস সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রায় এইসময়ই রচিত 'তুমি যেয়োনা এখনি', গানটি এই বিষয়ে আর এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষ্যদান করে। এর কয়েকটি পংক্তির মধ্যে মিলের আভাস থাকলেও গানটি একেবারেই গতানুগতিক ছন্দে রচিত নয়। অর্থাৎ technical অর্থে, গানটি সম্পূর্ণ ভাবেই মুক্তছন্দে রচিত, এবং গদ্যের রীতিতে প'ড়ে গেলে এর অপূর্বগঠন সর্বাঙ্গসুন্দর রূপটি পাঠককে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেয়। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার ক্ষেত্রে মুক্তছন্দের ব্যবহার "লিপিকা" বা "পুনশ্চ"-র যুগে সুরু হলেও গীতরচনার ক্ষেত্রে তার সার্থক প্রয়োগ বহু আগেই অন্তরের প্রয়োজনের তাগিদে নিঃশব্দসঞ্চারে সুরু হয়েছে। গীতি-কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবির শিল্পীসত্তার এই আশ্চর্য্য দ্রুত অগ্রগতি-ও এই সাক্ষ্য দেয় যে এই জাতীয় রচনার ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বাণী তার সবচেয়ে সহজ ও সার্থক প্রকাশ খুঁজে পেয়েছে।

সমস্ত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও কবির বিপুল সংখ্যক গীতরচনার এই অপরূপ শিল্পোত্তরণ আমাদের মনে এক বিস্মিত প্রশ্নের উদ্রেক করে। কবিতার

১ কবিলিখিত "সঞ্চয়িতা"-র ভূমিকা।

২ ঐ।

ক্ষেত্রে যে শিল্পভাষণশক্তি এক অনিশ্চিত তড়িৎপ্রবাহের মত আনাগোনা করেছে, এত অসংখ্য গানের মধ্যে তার এই অচঞ্চল উপস্থিতি কেন? এর উত্তর কি কোনভাবে এই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে? অর্থাৎ এগুলি গান বা সুরযুক্ত রচনা বলেই কি এরা এই সহজ সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে? আমরা জানি, কবির সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন ধরনের mood ও অন্তঃপ্রক্রিয়ার মধ্যে জন্মলাভ করে। কোথাও সুর ও কথা-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গান তিনি একই মুহূর্তে সৃষ্টি করেছেন। কোথাও বা প্রথমে একটি বিশেষ সুরের আভাস তাঁর মনে জেগে উঠেছে, এবং তারই ক্রমিক প্রেরণায় তিনি ধীরে ধীরে একটি রসসিঞ্চিত কথার মালা গেঁথে তার মধ্যেই সেই সুরটিকে বন্দী করেছেন। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে তিনি গীতি-কবিতাটিকে আগে রচনা করে পরে তাতে সুর বসিয়েছেন; কিন্তু অনুমান করা যায় যে সে-সব ক্ষেত্রেও লিরিকগুলি লেখার সময় তাঁর অন্তরে এক-একটি বিশেষ সুরের ভূমিকা বর্তমান ছিল। হয়ত সুরের এই কোথাও-স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট ভূমিকাটি কবির অন্তর্লোকে এমন একটি বিশেষ মেজাজ, এমন একটি বিশেষ ঘনীভূত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, যার অলক্ষ্য নিয়ন্ত্রণী প্রভাব কবির mood-কে এক-একটি রসময় লিরিকের উজ্জ্বল রূপসংহতিতে দানা বেঁধে উঠতে সাহায্য করেছে।

সে যাই হোক, এই আর্টের সার্থকতা সত্যিই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের চির-অন্বেষিত পরিপূর্ণ শিল্পভাষণের ভাষাটি যেন এই আর্টের অজস্র দৃষ্টান্তে কোন মন্ত্রবলে এসে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিবিড় রসাবেদনময় এবং পরিপূর্ণ রূপসংহত কবিতাগুলিকে বাদ দিলে তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই অনুভূত হয় কোন না কোন গুণের অভাব, শিল্পোত্তরণের কোন না কোন অপূর্ণতা। কিন্তু মহত্তম লিরিক আর্টের সমস্ত লক্ষণগুলি যেন এক গভীর সামঞ্জস্যে গ্রথিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলিতে। এদের সংক্ষিপ্ততাই যেন রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অতি-উচ্ছ্বাসকে সংযত করে প্রকাশরূপের মধ্যে এনে দিয়েছে এক ঘনীভূত আভাসোজ্জ্বলতা। গভীরের বিচিত্র রসরূপায়ণে নিয়োজিত এই অপরূপ-ব্যঞ্জনাময় মিতভাষিতা এই আর্টকে অলৌকিক শক্তিময় করে তুলেছে। এক একটি মহৎ অন্তরাভিজ্ঞতার রূপায়ণে প্রযুক্ত এই আশ্চর্য উপকরণ-স্বল্পতা যে নিবিড় আবেদন-সংহতির সৃষ্টি করেছে তার তুলনা সমস্ত বিশ্বকাব্যে দুর্লভ।

এ ছাড়াও, এই গানগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যশিল্প যেন এক সূক্ষ্মতর স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে দেখা দিয়েছে। এক মহৎ সংগঠন-চেতনার অদৃশ্য প্রভাব যেন সমস্ত রকমের বাহুল্যকে এদের ক্ষেত্র থেকে নিঃশব্দে অপসারিত করেছে।

এখানে সমস্ত শিল্প-উপকরণের, সমস্ত বিচিত্র আঙ্গিকের প্রয়োগ ঘটেছে যেন অলৌকিক পদক্ষেপের নিঃশব্দ-সঞ্চারে। এখানে image-গুলির মনোরম রূপাভাস এবং সূক্ষ্ম-গভীর সংকেতময়তা যেমন চমকপ্রদ, তেমনিই অপরূপ সূক্ষ্মতা অনুপ্রাসের প্রয়োগে ; ছন্দের বিচিত্র বিন্যাসও এই গানগুলিতে তেমনিই অপূর্ব সূক্ষ্মতায় উত্তীর্ণ। এই রসোত্তীর্ণ শিল্পরূপের গতিচ্ছন্দের এমন একটি নিমেষ-সঞ্চারী দোলা, এমন একটি immediate impact আছে যা মুহূর্তের মধ্যে মনকে রসের অমৃতলোকে নিয়ে যায়। ছন্দোগতির এই সূক্ষ্ম জাগরণী-স্পন্দন রবীন্দ্রনাথের এই কয়েক শত গানের শিল্প-সার্থকতার আর একটি অভ্রান্ত লক্ষণ। এদের মধ্যে 'উর্বশী', 'বলাকা' বা 'পৃথিবী'র গুরুগম্ভীর গগনচুম্বী মহিমা নেই। এখানে আকস্মিক খেয়ালের প্রেরণায় শিল্পী সূক্ষ্মতর তুলি হাতে নিয়ে ছোট ছোট পটে এঁকেছেন অনির্বচনীয়-আভাসময় ছোট ছোট ছবি ; কিন্তু ঐ স্বল্প, অথচ অনতিনির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যেই রঙ ও রেখার যাদুময় সমাবেশে অন্তর্জীবনের এক-একটি পরম অভিজ্ঞতার সুর অপরূপ সৌন্দর্যের ভঙ্গীতে আভাসিত হয়েছে।

আশ্চর্য এই যে কবির এই অনিন্দ্যগঠন স্বল্পভাষী সৃষ্টিগুলি যেন এক ক্লাসিক্যাল ধরণের সুশান্ত সংহতির পরিচয় দেয়। চির-রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর উচ্ছ্বসিত অন্তঃপ্রেরণার চরম অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছেন, এক সুসংযত ক্লাসিক্যাল মিতভাষিতায়। এই সূক্ষ্ম এবং স্বতঃস্ফূর্ত পরিমিতিবোধ অভ্রান্তভাবে পরিস্ফুট মাত্র দু-চারটি ক্ষেত্রে নয়, শত শত গীতরচনায়। এরা আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে content বা form—কোন দিক দিয়েই রোমান্টিক ও ক্লাসিক্যাল আর্টের মধ্যে সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়, এবং সার্থক শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অনেক সময়েই এই দুটি বিশিষ্ট উপাদানের নিখুঁত সমন্বয় দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের মত সর্বতোভাবে রোমান্টিক কবি পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ ; অথচ এই অপূর্বগঠন, সুপরিমিত গীতি-কবিতাগুলিই তাঁর কাব্যপ্রতিভার সবচেয়ে সফল সৃষ্টি। আরো আশ্চর্য এই যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবির জরাজয়ী অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কল্পনাবিলাস যেমন উত্তরোত্তর রোমান্টিক হয়ে উঠেছে, সেই নিত্য-নতুন-পাপড়ি-মেলা রোমান্টিকতার শিল্প-অভিব্যক্তি গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে তেমনিই হয়ে উঠেছে উত্তরোত্তর ক্লাসিক-ধর্মী। রবীন্দ্রনাথের পরিণততম রোমান্টিক কল্পনাদৃষ্টি কী আশ্চর্যভাবে তাঁর শিল্পীজীবনের শেষার্ধের অজস্র গানে এক অপূর্ব রূপ-সংহতিতে তার চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ কবির বিভিন্ন mood এবং শিল্পছাঁদের চারটি গান পাঠকের প্রত্যক্ষ বিচারের জন্য উদ্ধৃত করছি :

(১)

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী॥
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি॥ (১৯১৮)

(২)

জানি হল যাবার আয়োজন—
তবু পথিক, থামো কিছুক্ষণ।
শ্রাবণগগন বারি-ঝরা, কাননবীথি ছায়ায় ভরা
শুনি জলের ঝরোঝরে
যূথীবনের ফুল-ঝরা ক্রন্দন॥
যেয়ো—যখন বাদলশেষের পাখি
পথে পথে উঠবে ডাকি ডাকি।
শিউলিবনের মধুর স্তবে জাগবে শরৎলক্ষ্মী যবে,
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে
পরবে ভালে মঙ্গলচন্দন॥ (১৯২৫)

(৩)

তোমাদের দান যশের ডালায়
সব-শেষ সঞ্চয়
আমার নিতে মনে লাগে ভয়॥
এই রূপলোকে কবে এসেছিনু রাতে
গেঁথেছিনু মালা ঝ'রে-পড়া পারিজাতে

আঁধারে অন্ধ—এযে গাঁথা তারি হাতে—
কী দিল এ পরিচয় ॥
এরে পরাবে কি কলালক্ষ্মীর গলে
সাতনরী হারে যেথায় মাণিক জ্বলে।
একদা কখন অমরার উৎসবে
ম্লান ফুলদল খসিয়া পড়িবে কবে,
এ আদর যদি লজ্জার পরাভবে
সেদিন মলিন হয় ॥ (১৯৩২)

(৪)

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,—
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা। (১৯৪০)

চরম শিল্প-পরিণতির পর্যায়ে রচিত এই চারটি গানের mood, ছন্দোগতি, imagery—সবই ভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রোমান্টিক কল্পনা-আকৃতির এক-একটি সূক্ষ্মগতি তরঙ্গ যেন অনায়াসেই এক একটি শান্তোজ্জ্বল সৌন্দর্যবন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

আর একটি ঘটনাও একই সাক্ষ্য দেয়। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক রচনারীতি অবিরতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি যেমন দ্রুত, অনেক ক্ষেত্রে তেমনই গভীর। কাব্যরীতির এই অশান্ত পরিবর্তনের ছায়া

গানের ক্ষেত্রেও বার বার অস্পষ্টভাবে পড়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষত কবির প্রথম গদ্যছন্দ প্রয়োগের যুগ থেকে তাঁর অনেক গানের ছন্দসংগঠনে সেই নতুন-জাগা স্বাধীন ছন্দোরীতির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁর কাব্যলোকের চাঞ্চল্যকর রীতি-পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর পঁচিশ থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত গানের ক্ষেত্রে স্টাইলের পরিবর্তন নিতান্তই সামান্য। উপরে উদ্ধৃত কবির শেষ কুড়ি পঁচিশ বছরের গীতরচনার প্রতিনিধি-স্বরূপ চারটি গানের পাশে তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথমার্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত নিম্নোদ্ধৃত চারটি গানকে রাখলে তাদের মধ্যে শিল্পরূপের কোন মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না :

(১)

ওগো শোনো কে বাজায়
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি
চুরি করে হাসিখানি—
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়॥
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারই কলতান
কানে আসে, কাঁদে প্রাণ—
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥ (১৮৮৬)

(২)

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে॥
কিছু বাঁধা পড়িলনা শুধু এ বাসনা-বাঁধনে॥

কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর সাধনে ॥
আপনার মনে বসিয়া একেলা   অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে ॥   (১৮৯৭)

(৩)

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে ॥
একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন-মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে ॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল—
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি,   কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি   আছি আকুল হয়ে ॥   (১৯১০)

(৪)

পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার ॥
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,   ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার ॥
ওগো নবপ্রভাতজ্যোতি,   ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথি,   আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার ॥   (১৯১৪)

এদের মধ্যেও পাওয়া যায় এক-একটি নিবিড় অন্তরানুভূতির সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-রূপায়ণ, সেই সূক্ষ্ম-বৈচিত্র্যময় ছন্দসঞ্চালন ও পংক্তিবিন্যাস, সেই অপরূপ image-গ্রন্থনা, সেই অদ্ভুত মিতভাষী উপকরণ-স্বল্পতা, সেই গভীর-প্রতিধ্বনিময় আবেদন। তফাৎ যা আছে, তা শুধু বিভিন্ন বয়সের এবং অন্তরাবস্থার অনুভূতি-বৈচিত্র্যের,

শিল্পায়নরীতির কোন মৌলিক প্রভেদ নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকের অবিরত রীতিবদলকে শান্তভাবে উপেক্ষা করে এই গানগুলি তাঁর সারাজীবন ধরে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে উঠেছে সেই একই শান্ত-মধুর পুষ্পবিকাশের সুরে। তাই মনে হয়, বহু পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় কবির যে অন্তরতম শিল্পীসত্তা—একই গভীর গতিচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রিত এই গীতি-কবিতাগুলি তারই পরম-বৈশিষ্ট্যময় অভিব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথের এই গীতি-কবিতাগুলিই যে তাঁর কবিপ্রতিভার সবচেয়ে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকেনা যখন এই সব কথার শেষে আমরা স্মরণ করি যে গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন অসীম, অতুলনীয় আনন্দ। তাঁর বহু গানের কথা এই সত্যের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। তা ছাড়াও "পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী"তে তিনি তাঁর শিল্পীজীবনের এই চরম আনন্দের যে অপরূপ বিবরণ রেখে গেছেন তা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি সত্যদ্যোতক :

'আর একটা কথা বলে রাখি, গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না।

* * * * *

'গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল—তার বেশী আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য।'

* * * * *

'এই খুশির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে ; একেবারে পৌঁছয় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্বচনীয়।'

* * * *

'সৃষ্টির অন্তরতম এই অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁইফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা-খেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে

গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একই, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী, আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।’

এই নিবিড় আপনভোলা রূপলীলার উৎসজাত বলেই এই গানগুলি এক অত্যাশ্চর্য জীবনচেতনার নিমেষগুলিকে এত সহজে বেঁধে ফেলেছে অনবদ্য শিল্পের বিচিত্র রূপবন্ধনে। এদেরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চঞ্চল কবিহৃদয় খুঁজে পেয়েছে তার সার্থকতার চিরবসন্ত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গীতি-কবিতার পরিচয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদের আলোচনার শেষে আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ এবং বিচিত্র কাব্যপ্রয়াসের মধ্যে তাঁর ছোট ছোট গীতি-রচনার প্রয়াসগুলিই সবচেয়ে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে। আর কোন-জাতীয় কাব্যরচনার ক্ষেত্রেই কবি এই প্রায়-নিরবচ্ছিন্ন শিল্পসাফল্যের, এই নিবিড়-তৃপ্তিকর রূপরাজির এমন বিপুল সমাবেশের সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর এই গীতিরচনাগুলির শিল্পসৌষ্ঠব এবং রসাস্বাদের অপূর্ব বৈচিত্র্যের কিছুটা আভাস দেওয়ার প্রয়াসে এখানে কবির কয়েকটি গানকে সামনে রেখে সেগুলি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত রসবোধ বা appreciation কৌতূহলী পাঠকের সামনে রাখবার চেষ্টা করলাম। আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই গীতিরচনাগুলিকে এখানে আমি শুধু কাব্য হিসাবেই দেখেছি, সংগীত হিসাবে নয়। রবীন্দ্রনাথের সব গান পূর্ণাঙ্গ কাব্য নয়—আবার সব গীতিকবিতায় সুরসংযোগ সমান সার্থক হয়নি। এখানে আলোচিত রচনাগুলিকে আমি নিছক কাব্যোৎকর্ষের জন্যই বেছে নিয়েছি।

বলা বাহুল্য, এই অল্প কয়েকটি রচনার study-র ভিতর দিয়ে আমি এই জাতীয় কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কবির পরমাশ্চর্য সার্থকতার আভাসমাত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের কোন দাবী এরা রাখে না। গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের mood ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য অবর্ণনীয়। এই সামান্য কয়েকটি রচনার ভিতর দিয়ে তাই আমি এই বৈচিত্র্যের পরিচয় খুব বেশী দেবার চেষ্টা করিনি। বরং কবির অন্তরাভিজ্ঞতার কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রের মধ্যেই আমার চয়নকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। তবু আশা করি এই সামান্য কয়েকটি রচনার ভিতরেই হয়তো অনেক পাঠক রসাস্বাদের এক মনোরম বৈচিত্র্য অনুভব করবেন। একদিকে এদের মধ্যে যেমন কবির জীবনচিত্রণের অভাবনীয় গভীরতা, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের পরিচয় আছে, তেমনি আবার এদের মধ্যে শিল্পবিলাসী পাঠক খুঁজে পাবেন রূপরচনার অপূর্ব কারুকৌশল, যা প্রত্যেকটি creative

emotion-কে এক-একটি স্বয়ং-স্বতন্ত্র নিখুঁত সৌন্দর্যমূর্তিতে রূপায়িত করেছে। এই জাতীয় মনোরম গীতিকাব্য কবি এমনই ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের জন্য রেখে গেছেন যে তাদের ভিতর থেকে এই ত্রিশটি গানকে বেছে নিতে আমাকে কম বিভ্রান্ত হতে হয়নি।

মূল অভিজ্ঞতার প্রকৃতি অনুযায়ী গানগুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে সাজিয়ে দিয়েছি— ভাল করেছি কিনা জানিনা। একই মৌলিক ভাবরাজির বিচিত্র রূপ এবং রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করতে এই বিভাগগুলি কিছুটা সাহায্য করতে পারে। তার বেশী কোন উপকারিতা এদের নেই। বরং এই বিভাগগুলির উপর বেশী গুরুত্ব দিলে তাতে স্বাধীন রসগ্রহণে বাধা হতে পারে। কারণ মূল ভাবের ঐক্য যতই থাক না কেন, প্রত্যেকটি রচনাই এক-একটি অভাবনীয় মুহূর্তের আকস্মিক সৃষ্টি, এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। ঐটুকু ক্ষণিক নৃত্যলীলার মধ্যেই তাদের যা কিছু তাৎপর্য নিহিত।

প্রত্যেকটি গানের আলোচনা একই সঙ্গে ব্যাখ্যা, টীকা ও সমালোচনা। এই বিভাগগুলির পারস্পরিক অনুপাত সবক্ষেত্রে এক রকম নয়। কোন কোন গভীর ভাবদ্যোতনাময় রচনার ক্ষেত্রে ব্যখ্যাংশটিই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার অন্য অনেক ক্ষেত্রে ভাবরূপটি অপেক্ষাকৃত সরল হওয়ায়, ব্যাখ্যাংশটি সংক্ষিপ্ত অথবা একেবারেই নেই; সে সব ক্ষেত্রে হয়তো সমালোচনা এবং বিশেষ বিশেষ অংশের উপর টীকাই প্রধান। মোটের উপর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিশেষ কবিতাটির ভাব এবং রূপসংগঠনই এই আপেক্ষিক পরিমাণগুলি নির্ধারণ করেছে। তবে কোথাও কোথাও অবশ্য আমার ব্যক্তিগত খেয়ালের স্রোত যথোচিত সীমাবোধকে লঙ্ঘন করে থাকতে পারে।

প্রত্যেকটি আলোচনার অন্তর্গত ব্যাখ্যাংশটিকে আরম্ভে ও শেষে যুক্তচ্ছেদ দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হল।

সসংকোচে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেকটি আলোচনা পাঠের সময় বিশেষ গানটির উপর পরিপূর্ণ মনোযোগ রাখা প্রয়োজন। কারণ আমার এই প্রয়াসের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য—সুরসিক পাঠকের সাহচর্যে ঐ গীতিকবিতাগুলির পরিপূর্ণ কাব্যসৌন্দর্যের পুনরাবিষ্কার। তাই আমার ইচ্ছা ছিল প্রত্যেকটি গানের text-কে আলোচনার সময় পাঠকের চোখের সামনে রাখার। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ পনেরোটির বেশী গান সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করতে দিলেন না। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আটটি গানকে সম্পূর্ণভাবে তুলে দিতে হয়েছে; কাজেই পঞ্চম

পরিচ্ছেদের আলোচনাপ্রসঙ্গে ত্রিশটি গানের মধ্যে মাত্র সাতটির text সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করতে পেরেছি। বাকি তেইশটির text আমাকে আলোচনার বিভিন্ন অংশে খণ্ডে খণ্ডে উদ্ধৃত করতে হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ কাব্যগ্রন্থের বা "গীতবিতান"-এর প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাটির উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও, যেখানেই উদ্ধৃতির মধ্যে ফাঁক রাখতে হয়েছে সেখানেই প্রত্যেকটি অনুদ্ধৃত পংক্তির জায়গায় একটি করে তারকাচিহ্নের পংক্তি মুদ্রিত করা হল।

ক. চিরনবীন

(১)

বসন্ত তার গান লিখে যায়
ধূলির 'পরে
কী আদরে।
তাই সে-ধূলা ওঠে হেসে
বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি
আপনি ভরে
কী আদরে।

তেমনি পরশ লেগেছে মোর
হৃদয়তলে,
সে যে তাই ধন্য হল মন্ত্রবলে।
তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে,
বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল
আপনি ধরে
কী আদরে। ("গীতবিতান" পৃঃ ৫৩১)

প্রায় ষাট বছর বয়সে লেখা এই গীতি-কবিতাটিকে আমি রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-অন্তরের চিরনবীনতার এক পরমাশ্চর্য পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করেছি।

বিশ্বসাহিত্যের অমর কবিরা অনেকেই বার্ধক্যের প্রকোপ থেকে তাঁদের সৃজনীশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আশী বছর বেঁচে ছিলেন বটে, কিন্তু চল্লিশ বছরের পরে তাঁর সার্থক কবিজীবনের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। আবার মিল্‌টন্‌-এর কাব্যপ্রতিভা তাঁর ছেষট্টি বছরের জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত রীতিমত জীবন্ত ছিল। টেনিস্‌ন-ও আশী বছরের পরেও দু-একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করে গেছেন। কিন্তু কবিহৃদয়ের এই চিরনবীনতার সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য তাঁর পঞ্চাশ বছরের পরে লেখা — এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে? কোন এপিক্‌ কবি, কি ঔপন্যাসিকের পক্ষে এ হয়তো অনেকটা সম্ভব; কিন্তু একজন লিরিক কবির পক্ষে এ প্রায় অভাবনীয়। শুধু তাই নয়, "পূরবী" এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে এবং তাঁর শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছরের অজস্র গানে তিনি পৃথিবীর মহত্তম, মধুরতম প্রেমকাব্য রচনা করে গেছেন। এমন কি তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরের কিছু কবিতায় ও গানে তিনি যে অলৌকিক সৌন্দর্যের জাল বুনেছেন, তার তুলনা তাঁর আগেকার কাব্যেও বিরল। রবীন্দ্রনাথের একদা-সুহৃদ ইয়েট্‌স্‌ তাঁর Sailing to Byzantium নামক কবিতায় যে কথা বলেছেন—

A aged man is but a paltry thing
A tattered coat upon a stick, unless
Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress—

সে কথাটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রযোজ্য। তাঁর স্থূলদেহ জরার আক্রমণে যতই বিপর্যস্ত হয়েছে, তাঁর চিরনবীন প্রাণ যেন ততই গভীর আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। এই কবির কালজয়ী হৃদয়কে যেন একমাত্র চির-আবর্তিত বসন্ত ঋতুর অক্ষয় যৌবনশক্তির সঙ্গেই তুলনা করা যায়। আরো অদ্ভুত হচ্ছে এ বিষয়ে কবির আশ্চর্য আত্মচেতনা। এই পুলকিত আত্ম-আশ্বাসের সুরটি পৃথিবীর আর কোন কবির মধ্যে এমন বিচিত্র ছন্দে ধ্বনিত হয়নি।

সমস্ত অনুভূতিটি কয়েকটিমাত্র পংক্তির কুশলী বিন্যাসের ভিতর দিয়ে কী সহজে, অথচ কী অপূর্ব সূক্ষ্মতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবির জরাজয়ী হৃদয়ের

গীত-তারুণ্যের মূল কথাটিকে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করার জন্য এক মনোরম ভূমিকার অবতারণা করেছে প্রথম স্তবকটি। প্রথমাংশে আছে ধরণীর বুকে বসন্তের রূপরচনার ছবি ; দ্বিতীয়াংশে কবি-অন্তরের অফুরন্ত গীতবসন্তের কথা।

দুটি স্তবকের মধ্যে ভাবের ও রূপরচনায় অনুবর্তিতা শুধু যে স্তবকদুটির সামগ্রিক গঠনের মধ্যেই আছে তা নয়। আভোগের প্রত্যেকটি পংক্তির শব্দসমাবেশ অন্তরার পংক্তিগুলির উপর এক-একটি মনোরম variation রচনা করেছে। কিন্তু এই সুস্পষ্ট antithetical effect কোথাও কোন আড়ষ্টতার সৃষ্টি না করে বসন্তের ধূলি- রাঙানো যৌবনোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের অফুরন্ত সৃষ্টি-চঞ্চলতার মিলটি আমাদের মনে নিবিড়ভাবে সঞ্চারিত করে দেয়।

'বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির 'পরে'—আরম্ভের এই metaphor-টির অপূর্ব মৌলিকতা ও সাহসিকতা লক্ষণীয়। আরো দু-এক জায়গায় কবি এই জাতীয় image ব্যবহার করেছেন, যেমন 'অরূপ, তোমার বাণী' গানটিতে—

'যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে'।

কিন্তু এখানে কথাটি একটি অলংকৃত বিবৃতির মত। আলোচ্য গানটির প্রথম পংক্তির অনুভূতি-স্পন্দন ও সূক্ষ্ম রসব্যঞ্জনা এতে নেই।

'বারেবারে রূপের সাজি আপনি ভরে'—র-কারের সূক্ষ্ম অনুপ্রাসের রণন লক্ষণীয়।

'কী আদরে'—এই ধুয়াটি গভীর ব্যঞ্জনাময়। বসন্তের ফুল-ফোটানো, বা কবির গীতরচনা— সব সার্থক সৃষ্টির মূলেই আছে 'আদর', হৃদয়ের নিবিড় দরদ।

(২)

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

ফাগুনের চম্পকপরাগে
সেই রঙ জাগে,

ঘুমভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।

এই ছবি ভৈরবী-আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে.
বুকের লালিম রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি। ("সানাই", পৃ: ২৬)

কবিতাটি প্রথমে 'নতুন' রঙ নামে "সানাই"য়ে প্রকাশিত এবং পরে সুরযোজনার জন্য দুটি ভিন্ন রূপে পুনর্লিখিত হয়। অনেক দ্বিধার পরে আমি কবিতাটির প্রথম ("সানাই"-এর) পাঠটিকেই পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে বর্তমান আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি। কিন্তু গান হিসাবে পুনর্লিখিত ("গীতবিতান" ২য় খণ্ড-পৃ ৩৬৫ ও ৩৭৪তে-সংকলিত) দুটি রূপের মধ্যে যেটির আরম্ভ 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লান স্মৃতি' তারও কাব্যসম্পদ খুবই উচ্চাঙ্গের। পাঠককে অনুরোধ, তিনি যেন "গীতবিতান-এর" ঐ পাঠটিকে আলোচ্য পাঠটির সঙ্গে তুলনা করে পড়েন। তাতে বোঝা যাবে কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ কী এক বিস্ময়কর শিল্পকৌশলের অধিকারী হয়েছিলেন—যার বলে তিনি পুরোনো কবিতাকে সামান্য retouch করে তার মধ্যে অপূর্ব অভিনবত্বের সঞ্চার করতে পারতেন।

কবিতাটি লেখা হয় প্রায় আশী বছর বয়সে— এই তথ্যটি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। 'বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির পরে' গানটির আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা কবিমনের জরাজয়ী চিরতারুণ্যের কথা আলোচনা করেছি। সেখানে কবি নিজেই পুলকিত বিস্ময়ভরে জানিয়েছেন তাঁর হৃদয়ের অনন্ত গীত-বসন্তের কথা। বর্তমান কবিতাটিতেও জীবনের অন্তদিগন্তে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর বার্ধক্য-জয়ী শিল্পীমনের এই অলৌকিক কল্পনাবিহরণের উপর এক অপূর্ব বিশ্লেষণ টীকা রচনা করে গেছেন।

॥ কবি দীর্ঘজীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। জীবনের একদা-রঙীন প্রাঙ্গণ ধূসর হয়ে এসেছে। জরাস্পৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের স্তিমিত আলোয় শুধু বর্তমান নয়, অতীতের নানা-রঙের স্মৃতির দলগুলিও যেন ম্লান, বিবর্ণ হয়ে আসে। কবির যে কল্পনাবিলাসী রসপিপাসিত স্রষ্টার মন চিরদিন তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-রাশিকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্যে রূপান্তরিত করে এসেছে, আজও তার শক্তি শিথিল হয়নি। স্তিমিত ইন্দ্রিয়চেতনায় ক্ষীণ-হয়ে-আসা স্মৃতিচিত্রগুলিকে কবির অপরাজিত কল্পনার তুলি ক্ষণে ক্ষণে নতুন রঙের অভিনব স্পর্শে উজ্জ্বল করে তোলে। এক-একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতিগুচ্ছ যেন এক-একটি ধূলো-পড়া রঙ-মোছা পুরোনো ছবি। সেই স্মৃতিচ্ছবি যে-শিল্পীর হাতে আঁকা, দীর্ঘদিন পরে তিনিই আবার সেটিকে দেখছেন। এই আধ-মোছা রঙ-চটা ছবিটি তাঁর মনে জাগায় এক অধীর অতৃপ্তি। শিল্পীমনের সেই মহান অতৃপ্তির প্রেরণায় তিনি আবার তাঁর এখনকার তুলিটি হাতে নিয়ে তাঁর পরিণত কল্পনাশক্তির ইশারায় সেই বিবর্ণ স্মৃতিপটটিতে নতুন রঙের ছোঁওয়া লাগান। দেখতে দেখতে সেই মুছে-আসা ছবিটি আবার নতুন রঙের নিপুণ প্রয়োগে পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে ফুটে উঠল। কিন্তু এ কি সেই পুরোনো ছবিটি-ই? ঠিক সেই স্মৃতিচিত্রটি-ই কি আবার ফিরে এল? না, তা কখনই সম্ভব নয়। সেই বহুদিনের অভিজ্ঞতার মোটামুটি কাঠামোটি-ই হয়তো শুধু বজায় রইল, আর তার টিকে-থাকা রঙের অস্পষ্ট ছোপগুলি। কিন্তু বাকি সবই নতুন। যা লুপ্ত হয়েছে তার বদলে যে নতুন রঙের সমাবেশ, যে অভিনব আলোছায়ার বুনন, যে প্রচ্ছন্ন সংকেতলিপি আবির্ভূত হয়েছে তা এক বহুপরিণত, বহুপথ-পরিক্রান্ত মনের সূক্ষ্মতর, গভীরতর ধ্যানদৃষ্টির ফল।

এই সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি যে কেবল ক্ষীণরঙা স্মৃতিকেই নতুন রূপে জাগিয়ে তোলে তা নয়, বর্তমানকেও সে এক নতুন আলোর আভায় রঙিয়ে তোলে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির আপেক্ষিক ক্ষীণতা জীবনের সামগ্রিক পরিবেশ থেকে, বিশেষত, প্রকৃতির মায়াময় মাধুরী থেকে যে দীপ্তি কেড়ে নিয়েছে, সেই খরোজ্জ্বল ইন্দ্রিয়-দ্যুতির বদলে এই রূপবিলাসী মন সেখানে ছড়িয়ে দেয় এক অপূর্ব ইঙ্গিতময় আলোর কাঁপন। সেই আলোর স্পন্দনে বর্ণবিরল প্রকৃতিও এক নতুন-সংকেতময় বর্ণসমারোহে মনোহর হয়ে ওঠে।

ক্ষীণস্মৃত অতীত বা ক্ষীণানুভূত বর্তমানের সঙ্গে তাঁর পরিণত অন্তরের দীর্ঘসঞ্চিত মধু মিশিয়ে কবি যে অপরূপ রসমূর্তিগুলি সৃষ্টি করেন সেগুলি তাঁর জীবনের অন্তপ্রাঙ্গণকে রঙীন করে তোলে। যারা নেই, যারা হারিয়ে গেছে

তাদেরই দ্যুতিময় ছায়ারূপ প্রতিফলিত এই সৃষ্টিগুলিতে। এদের উপাদান টেনিসনের সেই 'Death in Life'[১] যারা আছে তবুও নেই। কবির জীবন-প্রান্তবর্তী পরিবর্তন-সচেতন অন্তরে তাই তারা জাগায় ভৈরবীর বিষাদ-মধুর মূর্চ্ছনা। তাঁর পরিপক্ক হৃদয়ের গভীর রঙে তারা রাঙানো ; তাঁর ধ্যানবিভোর অন্তরের স্বপ্নলোকে তাদের আমন্ত্রণ। ॥

মনে হতে পারে, জরাগ্রস্ত কবির অন্তরের এই রূপান্তরকারী আলো, এই অদ্ভুত বর্ণসঞ্জীবতা কোথা থেকে আসে ? এর প্রকৃতি কী ? এ যেন জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার প্রভাবে এক অসাধারণ ঐশ্বর্যময় এবং স্পর্শকাতর অন্তরে ধীরে ধীরে জেগে ওঠা ধ্যানের সূক্ষ্মতর আলো। এ যেন এক মহান অন্তরাভিসারী কল্পনার আলৌকিক দ্যুতি যা পরিচিত বাস্তবের ওপর প'ড়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে চিরন্তনের পটভূমিকায় স্থাপিত করে অপরিচিতের অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করতে পারে। অতুলনীয় সৌন্দর্যের ভাষায় এরই কথা বলেছেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ :[২]

Ah ! then if mine had been the Painter's hand
To express what then I saw ; and add the gleam,
The light that never was on sea or land,
The consecration and the Poet's dream.

সেই আলো যা আকাশেও নেই, পৃথিবীর বুকেও নেই, আছে শুধু মহান শিল্পীর অলক্ষ্য অন্তর্লোকে, যার অতিজাগতিক রশ্মির স্পর্শ বাস্তবের মর্মোদ্ঘাটন করে তার অন্তরের রহস্যময় চিরনবীনকে উন্মোচিত করে।

সব বড় শিল্পী-ই অল্পবিস্তর কল্পনার এই রূপান্তরকারী শক্তির অধিকারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতি যতই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাঁর সূক্ষ্মতর রসদৃষ্টি ততই নিবিড়তর হয়ে উঠে সেই শূন্যতাকে ভরে দিয়েছে।

প্রথম স্তবকে পাওয়া যায় অতীতের ম্লান স্মৃতির উপর কবিমনের গুঞ্জনগীতির সঞ্জীবনী প্রভাব। দ্বিতীয় স্তবকে দেখতে পাই কবির মনের এই নতুন রঙ স্তিমিত-

---

১ টেনিসন্ : Tears, Idle Tears.

২ Nature and the Poet-এর (পল্‌গ্রেভের দেওয়া নাম) চতুর্থ স্তবক।

প্রভাব প্রকৃতিকে কী ভাবে নতুন রূপে জাগিয়ে তোলে। তৃতীয় স্তবকে আভাসিত হয়েছে স্রষ্টা-কবিরই মনের উপর তাঁর এই অভিনব রসসৃষ্টির প্রভাব।

শব্দসমাবেশের অবর্ণনীয় মাধুরী কবির এই পর্যায়ের অলৌকিক শিল্প-কৌশলের পরিচয় বহন করে।

'গুঞ্জনগীতি' কথাটির কী অপূর্ব উপযোগিতা! এই পর্যায়ের কাব্যে ও গানে কবি যে ধরনের মায়াময় শিল্প-আবেদনের সৃষ্টি করেছেন তাকে এক-জাতীয় ইন্দ্রজাল বললে ভুল হয় না।

'সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি'—image-টির মৌলিকতা এবং সাহসিকতা বিস্ময়কর; কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য এর আচ্ছন্ন-করা সৌন্দর্য। পিয়ালবনের পূর্ণিমা থেকে ইন্দ্রিয়ক্ষীণতা যে রঙ কেড়ে নিয়েছে তার পরিপূরণ হয়েছে কবির মধুসঞ্চিত অন্তর-উৎস থেকে প্রবাহিত নতুন রঙে।

'মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে'—অতীতের ক্ষণিক স্বপ্নরূপের মরীচিকা। তুলনীয়—

হায়রে সেকাল হায়রে কখন চলে যায়রে
আজ এ কালের মরীচিকায় নতুন মায়ায় ভাসিতে।

'বুকের লালিম রঙে রাঙানো'—Image-টি যেমন সুন্দর তেমনি গভীর-আভাসময়। এই 'লালিম রঙ' বার্ধক্যজয়ী কবিহৃদয়ের বহু অভিজ্ঞতার নির্যাসরঞ্জিত প্রেমের মৃদুকোমল রাঙিমা। অন্তরের এই অবস্থার কথাই কি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বলেছেন Tintern Abbey-র অমর পংক্তিগুলিতে?—

When thy mind
Shall be a mansion for all lovely forms,
Thy memory be as a dwelling place
For all sweet sounds and harmonies.

খ. 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া'

(৩)

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি ॥
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥

তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি ॥ ("গীতবিতান" পৃ.৩৬১)

"সানাই"-এ প্রকাশিত ছন্দোবদ্ধ মূল কবিতাটির আরম্ভ—'ওগো মোর নাহি যে বাণী।' বর্তমান কবিতাটি সুর-যোজনার জন্য পুনর্লিখিত রূপ। কাব্যসম্পদের দিক দিয়ে এই পাঠটি "সানাই"-এর মূল রচনাটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়।

॥ বিপুল সীমাহীন সৃষ্টিলোক থেকে অসংখ্য stimulus-এর তরঙ্গজাল ভেসে এসে কবির (এবং বিশ্বমানবের) চেতনাকে নিরন্তর স্পর্শ করছে। কিন্তু অনন্তের এই বিপুল, বিহ্বল-করা বার্তাস্রোতের কোন উত্তর দেবার ক্ষমতা কবির নেই। সমস্ত জীবন ধরে তিনি শুধু শিখেছেন এই রহস্যময় বিশ্ববাণীর মায়াতরঙ্গগুলিকে গ্রহণ করতে ; সারাজীবনের বিচিত্র সাধনার ফলে তিনি আজ হয়েছেন এক স্পর্শকাতর বেতারগ্রাহকযন্ত্র ; কিন্তু প্রতিবার্তা প্রেরণের ক্ষমতা তাঁর আজও নেই।

শুধু তাই নয়, পাঠাবার মত বার্তাই বা কী আছে ? চেতনার গভীরতম প্রশ্নগুলির সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিরুত্তরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সেই রহস্যের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন। অমারজনী যেমন অগণ্য তারার চোখ মেলে অন্ধকারের পরপারে দৃষ্টিপাত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তেমনি, অকূল রহস্যের অন্ধকারে বাণীহারা কবিসত্তা চেতনার অসংখ্য aerial, অসংখ্য feeler মেলে এই অকূল বিশ্বরহস্যের কূল খোঁজে — চেতনার স্রোত কোন অভাবনীয় পথে ধাবিত, সে পথের শেষ কোথায়। কিন্তু এই চেয়ে-থাকার বুঝি শেষ নেই।

কবির স্পর্শকাতর অন্তর্গহনের দ্বার যখন হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন মনে হয় এই রহস্যময় বিশ্ববাণীর উৎস যে মহাশিল্পী,—কোন অপরিমেয় দূরত্ব থেকে তিনি যেন তাঁর বাঁশিতে সুর লাগিয়েছেন। সেই অলৌকিক সুরতরঙ্গমালা নিরুত্তরের স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে, বাতাসকে মোহ-বিহ্বল করে, স্তিমিত চেতনার সাগরে আলোড়নের রেখা এঁকে কবির হৃদয়ে ভেসে আসছে। কিন্তু বাণীহারা কবির সাধ্য নেই এই পরমাশ্চর্য বার্তারাশির কোনো প্রত্যক্ষ উত্তর দেবার। তাঁর কাব্যে, তাঁর গানের সুরে, তাঁর কর্মে, তাঁর অব্যক্ত ভাবনা-বেদনায় তিনি শুধু সেই মহা-অজানার বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রচনা করে তাই তাকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নির্বাক, প্রশ্নব্যাকুল কবি জানেন না, তাঁর উৎসুক প্রতিধ্বনির রেশগুলি কখনও দুর্গম রহস্যতিমির পার হয়ে সৃষ্টিস্বপ্ন-পরিবৃত সেই মহাশিল্পীর কানে গিয়ে পৌঁছয় কিনা। ॥

প্রায় আশী বছর বয়সে লেখা এই কবিতাটি কবির এক অতুলনীয় সৃষ্টি। শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখায় নয়, বিশ্বকাব্যে কোথায়ও এর তুলনা আছে বলে জানি না। অধ্যাত্মবিশ্বাসের অনেক আশ্চর্য কবিতা রবীন্দ্রনাথের আছে। যে বিশ্বাস নিবিড় অন্তরানুভূতি হয়ে দেখা দেয় তার শিল্পরূপায়ণে তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু গভীর বিশ্বাসের মধ্যেও কোথাও কোথাও অজ্ঞাতসারে কিছুটা আত্মবঞ্চনা মিশে থাকে, এবং শ্রোতা বা পাঠকের মনেও সেই বিশ্বাস অনেক সময় অনুরূপ দুর্বলতায় আঘাত করে। তাই এই ধরণের বিশ্বাসের চেয়েও বড় বোধ হয় মানুষের নিবিড় সত্যানুভূতি। ইচ্ছার রঙে না-রাঙানো মহত্তম স্তরের এক সত্যানুভূতি শিল্পরূপ পেয়েছে 'বাণী মোর নাহি'-তে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের মিলনাকাঙ্ক্ষী hymn-রচয়িতা নন। এখানে তিনি বিশ্বরহস্যপ্লাবিত প্রশ্নবিহ্বল মানবমনের প্রতিভূ। এই মানবমন সৃষ্টির রহস্যলোক থেকে কেবলই বিচিত্র বার্তা, অগণ্য উদ্দীপনা গ্রহণ করছে। কিন্তু তার ক্ষমতা নেই এই সাংকেতিক লিপিমালার অর্থ উদ্ধার করে এই বিশ্বরহস্যের কিনারা করার। অনুভূতির গভীরতম মুহূর্তে তার মনে হয় সুদূর বিশ্বকেন্দ্রের কোন অজানা উৎস থেকে যেন এক মহা-আভাসময় বাণীর স্রোত ভেসে আসছে; এই জগতের আকাশ-বাতাস-মাটির যত বিচিত্র স্পর্শ সবই তার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। কিন্তু তার অর্থ, তার তাৎপর্য, যেন কিছুই বোঝা যায় না। এই বিহ্বল নিষ্ক্রিয়তার মুহূর্তে মানুষের মনে হয়, তার যত কাজ, যত চিন্তা, যত প্রয়াস—সবই এই বিশ্বতরঙ্গের সূক্ষ্ম ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। কবি বা বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের প্রতিক্রিয়া হয়তো সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার থেকে কিছুটা ভিন্ন

প্রকৃতির ; কিন্তু শেষ বিচারে সেই প্রতিক্রিয়া cosmic stimulus-এর response ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ মানুষ জানে না তার এই উৎসুক প্রতিক্রিয়ার প্রতিধ্বনিবার্তা সমস্ত রহস্যের উৎস সেই বিশ্ববাণীর কেন্দ্রে আদৌ ফিরে যায় কিনা।

সৌন্দর্যের যাদুকর চিরমুখর কবির এই স্বীকৃতি আমাদের মনে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আমরা বুঝিতে পারি চেতনার কী পরিশুদ্ধি, কী নিবিড় সত্যানুভব এবং কী গভীর বিনতি এর মূলে আছে। চেতনার আকস্মিক ঝলকে ঝলকে যাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বরহস্যের মর্মকথা বার বার আভাসিত হয়ে উঠেছে, তাঁরই অন্তরে জেগে উঠেছে এই ব্যাকুল প্রশ্ন। এই পরমাশ্চর্য রচনাটিকে কবির সবচেয়ে বড় utterance বললে বোধ হয় ভুল হয় না।

এই অতুলনীয় ভাবগৌরবের রূপায়ণ হয়েছে এক মর্মস্পর্শী সৌন্দর্যমালায়। Image-গুলির ভাবব্যঞ্জনা চমকপ্রদ। মানুষের উৎসুক, আলোকপিয়াসী চেতনার চিত্রণে এমন বিপুল-পরিসর মহা-ইঙ্গিতময় imagery-র ব্যবহার শেলি-র কয়েকটি রচনায় ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। 'স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি'—এই image-টির তুলনা মেলে "পত্রপুট"-এর বিস্ময়কর পঞ্চম কবিতাটিতে ("সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে") —

... ... ব'লে

ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়।
সে যুগের পালানো বাণী ধরবে বলে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
... ...

সেখানে গানের মায়াজাল বিস্তার করে পূর্বজন্মের পলাতক ছায়া-স্মৃতিকে ধরবার চেষ্টা। এখানে মানুষের পিপাসিত চেতনা এক বহুসূত্রে-গাঁথা প্রকাণ্ড wireless aerial-এর মত আপনাকে মেলে ধরেছে বিশ্ববাণীর তরঙ্গরাজিকে ধরার আশায়।

তারপরের image-টি—'আমি অমাবিভাবরী আলোহারা', তার cosmic grandeur-এ এবং নিবিড় ইঙ্গিতময়তায় আমাদের মনকে যেন তড়িতাহত করে। এই কথাগুলির অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনাশক্তি ও ধ্বনিমাধুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'অমাবিভাবরী' কথাটি অমারাত্রির যে তিমিরঘন বিপুলতার ছবি আঁকে, 'অমারজনী' বা 'অমানিশীথিনী' দিয়ে তা ঠিক সম্ভব হত না। আবার শুধু 'অমাবিভাবরী' নয়, 'অমাবিভাবরী আলোহারা'। 'আলোহারা' কথাটি এখানে যুক্তির দিক দিয়ে

নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু ভাবরূপটির পরিপূর্ণ চিত্রণ হত না ঐ শব্দটি ছাড়া। শুধু অমারাত্রি নয়, আলোকবঞ্চিত আত্মহারা, দিশাহারা অমারাত্রি, light-lorn darkling night। 'অমাবিভাবরী' এবং 'আলোহারা' কথা দুটির র-কারের অন্ত্যানুপ্রাসটিও এক অবর্ণনীয় মাধুরীর সৃষ্টি করেছে।

'মেলিয়া অগণ্য তারা' image টির অর্থ ব্যাখ্যাংশে প্রকাশ পেয়েছে। অমারজনীর এক-একটি তারা যেন রহস্যতিমির-পরিবৃত মানবচেতনার এক-একটি উৎসুক কম্পমান শিখা। আঠারো বছর আগে প্রকাশিত "লিপিকা"র একটি রচনায় ('প্রশ্ন') এই image-টির আর একটি রূপ পাওয়া যায়—

'তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা?" আকাশে তার কোনো সাড়া নেই: কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।'

দ্বিতীয় অংশের image-গুলিও কম আশ্চর্য নয়। সৃষ্টির অজানা উৎস থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসছে 'নীরবতার গভীরে, বিহ্বল বায়ে, নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।' মনে হয়, এই image-তিনটির প্রথম ও তৃতীয়টি চেতনার অন্তর্লোকের চিত্রণ, এবং দ্বিতীয়টি বাইরের[১]। 'নীরবতা' হচ্ছে বিপুল বিশ্বরহস্যের নিরুত্তরের নীরবতা, আর 'নিদ্রাসমুদ্র' হচ্ছে মানুষের স্তিমিত চেতনার নিদ্রাসাগর। কিন্তু 'বিহ্বল বায়ে'-র কোন আত্মিক তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। এটি বোধ হয় প্রকৃতিরই একটি ভাবময় চিত্র: সেই অলৌকিক বাণীর তরঙ্গকম্পনে বায়ুমণ্ডল যেন পুলকিত, হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে। বহিঃপ্রকৃতির এই ভাবচিত্রটি অন্তশ্চেতনার দুটি চিত্রের সঙ্গে মিলে এক অপূর্ব রূপসমাবেশের সৃষ্টি করেছে।

'তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে' কথাটি কী সরল, অথচ কী গভীর। এর মধ্যে আর্টের একটি সম্পূর্ণ theory সংহত হয়ে আছে বলা যায়। সংক্ষেপে তা এই যে, কাব্য বা সঙ্গীত প্রধানত বিশেষ চেতনার উপরে জীবনের অনির্দেশ্য প্রেরণার প্রতিক্রিয়া। এই theory-কে আরো প্রসারিত করলে মানুষের সমস্ত কর্মপ্রয়াসকেই এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু একটি পংক্তির মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ততার মধ্যে এই মহৎ ভাবানুভূতিটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে আভাসিত হয়েছে।

'কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে। বিপুল অন্ধকার বাহি'— আর একটি চমকপ্রদ image, যার মধ্যে এক প্রকাণ্ড ভাবজগৎ লুকিয়ে আছে। প্রথমত,

১ এই কথাটি সম্বন্ধে অবশ্য আমি নিজেই নিশ্চিত নই।

'এত সাধনা এত কামনা কোথায় মেশে'—এই প্রশ্নটি সভ্যজগতের সমস্ত চিন্তাশীল, অনুভূতিপ্রবণ মনের চিরন্তন প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, 'তব স্বপ্নের তীরে' আর একটি মহৎ ভাবলোকের আশ্চর্য সংহত শিল্পরূপ। এই বিপুল বিশ্বলোক যেন এক পরম শিল্পীর পুলকিত স্বপ্নলীলা; সেই স্বপ্নসাগরের তীরে বসে তিনি যেন তার বিচিত্র তরঙ্গলীলা উপভোগ করছেন।

(৪)

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি ॥

* * * * *

* * * *

নাহয় ডুবে গেলই, নাহয় গেলই বা।
নাহয় তুলে লও গো, নাহয় ফেলোই বা।
হে অজানা, মরি মরি, উদ্দেশে এই খেলা করি,
এই খেলাতেই আপন-মনে ধন্য মানি ॥ ("গীতবিতান", পৃ ১৬)

বিশ্ব-উৎসের মহা-অজানার উদ্দেশে শিল্পীমানবের আর একটি অপূর্ব সম্ভাষণ। 'বাণী মোর নাহি'-তে আর্ট যেন রহস্যময় বিশ্ব-প্রেরণার অস্ফুট প্রতিক্রিয়া। এখানে আর্ট যেন দেখা দিয়েছে শিলার-এর play impulse[১] হয়ে, এক মনোরম, নিবিড়-তৃপ্তিকর লীলারূপে[২]। একটিমাত্র মূল image-এর বিচিত্র বিস্তারের ভিতর দিয়ে এই স্নিগ্ধ-ব্যাকুলতার mood-টি এক অবর্ণনীয় মাধুর্যে বিকশিত হয়েছে। গভীরতম ভাবানুভূতির একান্ত সহজ ব্যঞ্জনার এর চেয়ে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

১ জে. সি. এফ. শিলার (১৭৫৯-১৮০৫): Letters on the Aesthetic Education of Mankind

২ তাঁর কাব্যসৃষ্টি যে এক ধরণের দায়হীন খেয়াল-খেলা, এই বোধ রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আভাসিত। একটি দৃষ্টান্ত—

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা—
আন্‌মনা যেন দিক্‌বালিকার ভাসানো মেঘের ভেলা ॥
যেমন হেলায় অলস ছন্দে কোন্ খেয়ালির কোন্ আনন্দে
সকালে-ধরানো আমের মুকুল ঝরানো বিকালবেলা ॥
("গীতবিতান", পৃ ২২৮)

॥ কবির গানগুলি যেন পরম অজানার উদ্দেশ্যে কালসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া এক-একটি নৈবেদ্যতরী। কবি জানেন না, মহাকালের সাগরস্রোতে ভেসে ভেসে কোনো দিন তারা সার্থকতার তীরে গিয়ে পৌঁছবে কিনা। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার কথা ভেবে কবির মনে তেমন কোন দুঃখ নেই। তাঁর খেলার-ছলে-সাজানো দিনে-দিনে-ভাসিয়ে-দেওয়া গানের তরীগুলি যুগের পর যুগ কালস্রোতে ভেসেই চলুক, অথবা কিছুদূর গিয়ে মাঝসমুদ্রে ডুবেই যাক— কোন কিছুতেই কবির দুঃখ নেই। অমরতার তীর্থতীরে তারা অভিনন্দিত হোক, বা বিস্মৃতির সাগরগর্ভে তারা লুপ্ত হোক— কিছুতেই কবির তেমন কিছু আসে যায় না। এমন কি, যে মহা-অজানার উদ্দেশে তিনি প্রাণের এই গীতিনৈবেদ্যগুলি পাঠাচ্ছেন সেই গুণী যদি তাঁর উপহারগুলি তুলে নেন তো ভাল; যদি না নেন তাহলেও কবি নিজেকে ব্যর্থ মনে করবেন না। কারণ তাঁর অন্তরেরবেদনা-অনুভূতি দিয়ে নিত্য-নতুন গানের মালা গেঁথে সব প্রেরণার উৎস সেই অজানার উদ্দেশে ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যেই কবি তাঁর জীবনের গভীর সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। এই শিল্পার্ঘ্যরচনার আনন্দ এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে সেই রচনাগুলির পরিণাম-চিন্তা তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। আরো একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে এর মধ্যে: কবি তো তাঁর এই গীতি-উপহারগুলিতে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়েছেন; এর পরে তাঁর আর চিন্তার কারণ কী থাকতে পারে? যাঁর উদ্দেশে গানগুলি রচিত, গ্রহণ বা বর্জনের, আদর বা অবহেলার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁরই। ॥

কবিতাটির স্নিগ্ধ-মধুর আনন্দ-আশ্বাসের ভিতরে প্রবাহিত অতি-মৃদু অভিমান-ছোঁয়া ব্যাকুলতার সুরটি সমস্ত mood-টিকে এক অপরূপ মধুরতায় অভিষিক্ত করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি:

স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে সুদূরে কোন্ অচিন দেশে
কোনো ঘাটে ঠেকবে কিনা নাহি জানি ॥

এর মধ্যে 'স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে'-র ধ্বনিমাধুর্য যেমন মনোরম, ভাব-ব্যঞ্জনাও তেমনি। আগামী কালের অনির্দেশ্য স্রোতের লীলায় ভেসে, অনাগত যুগ-যুগান্তরের নতুন মানুষের ভাল-লাগা-না-লাগার ভিতর দিয়ে কখনো আদরে, কখনো উপেক্ষায় গানগুলি এগিয়ে চলবে তাদের অজানা তীর্থের দিকে।

(৫)

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,

*   *   *

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমার সুরের খেতের প্রথম সোনার ধান ॥
আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল—

*   *   *

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান ॥

("গীতবিতান" পৃ ৪৭৫)

আটাত্তর বছর বয়সে লেখা এই কবিতাটিও প্রথমে প্রকাশিত হয় "সানাই"-এ এবং তারপরে সুর-বসানোর জন্য পুনর্লিখিত হয়। 'ওগো তুমি পঞ্চদশী', 'বসন্ত সে যায়তো হেসে', এবং 'বাণী মোর নাহি'-র মত এক্ষেত্রেও "গীতবিতানে" সংকলিত এই পুনর্লিখিত রূপটি প্রকাশ-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মূল রচনাটির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কবিতা হিসাবে এই গীতরূপটির একটি খুঁত আছে; সে হচ্ছে দ্বিতীয় পংক্তিটির বিসদৃশ ছন্দোহীনতা—

আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।

অবশ্য এ বিষয়ে কবির কিছুমাত্র দায়িত্ব ছিল না। কারণ এই পরিবর্তিত রূপটিকে তিনি স্বাধীন কাব্য হিসাবে আমাদের হাতে দেননি; দিয়েছেন সুরে বসানো একটি গান হিসাবে—যেখানে ছন্দের ইচ্ছাকৃত ফাঁক অপূর্ব সুরে ভরে উঠেছে। যাই হোক, দ্বিতীয় পংক্তিটির এই ছন্দোগত অসঙ্গতি সত্ত্বেও আমি "গীতবিতান"-এর পাঠটিকেই সামগ্রিক বিচারে শ্রেষ্ঠতর মনে করে এখানে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি। "সানাই"-এর পাঠটিকে পাশে রেখে বিচার করলেই এখানে আলোচিত পাঠটির নিবিড়তর আভাসময়তা এবং মহত্তর আবেদন-সংহতি সহজেই ধরা পড়বে।

॥ তাঁর সব প্রেরণার উৎস, সুদূর প্রাণসখার সঙ্গে কবির এক অবিরাম দেওয়া-নেওয়ার পালা চলছে। তিনি কবির প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে চকিত দানের চমক লাগিয়ে তাঁর কাছ থেকে নিত্য নতুন আনন্দরূপ সৃষ্টির প্রতিদান চান।

তাঁর ক্ষণিকের দান কবির হৃদয়কে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে মিলিয়ে যায়; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় কবির হৃদয় গভীর সুরে বেজে উঠে আনন্দের বিচিত্র রূপরাশি সৃষ্টি করতে থাকে।

এবারের বর্ষার প্রারম্ভে হঠাৎ একদিন সেই কৌতূহলী সখার হাত থেকে নেমে এসে কয়েকটি নতুন-ফোটা কদমফুল বনানীর সবুজ কোল থেকে কবিকে সম্ভাষণ জানাল। অমনি কবির হৃদয় সুরে বেজে উঠল নববর্ষার প্রথম গানখানি রচনা করে সেই নম্রমধুর ডাকে সাড়া দিতে। এই চকিত দানের বারিপাতে কবির প্রাণের সুপ্ত সুরের খেতে এই প্রথম-গানেব সোনার শিষগুলি চিত্তাকাশের মৌন মেঘাস্তরণের তলে ধীরে ধীরে জেগে উঠল।

কিন্তু ঐ অদৃশ্য প্রেরণার উৎস থেকে যে দানগুলি ভেসে আসে, তাদের আসা-যাওয়ার তো কোন ঠিক নেই। কোন্ অনির্দেশ্য খেয়ালের স্রোতে ভেসে এসে তারা কয়েক নিমেষের জন্য চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়; আবার সেই স্রোতেই ভেসে চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। বাদল-দিনের এই যে প্রথম কদমফুল আজ কবিকে নববর্ষার মধুর সম্ভাষণ জানাল—হয়তো কবির কাছে এই তার শেষ দান। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই এই মধুর উপহারের ডালা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ক্ষণিকের দান কবির অন্তরে যে সুরের প্লাবন জাগাল, যে ছোট্ট গানটিকে ফুলের মতন স্তরে স্তরে ফুটিয়ে তুলল, তার জীবনের মেয়াদ তো এত অল্প নয়। বিস্মৃতির নির্মম কালস্রোত যথারীতি প্রতিটি বর্ষার রূপকে গ্রাস করতে করতে এগিয়ে চলবে। কিন্তু একটি বিগত বর্ষার একটি দীর্ঘলুপ্ত কদম্বগুচ্ছের আহ্বান একটি কবির হৃদয়ে যে সুরের সাড়া জাগিয়েছিল তার মর্মস্পর্শী রেশ তো সেই বিলুপ্তির মহাপ্লাবনে সহজে গ্রস্ত হবে না। বছরে বছরে এই সর্বগ্রাসী বিস্মৃতিস্রোতের উপর সে তার সোনার তরীখানি বেয়ে এসে প্রতিটি শ্রাবণের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে সেই ক্ষণিক আহ্বানের চিরন্তন সাড়াকে নরনারীর মুগ্ধ হৃদয়ে ধ্বনিত করে তুলবে।॥

বিশ্বসখার সঙ্গে এই অবিরাম বাণী-বিনিময়ের ভাবটি বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় আর একটি গানে:

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া তোমায় আমায়—
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায় ?।
যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায়॥

ওগো, তোমার সোনার আলোর ধারা, তার ধারি ধার—
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে শোধ করি তার।

* * * *

("গীতবিতান," পৃ ১৪৩)

কিন্তু তফাৎটি সহজেই অনুভব করা যায়। 'দেওয়া নেওয়া'য় মূল ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্টভাষিত, অত্যধিক explicit; 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল'-এর সূক্ষ্ম আভাসব্যঞ্জনা এতে নেই। দ্বিতীয়ত 'দেওয়া নেওয়া'য় এই ভাববিনিময় প্রায় এক সাধারণ দৈনন্দিন, নিরবচ্ছিন্ন ধারা হয়ে দেখা দিয়েছে; 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল'-এ পরিচিত ধারাটিই এক পরম আকস্মিকতার ভিতর দিয়ে এক অপূর্ব নবীন মূর্তিতে পুনরাবির্ভূত হয়েছে।

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের যাদুময় সৌন্দর্যসৃষ্টির এক চরম দৃষ্টান্ত। কী এক অতি-সাধারণ, আপাত-তুচ্ছ কারণ থেকে এই ঐশ্বর্যময় ভাবলোক, এই মোহময় সৌন্দর্যের মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। অন্তরা ও আভোগে যে দুটি পরমাশ্চর্য image ব্যবহৃত হয়েছে তাদের গভীর সৌন্দর্য-আবেদনের তুলনা রবীন্দ্রকাব্যেও বিরল। দুটিরই সৌন্দর্যাভাস মধুরতর হয়ে উঠেছে অপূর্ব-সুষমাময় ধ্বনি-সমাবেশে।

শেষ কয়েকটি পংক্তিতে "সানাই"-এর পাঠটির সঙ্গে এখানে আলোচিত "গীতবিতান"-এর পাঠটির একটি অদ্ভুত তফাৎ চোখে পড়ে। "সানাই"-এ সংকলিত প্রথম রচনাটিতে যেখানে ছিল—

স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবনে
আমার এ গান শ্রাবণে শ্রাবণে
ফিরিয়া ফিরিয়া বাহিবে তরণী
ভরি তব সম্মান। ("সানাই" পৃ ৪৪)

"গীতবিতান"-এর পুনর্লিখিত রূপটিতে সেখানে হয়েছে—

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।

আশ্চর্য এই যে 'স্মৃতিবন্যা'র জায়গায় এসেছে বিপরীতার্থক 'বিস্মৃতিস্রোত'। এতে ভাবসামঞ্জস্য ও প্রকাশমাধুরী দুদিক দিয়েই লাভ হয়েছে। কবির এই প্রীতি-উপহারস্বরূপ গানটির আবেদনের অবিস্মরণীয়তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। সে হিসাবে 'স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবনে' অর্থাৎ অতীত থেকে যে স্মৃতির স্রোত সাধারণভাবেই মানবমনে প্রবাহিত হয় সেই স্রোতে (আরো অনেক জিনিসের সঙ্গে) ভেসে এসে কবির গানটি বার বার ভবিষ্যতের মানুষের মনকে মুগ্ধ করবে—এর মধ্যে এমন কিছু অসাধারণতা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পাঠটির ভাব অপূর্ব। বিস্মৃতির স্রোত সব কিছুকে অমোঘভাবে বর্তমান থেকে অতীতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কবির কালজয়ী গান এই অতীতমুখী বিস্মৃতিস্রোতকে পরাস্ত করে তার বুকে উজান-তরী বেয়ে বার বার ভবিষ্যতের মানুষের অন্তরে ফিরে এসে আনন্দের সাড়া জাগাবে।

ছন্দোগতি ও স্বরসংহতির দিক দিয়েও "গীতবিতান"-এর পুনর্লিখিত রূপটির শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। বিশেষত, 'শ্রাবণে শ্রাবণে'-র পর 'বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে' এক অনির্বচনীয় ধ্বনিমাধুরীর সৃষ্টি করেছে।

নিজের কাব্যের অমরত্ব সম্বন্ধে এই পুলকিত আশ্বাস প্রাচীন রোমের, এবং রেনেসাঁস যুগের ইটালি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বহু কবির মধ্যে পাওয়া যায়। সবচেয়ে স্মরণীয় বোধ হয় শেক্স্‌পীয়ারের সনেটগুলির কতগুলি পংক্তি :

But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st ;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st.

(১৮ নং সনেট)

Not marble nor the gilded monuments
Of princes shall outline this pow'rful rhyme

(৫৫ নং সনেট)

And yet to times in hope my verse shall stand
Praising thy worth despite his cruel hand.

(৬০ নং সনেট)

And thou in this shalt find thy monument
When tyrants' crests and tombs of brass are spent

(১০৭ নং সনেট)

এ ক্ষেত্রেও বোধহয় রবীন্দ্রনাথের দুটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে: প্রথমত তাঁর কাব্যের অমরতার আশ্বাসের সঙ্গে, এখানে এবং অন্যান্য রচনায়ও, এক আধ্যাত্মিক বা মিস্টিক চেতনার সংমিশ্রণ; দ্বিতীয়ত, তাঁর অনুভূতির এবং প্রকাশরীতির অসাধারণ পরিমার্জনা ও সূক্ষ্মতা।

গ. অন্তর্বাণী-সম্ভাষণ

(৬)

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি বিদায়গাথা আগমনী
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে॥

* * *
* * *

সময় যে তার হল গত নিশিশেষের তারার মতো,—
তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ-সাথে॥

("গীতবিতান" ৪৯২)

আর একটি অসীম-বিস্ময়কর, অবর্ণনীয়-সৌন্দর্যময় সৃষ্টি। আপন অন্তরের গহনবাসী চির-রহস্যময় শিল্পীসত্তা সম্বন্ধে কবির এক অপূর্ব অনুভূতির পরিচয় এখানে আছে। কিন্তু এই অনুভূতির মূল সুর বিস্ময় বা কৌতূহল বা উচ্চকিত প্রত্যাশা নয়। এখানে কবি তাঁর মর্তজীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়ে তাঁর সেই বাণীসত্তার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের মুহূর্তটির কথা—বহুদিনের এই বিচিত্র-সৃষ্টিকারী সংযোগটি ছিন্ন হওয়ার আসন্ন নিমেষটির কথা—ভাবছেন। মৃত্যু যেন দুই প্রিয়বন্ধুর মধ্যে শীঘ্রই বিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দেবে। জীবনান্ত-সম্মুখীন রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়বাসী অমর শিল্পীসত্তাকে বিদায় দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে প্রিয়সখার দীর্ঘ সাহচর্যের অপূর্ব সৃষ্টি-উন্মাদনাভরা দিনগুলি স্মরণ করছেন। কবির অন্তরের রহস্যময় দ্বৈত-চেতনার আর একটি অভিনব রূপ।

এখানে একান্ত মৌলিক ভাবানুভূতিটির অতল গভীরতা ও অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য যে আশ্চর্য-সংক্ষিপ্ত প্রকাশরূপে মূর্ত হয়েছে তার absolute perfection, তার রূপের প্রতিটি কণা সহৃদয় পাঠকের অন্তরকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরসে জারিত করে।

॥ কোন এক সুন্দর শরৎ-প্রত্যুষে—যখন প্রথম ভোরের আলোয় আকাশের অজস্র তারা মিলিয়ে যাচ্ছে, যখন বনের স্নিগ্ধসুরভিত শেফালি মাটির বুকে ঝরে পড়ছে —তখন কবির মনে হল, তাঁর জীবনকাল শেষ হয়ে এসেছে এবং জীবন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী বাণীসত্তার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন হওয়ার দিনটি এগিয়ে আসছে। বাইরের মানুষ রবীন্দ্রনাথ যেদিন এ-জগৎ ত্যাগ করবেন সেদিন তাঁর অমর শিল্পীসত্তার, তাঁর immortal creative self-এর কী হবে; যে 'আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক' অনির্দেশ্যভাবে তাঁর হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল, সে কোথায় যাবে ?

অন্তরের এই সৃষ্টিকারী শক্তিকেই কবি এখানে এবং আরো অনেক জায়গায় 'বাঁশি' বলেছেন। এই নামের ব্যঞ্জনা অপূর্ব। বাদকের ফুৎকারের হাওয়া বাঁশির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে সুরের লহরী হয়ে। কবির শিল্পীসত্তার যাদুস্পর্শেও তেমনি জীবনের সাধারণ সুখদুঃখময় উপাদান অপার্থিব-সৌন্দর্যময় শিল্পরূপে পরিণত হয়। অন্তরের এই রূপান্তরকারী শক্তি—যার স্পর্শে ক্ষণিকের অভিষেক হয় চিরন্তন সৌন্দর্যে —তাকে কবি অমর, অক্ষয় না মনে করে পারেন না। তাই এই চিন্তাব্যাকুল প্রশ্ন। ॥

তোমার বুকে বাজল ধ্বনি বিদায়গাথা আগমনী
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে।—

—এই পংক্তি-তিনটির রসব্যঞ্জনা অবর্ণনীয়। কোন ব্যাখ্যাই এই অসীম সৌন্দর্যাভাসকে ব্যক্ত করতে পারেনা। মানুষের সমস্ত জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখের স্পন্দন—তার চিরন্তন মর্মকথা—এই তিনটি পংক্তির ইন্দ্রজালে ধরা পড়েছে। 'বিদায়গাথা' ও 'আগমনী', 'ফাল্গুনে' ও 'শ্রাবণে', 'প্রভাতে' ও 'রাতে',—এই তিন জোড়া বিপরীতার্থক শব্দের সমাবেশ জীবনের সুখদুঃখের বিচিত্র তরঙ্গ-হিল্লোলের যে আভাস বয়ে আনে তার নিবিড় রসমাধুরীর তুলনা নেই। Antithesis বা oxymoron জাতীয় অলংকার সাধারণত উচ্চাঙ্গের বাগ্মীতার প্রয়োজনই মেটায় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। বর্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ জাতীয় অলংকারের পর্যাপ্ত প্রয়োগ এক অসীম সৌন্দর্যরসের সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে ব্যবহৃত অনুপ্রাসের অতিসূক্ষ্ম রণন এক অভাবনীয় সৌন্দর্যজাল রচনা করেছে। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এই পংক্তিগুলিতে সার্থকতার চরম সীমায় পৌঁছেছে। কাব্যের ব্যঞ্জনাশক্তি কোন কবির হাতেই আর এর চেয়ে বেশী দূর যেতে পারেনা। অতলস্পর্শ, অসীম বৈভবময় কল্পনানুভূতির এই বিহ্বল-করা natural magic-এ রূপান্তরণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও এক আশ্চর্য কীর্তি।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই পংক্তিগুলির ভাবলোকের মধ্যে এক সূক্ষ্ম অনুভূতি-মিশ্রণের ছোঁয়া। কবির জীবন-ইতিহাসের যে সব বেদনা-অনুভূতি 'বাঁশি'র যাদুস্পর্শে বিচিত্র সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের স্মরণের মধ্যে এক নিবিড় তৃপ্তির সঙ্গে মিশে আছে এই সুদীর্ঘ ধারার আসন্ন অবসানের বিষাদ-চেতনা। 'এই সব অপূর্ব অলৌকিক সৃষ্টি এতদিন আমরা দুজনে করেছি; কিন্তু আর এর পুনরাবৃত্তি হবে না।'

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে॥

—জীবনানুভূতির বিচিত্র উপাদান থেকে এই সব আভাসোজ্জ্বল রূপমালা সৃষ্টি করা ছাড়াও 'বাঁশি'র আর একটি কাজ ছিল; কবির অবচেতনার গভীরতম স্তরে যে সব অনুভূতি-আভাস প্রচ্ছন্ন থাকতো তাদেরও সে নিঃশব্দসঞ্চারে তাঁর গানের আবেদনে ব্যঞ্জিত করেছে। এর সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন mood-এ লেখা এই পংক্তিগুলির—

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে॥
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥ (গীতবিতান, পৃ ৩৮৮)

সময় যে তার হল গত নিশিশেষের তারার মতো,—
তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ-সাথে।

এই তিনটি অপূর্ব সুন্দর পংক্তির সম্পূর্ণ অর্থাভাসকে পরিস্ফুট করা মোটেই সহজ নয়। এর image-দুটির সঙ্গে মূল ভাবটির যোগসূত্রটি ঠিক কি? মূল ভাবটি এই যে বাঁশির সঙ্গের বিচ্ছেদের দিন আসন্ন; জীবনানুভূতির সূত্র দিয়ে শিল্পমালা রচনার পালা শেষ হয়ে এল। 'তবে আর কেন? এখানেই সমাপ্তির রেখা টেনে দাও।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কাব্যরচনা শেষ হয়ে আসার সঙ্গে বিশেষভাবে নিশিশেষের মিলিয়ে-আসা তারার এবং ভোরের আলোয় ঝরে-পড়া শিউলিফুলের তুলনা কেন?

এই প্রসঙ্গে প্রথম পংক্তিটির সম্বন্ধেও একই ধরণের প্রশ্ন জাগে।

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।—

প্রথমত, বাঁশির সঙ্গে বিচ্ছেদের আসন্ন মুহূর্তটিকে—কাব্যসৃষ্টিধারার আসন্ন

অবসান-নিমেষটিকে—রাত্রি-অবসানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে 'শারদ প্রাতে' কেন? অন্তরানুভূতির এই রূপগ্রন্থনার পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে (১) রাত্রি ভোর হওয়ার, (২) শরৎ-প্রভাতের, (৩) নিশিশেষের বিদায়োন্মুখ তারার, ও (৪) শিউলিফুলের মৃত্যুর সাংকেতিক সম্পর্ক কী?

রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যক্ষেত্রের বহু জায়গায় এই জাতীয় কতগুলি image ছড়ানো আছে; গভীরভাবে লক্ষ্য করলে তবেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কবির ভাবব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্ট স্থান ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। আকাশ-পৃথিবীর সূর্যকিরণ-প্লাবিত ও জ্যোৎস্নাস্নাত রূপের মধ্যেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির এবং মানবজীবনের বিচিত্র মহিমার অফুরন্ত পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু নক্ষত্রখচিত তিমির-রাত্রির একটি বিশিষ্ট রহস্যগভীর আবেদন তাঁর কাছে ছিল। রাত্রির তিমিরপট বার বার তাঁর কাছে এক গভীর রহস্যের, এক অজানা মহাবাণীর প্রভাব হয়ে দেখা দিয়েছে; বিশ্বের রহস্য যেন ঐ অন্ধকারের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন। আর সেই অন্ধকারে জেগে-থাকা তারকার অসংখ্য আলোকবিন্দু যেন সেই তিমির-রহস্যের নিগূঢ়-আভাসময় অভিব্যক্তি। তারাগুলি যেন নির্বাক রহস্যমগ্ন অন্ধকারের ভাষা; অন্ধকারের গভীর বাণী তাদের মধ্যে আভাসিত।

তাই এই নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের রূপটি কবির কাছে তাঁর কাব্যের রূপলোকে ক্ষণে-ক্ষণে ফুটে-ওঠা তাঁর অন্তরের রহস্যময় বাণীসত্তার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। "চিত্রা" পর্যায় থেকে অন্তরের অতলে কবি যে রহস্যময় দ্বৈতের উপস্থিতি, যে সৃষ্টি-বেদনার নিবিড় কম্পন, অনুভব করেছেন তার অনুভূতিকে তিনি তাই বার বার ব্যক্ত করেছেন এই নক্ষত্রখচিত তিমির-রজনীর বিচিত্র image-এর ভিতর দিয়ে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাক:

ক. আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি,[1]

খ. আমার দিন ফুরাবে যবে,
যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে॥[2]

১। 'বাণী মোর নাহি,' গী. বি. পৃ ৩৬১ ২। 'তোমার সুরের ধারা,' গী. বি. পৃ ৬

গ. আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে ॥[১]

ঘ সে আছে বলে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।[২]

ঙ. কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা ॥[৩]

চ. আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি' প্রকাশে ॥[৪]

ছ. শরৎ-রাতের খ'সে-পড়া তারাসম
উজ্জ্বলি উঠে প্রাণের আঁধার মম।[৫]

আবার দেখা যায়, শরৎ-প্রাতের শিউলিদলও কবির কাছে বহুক্ষেত্রে অপ্রকাশের অন্তর্বাণীর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে ;

ক, কী-যে গান গাহিতে চাই
বাণী মোর খুঁজে না পাই।[৬]

সে যে ওই শিউলিতলে ছড়ালো কাননতলে
সে যে ওই ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥[৭]

খ. সারাবেলা শিউলি বনে আছি মগন আপন মনে,

যে সৌন্দর্যকে দেখে কবি কয়েক পংক্তি পরেই বলছেন—
আমি যা বলিতে চাই হল বলা

১ গী. বি. পৃ ২৮
২ 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই,' গী. বি. পৃ ২১৫
৩ 'জানি গো দিন যাবে,' গী. বি. পৃ ২৩৩
৪ গী. বি. পৃ ৩৩
৫ "লেখন"
৬ 'হৃদয়ে, ছিলে জেগে গী. বি. পৃ ৪৮৯
৭ 'তোমার নাম জানিনে গী, বি, পৃ ৪৯১)

গ. আমার শরৎরাতের শেফালিবন সৌরভেতে মাতে যখন
তখন পাল্‌টা সে তান লাগে তব শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়।[১]

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় রাতের তারা আর ভোরের শেফালির মধ্যে একটি স্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে; দুটিই সাধারণভাবে অব্যক্তের ব্যঞ্জনা, অপ্রকাশিতের রূপাভাস, অন্তর্বাণীর অভিব্যক্তির প্রতীক হিসাবে কল্পিত হয়েছে। রবীন্দ্রমানস এদের মধ্যে আর একটি অপূর্ব যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে। তারার মত শেফালিও শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরের মধ্যে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়। আবার ক্ষীণ আলো যেমন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়, শেফালির অপূর্ব সৌরভ তেমনি নক্ষত্র-আলোকিত তিমিরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাছাড়া, যে ভোরের আলোয় নক্ষত্রের আলোকলীলার অবসান, শেফালিরও জীবনের শেষ সেখানেই। রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দলে দলে ঝরে পড়ে। নিচের image-গুলিতে রহস্যময় কবি-অন্তরের শিল্প-অভিব্যক্তির সঙ্গে একদিকে নিশীথের নক্ষত্রমালার এবং অন্যদিকে শরৎরাতের শেফালির গভীর সংযোগ ধরা পড়বে—

ক. ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে—
তারাহারা রাত্রির বীণার
চরম ঝংকার।[২]

খ. ওলো শেফালি, ওলো শেফালি,
আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি॥
তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতার থরে থরে আখর রুপালি॥[৩]

গ. আমি তব সাথি,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা—[৪]

১ 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া' গীতবিতান পৃ ১৪৩ ২ 'শেষ', "পূরবী"
৩ গীতবিতান পৃ ৪৯০ ৪ 'যাত্রা,' "পূরবী"

ঘ. শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল ॥
রাতের বায় কোন্ মায়ায় আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল ॥[১]

ঙ. শেফালি কহিল, 'আমি ঝরিলাম তারা' !
তারা কহে, 'আমারো তো হল কাজ সারা—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি।'[২]

শেষের দৃষ্টান্তটি সুদূর "কণিকা" পর্যায় থেকে নেওয়া। রবীন্দ্রমানসে যে এই ভাবসংযোগটি বহুদিন ধরে খেলা করে আসছে তার অভ্রান্ত প্রমাণ।

এখন বোধ হয় আমরা "আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে" গানটিতে উল্লিখিত image-গুলির গ্রন্থনার সামাগ্রিক তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের চিরদিনই প্রথম প্রত্যূষে, ভোর হওয়ার অনেক আগেই, উঠে পড়ার অভ্যাস ছিল। বার্ধক্যকালে কোনো এক শরৎপ্রত্যূষে কবি বাইরের আকাশ-পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। দেখলেন, আকাশে অন্ধকারের বুকে উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা, আর পৃথিবার বনাঙ্গনে শুভ্র শেফালির দল নিঃশব্দে ফুটে আছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার ক্ষীণ হয়ে এল, তারাগুলি ম্লান হয়ে আসতে লাগলো, শিউলিগুলি ঝরে পড়তে লাগলো। কবির মনে জেগে উঠলো এক অস্ফুট বেদনা। অন্ধকারের তারার মত, রাতের শিউলির মত, তাঁর শিল্পরচনাও তো এক অন্ধকার অজানার অভিব্যক্তি। কিন্তু কবির জীবনকাল শেষ হয়ে আসছে; তাঁর যে স্পর্শ-কাতর সত্তা থেকে এই সব অনুভূতি-কম্পন উদ্ভূত, সেই সত্তাই, সেই pleasing anxious being-ই রাত্রির রহস্য-অন্ধকারের মত জগৎ থেকে মিলিয়ে যাবে। অপসৃয়মান অন্ধকারে নক্ষত্রের দীপলীলার অবসানের মত মরণ-সম্মুখীন ক্ষীণায়মান চেতনায় কবির সৃষ্টিলীলারও অবসান আসন্ন। 'বাঁশি'কে যদি ত্যাগ করতেই হয় তবে আর তাকে বৃথা ধরে রাখার চেষ্টা কেন? এই নিশিশেষের তারার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, এই পেলব শিউলিদলের মরণের সাথে সাথে তাঁরও এ-জীবনের রূপসৃষ্টির পালা শেষ হয়ে যাক্।

১ গীতবিতান পৃ ৪৮৪ ২ 'এক পরিণাম,' "কণিকা"

ঘ. 'আলো-অন্ধকারের তীরে'

(৭)

হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে ॥

এই যে আলোর আকুলতা এতো জানি আমার কথা—
ফিরে এসে আমার প্রাণে আমারে উদাসে ॥

*   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *   *
*   *   *   *

("গীতবিতান" পৃ ৯৩)

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মহত্তম মিস্টিক রচনাগুলির অন্যতম। অনুভূতির তীব্রতায় কবিতাটি যেন দীপ্তপ্রাণের উচ্ছ্বসিত বেদনানির্ঝর। আকস্মিক উপলব্ধির এই বিপুল জোয়ার মুহূর্তে পাঠকের মনকে তার নিদারুণ স্রোতাবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অথচ, পরম আশ্চর্যের বিষয়, এই হৃদয়-মথিত-করা অনুভূতিটি অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্যের বাঁধনে বন্দী হয়েছে; কোথাও এতটুকু বাহুল্যের ছাপ নেই। ভাবটির সূক্ষ্ম বিবর্তন এবং পরমাশ্চর্য পরিণতি সংঘটিত হয়েছে হেলায়। তেমনিই বিস্ময়কর ব্যাকুল পার্থিব প্রেমের image-এর মধ্য দিয়ে এই আলৌকিক উপলব্ধিটির মধুর মানবীয়করণ।

॥ কোনো এক আলোক-হিল্লোলিত দিনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে কবি বহুদূরে অবাধ দৃষ্টি মেলে আছেন। মন সেই বিপুল আলোকোজ্জ্বল সুনীল অবকাশের মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনি হতে হতে হঠাৎ জেগে উঠল এক বিপুল উপলব্ধির তরঙ্গ। কবি হঠাৎ অনুভব করলেন যে তাঁর হৃদয়, তাঁর চেতনা, যেন আর তাঁর মধ্যে আবদ্ধ নেই; তাঁর দেহের সীমাকে, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের পরিধিকে লঙ্ঘন করে তাঁর প্রাণচেতনা যেন সেই উজ্জ্বল আলোকপ্লাবিত মহাকাশের অসীম পরিসরে ব্যাপ্ত হয়েছে। সেই অলৌকিক মুক্তির মুহূর্তে কবির মনে হয়, স্থান-কাল-সীমিত দৈন্যলাঞ্ছিত প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে যে আত্মপ্রসারণের ব্যাকুলতা—বিশ্বের অসীমে আপনাকে নিঃশেষে ছড়িয়ে দেবার যে নিবিড় বাসনা—জেগে ওঠে, তারই ব্যাকুল সুরের প্লাবন আকাশের ঐ আলোক-পারাবারে। কবি যেন নিবিড়ভাবে

অনুভব করেন, মহাকাশের বুক থেকে ভেসে-আসা আলোকরশ্মিগুলি যেন তাঁরই চেতনানিঃসৃত, তারা যেন তাঁরই সুরকে প্রতিফলিত ক'রে আবার তাঁরই অন্তরে ফিরিয়ে আনছে— এমনই গভীর একাত্মতা একটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের চেতনাশিখা এবং সৃষ্টি-পরিপ্লাবী আলোকধারার মধ্যে।

দ্বিতীয় স্তবকের পংক্তিগুলির মধ্যে—

বাইরে তুমি নানা বেশে ফের নানা ছলে ;
জানি নে তো আমার মালা দিয়েছি কার গলে।
আজকে দেখি পরান-মাঝে, তোমার গলায় সব মালা যে—
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে ॥

—এই বিশ্বচেতনার অগ্ন্যুচ্ছাসের ভিতরে আশ্চর্যভাবে জেগে উঠেছে এক ব্যাকুল অন্তরঙ্গ সম্ভাষণের সুর—অতীন্দ্রিয়ের সেই অপরূপ হৃদয়রাগে অভিষেক, যাতে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই অদ্বিতীয়। তাঁর ক্ষুদ্র চেতনা যার এক ছিন্ন তান মাত্র, সেই বিশ্বচেতনার যিনি উৎস, কবি আজ তাঁর এক গভীরতর পরিচয় পান। তিনি আজ বোঝেন, অসংখ্য মনোহর চেতন ও অচেতন রূপে এই আলোকভাণ্ডারীই চিরদিন বিচিত্র ছদ্মবেশে কবির মুগ্ধ প্রাণের পূজা আহরণ করেছেন। কত নারীকে অর্পিত প্রেমাঞ্জলিতে, প্রকৃতির কত বিচিত্র রূপের বিহ্বল অনুভূতিতে, কত মহৎ কর্মাদর্শের অনুসরণে কবি আপনার হৃদয়ের আলোকমাধুরী অজস্রধারে বিলিয়ে দিয়েছেন, অথচ কখনও ভেবে পাননি তাঁর বহুমুখী আত্মনিবেদনের ধারা কোথাও কোনো সুদূর মহাসমুদ্রে গিয়ে মিলেছে কিনা।[১] আজ আকাশ-হৃদয়ের এই আকস্মিক আলোক-মিলনের দীপ্তিতে তিনি দেখছেন— জীবনের বহুবিচিত্র পাত্রে অর্পিত অসংখ্য প্রেমাঞ্জলির সেই ছিন্ন ফুলগুলি যেন কোন মন্ত্রবলে একটিমাত্র বরণমালায় গাঁথা হয়ে স্থান পেয়েছে সেই আলোকময় মহাপ্রেমিকের কণ্ঠে। এতদিন অগণিত ছদ্মবেশে তিনি কবির প্রাণের অজস্র প্রেমোপহার সংগ্রহ করেছেন। এতদিন পরে সব-কিছু আত্মসাৎ করে তিনি আজ চরম গ্রহীতার রূপে নিঃস্ব কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। ॥

১ এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ Gitanjali-র ভূমিকায় কবি ইয়েটস্-এর উক্তি : We had not known that we loved God, hardly it may be that we believed in Him ; yet looking backward upon our life we discover in our exploration of the pathways of woods, in our delight in the lonely places of hills, in that mysterious claim that we have made unavailingly, on the women that we have loved, the emotion that created this insidious sweetness.

(৮)

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে ॥
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে—
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে ॥
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।

* * * * * *
* * * *

("গীতবিতান", পৃ ৩৮১)

কবির গভীরতম জীবনচেতনার কয়েকটি মুহূর্ত এক শান্ত-করুণ মাধুরীর শিল্পমালায় গাঁথা হয়েছে এই ক্ষীণকায় কবিতাটিতে। এই জাতীয় নিবিড় অতীন্দ্রিয় স্পর্শের আকস্মিক অনুভূতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে কবির আরো অনেক গানে। কিন্তু এই গানের অনুভূতিটির বাঁধন অনেক সূক্ষ্মতর; সূক্ষ্মকম্পন আলোর মতই শক্তিময় ও মর্মভেদী। দ্বিতীয়তঃ, এর শিল্পরূপটিও অতিসূক্ষ্ম সূত্র-রাজির মায়াময় বুননে রচিত।

।। কবির অন্তর বেদনা-বিহ্বল। দুঃখের তিমিরে তাঁর দৃষ্টি বিলুপ্ত। আত্মহারা বেদনার অন্ধকার সাগরপারে বোধদৃষ্টির চন্দ্রোদয়ের কোনই আভাস নেই। ঠিক এই দৃষ্টিহারা বেদনার মুহূর্তেই তাঁর চির-অজানা পরমসখা অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এই আত্মহারা তিমিরে অন্তর তাকে দেখতে পায়নি। শুধু সেই নিবিড় উপস্থিতির অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ কবির বেদনার্ত হৃদয়ের গানে বার-বার ঝলক দিয়ে উঠেছিল; হৃদয়ের দুঃখঝংকৃত তারে যেন ক্ষণে ক্ষণে কোন অদৃশ্য আঙুলের অপরূপ স্পর্শ বেজে উঠেছিল। শুধু এই মৃদু-মধুর বিস্ময়ের আভাসটুকু জড়িয়ে ছিল ক্ষুব্ধ চেতনার অন্ধকারে।

চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে কবির অন্তরে তার নিঃশব্দ উপস্থিতির অমৃতস্পর্শ রেখে দূরের বন্ধু কখন চলে গেছে। তার পরে ধীরে ধীরে বেদনার তিমির ক্ষীণ হয়ে এসেছে; মাঝরাতে-ওঠা চাঁদের আলোর মতন অন্তরের শান্তদৃষ্টি ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে। সেই স্নিগ্ধ আলোয় দেখা গেল, বেদনার গ্রাসমুক্ত অন্তরের কেন্দ্রে জেগে উঠেছে এক অপূর্ব শান্তির উৎস, এক পরম ঐশ্বর্যের জ্যোতি — অন্ধকারে অলক্ষিত অজানার নীরব প্রেমোপহার—

তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে ॥ ॥

একটি অপূর্ব রূপকচিত্রের ভিতর দিয়ে অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে গভীরতম চেতনার এই আলোছায়াময় বেদনালীলাটি। মৃদু-মন্থর ছন্দ-গতিটির মধ্যেই সমস্ত mood-টির মর্মকথা আভাসিত। ছন্দরচনার এই অতুলনীয়মাধুরী কবিপ্রতিভার চরম পরিণতির পরিচায়ক। নিবিড় অনুভূতিময় এই কবিতাটির মিতভাষিতাও চরম শিল্পসৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে।

দুটি স্তবকের ভিতর দিয়ে সমস্ত অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতাটির পরিপূর্ণ বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথম স্তবকে আছে দিশাহারা অন্ধকারে অজানার প্রেমস্পর্শের অস্ফুট শিহরণ। দ্বিতীয় অংশে আছে পুনরালোকিত অন্তরে অভাবিত ঐশ্বর্যের আবিষ্কার। সমস্ত রূপায়ণটি সংঘটিত হয়েছে একান্ত সহজ ভঙ্গীতে।

শব্দের এক সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়। 'অন্ধকারে' এবং 'সিন্ধুপারে'র অনুপ্রাসটি যেন এক বিপুল-প্রসারী বেদনার্ত অন্ধকারের আভাস দেয়। তা ছাড়া, প্রথম স্তবকে ন-কারের স্নিগ্ধ প্রয়োগ আর্ত অন্তরে অলক্ষিত সুরের করুণ গুঞ্জনের আভাস জাগায়; আবার, দ্বিতীয় স্তবকে—যেখানে হৃদয়ে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের পুনরাবির্ভাব, সেখানে— ল-কারের কোমল মাধুরী।

ঙ. পরম বিরহ

(১)

নিশা-অবসানে কে দিল গোপনে আনি
তোমার বিরহ-বেদনা-মানিকখানি ॥
সে ব্যথার দান রাখিব পরানমাঝে—
হারায় না যেন জটিল দিনের কাজে,
বুকে দোলে যেন সকল ভাবনা হানি ॥
চিরদুখ মম চিরসম্পদ হবে,
চরম পূজায় হবে সার্থক কবে।

* * *
* * *
* * *

("গীতবিতান" পৃ ৬২)

পরম বিরহের এই নিবিড় বেদনা-আবেগ যেন এক উচ্ছ্বসিত নির্ঝরের মত। পর্বতবেষ্টিত সমুদ্রের একটি বিপুল ঢেউ যেন তীব্রবেগে দুলে উঠে তার উচ্ছ্বসিত মুকুটটি এক মুহূর্তের জন্য তুলে ধরেই শান্ততর গতিতে নেমে এসে ধীরে ধীরে বেলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বপ্রাণ-বিরহের এই দীপ্ত অগ্নিময় রূপটি রবীন্দ্রনাথের মাঝবয়সের অন্তরাবস্থা এবং শিল্পরীতির পরিচায়ক; তাঁর পরবর্তী কালের রচনায় বেদনার এই জ্বলন্ত তীব্রতা আর পাওয়া যায় না। এই জাতীয় mood-এর প্রকাশ "গীতাঞ্জলি" পর্যায়ের অনেক রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই কবিতার অভিজ্ঞতাটি মহৎ বেদনার একটি তীব্র আলোকবিন্দুতে আশ্চর্যভাবে সংহত হয়েছে। এর শিল্পরূপও তাই অনবদ্য। এর ছন্দোবেগ যেন মনকে তড়িতাহত করে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এখানে অধ্যাত্মচেতনার সেই আশ্চর্য humanization নেই। এখানে অভিজ্ঞতাটির ব্যথিত তীব্রতাই ছন্দের দোলা এবং শব্দগুলির সরল অনিবার্যতার ভিতর দিয়ে মনকে নিদারুণভাবে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পক্রিয়ার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। এখানে বিশেষভাবে মানবধর্মী কোন image ব্যবহার না করেও কবি তাঁর এই mystic চেতনাকে এমন এক অগ্নিময় শিল্পরূপ দিয়েছেন যার বিদ্যুৎসঞ্চারী আবেদন অবিশ্বাসী পাঠককেও সাময়িকভাবে অভিভূত করে।

"গীতাঞ্জলি"র একই ভাববাহী 'যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে' কবিতাটির সঙ্গে তুলনা করলেই এই কবিতাটির সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'নিশা-অবসানে কে দিল·········মানিকখানি' : প্রত্যুষের উজ্জ্বল রূপটি যেন স্পর্শমণি; তার স্পর্শমাত্র কবির অন্তরের গভীরতম বেদনাটি সুপ্তি ছেড়ে উঠল। আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই বিরহচেতনাটি কবির অন্তরের পরম ঐশ্বর্য। বার বার হারিয়ে-যাওয়া সেই রত্ন আজ সকালে আবার ফিরে এসেছে কবির অন্তরে।

'চিরদুখ মম চিরসম্পদ হবে' : চারটি সাধারণ কথার সরল গ্রন্থনে সৃষ্ট এই পংক্তিটি এই কবিতার বেদনা-তরঙ্গটির শীর্ষ। এর অত্যাশ্চর্য আবেদনের তুলনা রবীন্দ্রকাব্যেও কম।

৮ম পংক্তি : 'স্বপনগহন নিবিড় তিমিরতলে' : জীবনের স্বপ্নমায়া-বিজড়িত অন্ধকার।

৯ম পংক্তি : 'বিহ্বল রাতে সে যেন গোপনে জ্বলে' : রাত্রি দুঃখকাতর বা

সুখোচ্ছেল যাই হোক, তার মধ্যে সেই গভীর বিরহচেতনাটি যেন অনির্বাণ দীপশিখার মত জেগে থাকে।

১০ম পংক্তি: 'সেই তো নীরব তব আহ্বানবাণী': অন্তরের বিরহ-কাতরতার সুরটিই সেই সুদূর প্রেমিকের আহ্বানের সংকেত।

চ. ক্ষণিক ঐকতান

(১০)

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার মোর করুণ রঙিন পথ!
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর দুয়ারে লেগেছে রথ॥
সে যে সাগরপারের বাণী মোর পরানে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্যপর্বত॥
দুঃখসুখের এ পারে, ও পারে, দোলায় আমার মন—
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে ভরে যায় দু'নয়ন।

* * * *

* * * *

("গীতবিতান" পৃ ২২৮)

এই গানটিতে রবীন্দ্রমানসের একটি অপেক্ষাকৃত দুর্লভ mood এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যমূর্তিতে সংগৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে গভীর আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কবিতা—অলৌকিক বিশ্বপ্রাণ-চেতনার মর্মস্পর্শী শিল্পরূপ—অনেক আছে। এখানে পাওয়া যায় একটি হঠাৎ-জেগে-ওঠা মিস্টিক চেতনার আনন্দময় অথচ ক্ষণিকতার-বেদনায়-বিজড়িত মধুর মানবীয় রূপ। অন্তরের দীপ্ত ঐকতানের মধ্যেও নিমেষটির অনিবার্য ক্ষণিকতার এই বিষাদচেতনা কবির এই গভীর অভিজ্ঞতাটিকে আমাদের সুখদুঃখস্পন্দিত হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এনে দেয়।

॥ জীবনে এমন এক-একটি মুহূর্ত আসে যখন জগতের মহাবৈষম্যময় বৈচিত্র্য যেন হঠাৎ একটি মধুর-গম্ভীর আনন্দের ঐকতানে বেজে ওঠে, যখন অন্তরের কোন এক অনির্দেশ্য পুনরভিযোজনের ফলে সমস্ত দুঃখ-বেদনা-ব্যর্থতার বেসুর যেন হঠাৎ তার সমস্ত কর্কশতা হারিয়ে একটি স্নিগ্ধমধুর সুরনির্ঝরে গলে মিশে

যায়। মনে হয়, জীবনের সমস্ত রহস্যের উৎস যে বিশ্বজীবনপথের চিরপলাতক মহাপথিক— যার চেতন এবং অচেতন অন্বেষণে জীবনের দিন কেটে গেছে—সেই যেন আজ হঠাৎ একেবারে হৃদয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। তুচ্ছ সুখদুঃখের বাঁধনে বাঁধা অন্তর তাই আজ বিপুল বিশ্বসাগরের বাণীতে প্লাবিত। মনে হয়, সমস্ত সৃষ্টি যেন সেই বিশ্বপথিকের চোখের শান্ত-গভীর চাওয়া; সেই আকাশ-ছাওয়া দৃষ্টির মহাপটে অরণ্য পর্বত সবই যেন জীবন্ত, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে মধুর সংগীত বিকীরণ করে। কিন্তু এই বিশ্ব-ঐকতানের আনন্দপ্লাবনের মধ্যেও কবির চোখ জলে ভরে ওঠে। এই অশ্রুর কারণ কিছুটা আনন্দের অলৌকিক আতিশয্য, আর কিছুটা এই পরম অভিজ্ঞতাটির অনিবার্য ক্ষণিকতার ব্যথিত চেতনা। কবি জানেন এই ঐকতানের মুহূর্তটি রামধনুর রঙীন মায়ার মতই ক্ষণিক। যে জীবনপথ আজ করুণা করে সেই বিশ্বপথিকের রথটিকে নিমেষের জন্য কবির হৃদয়-দ্বারে এনে দিয়েছে, সে-ই আবার একটু পরেই তাকে কোন সুদূরে টেনে নিয়ে যাবে। ক্ষণমধুর ঐকতান আবার ভেঙে পড়বে ছিন্ন বেসুরে। ॥

প্রথমাংশের image-গুলির সুগভীর মানবধর্মিতা লক্ষণীয়। সমস্ত ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে ক্ষণিক বন্ধুমিলনের একটিমাত্র image-মালার ভিতর দিয়ে। হারানো বন্ধুকে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে পেলে জীবন এক মুহূর্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, অথচ সেই প্রাণপ্রিয়ের আসন্ন বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় সেই গভীর সুখের মধ্যেও মন ব্যথিত হয়ে ওঠে — এই আকস্মিক উপলব্ধির মুহূর্তে কবির মনের অবস্থা তেমনই।

'পথ'কে সম্বোধন পরিণত রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। এই প্রসঙ্গে পাঠক "পূরবী"র 'পথ' কবিতাটি এবং "লিপিকা"র প্রথম রচনাটি স্মরণ করতে পারেন।

'তার আঁখির তারায়······পর্বত'— এই চমকপ্রদ কল্পনা-চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের মহত্তম image-গুলির অন্যতম।

শেষের এই দুটি পংক্তির মধ্যে ধ্বনিত—

ওগো নিদারুণ পথ, জানি পুন নিয়ে যাবে টানি
তারে—চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া যাবে সে স্বপনবৎ ॥

—গভীর করুণতার সুরটি সমস্ত mood-টিকে আমাদের সাধারণ জীবন-অভিজ্ঞতার বেদনার্ত কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেয়। যে পথকে করুণ রঙিন মনে হয়েছিল সে-ই

এখন নিদারুণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির মিস্টিক্‌-চেতনার নিবিড় মানবীয়করণের আর একটি মনোরম দৃষ্টান্ত।

ছ. সত্যের রসমূর্তি

(১১)

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে॥

*　　　*　　　*

*　　　*　　　*

বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মতো সহজ সুরে　　প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে॥

("গীতবিতান", পৃঃ ১৪০)

ইউরোপীয় মধ্যযুগের সীমান্তে বিপুলকায় প্রহরীর মত দণ্ডায়মান মহাকবি দান্তে তাঁর অমর কাব্যে যে মহাবাণী মানুষকে দিয়ে গেছেন সেই মহৎ ভাবটিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বর্তমান কবিতাটিতে অনবদ্য সৌন্দর্যের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সেখানে[১] আছে :

Nay, 'tis the essence of this blessed state
To dwell within the Will Divine alone,
Whereby our wills with His participate.

*　　　*　　　*

---

১ **Dante: The Divine Comedy: Paradiso, Canto III. Translated by Melville Anderson (World's Classics).** কৌতূহলী পাঠক তুলনার জন্য Cary-র পুরোনো এবং Dorothy Sayers-এর নতুন অনুবাদটিও দেখতে পারেন।

আক্ষরিকভাবে বিচার করলে অবশ্য উদ্ধৃত অংশটির চতুর্থ পংক্তিটির অনুবাদে একটি সুস্পষ্ট ত্রুটি ধরা পড়ে। এখানে eternal কথাটি অতিরিক্ত এবং নিছক ছন্দরক্ষার জন্যই প্রযুক্ত হয়েছে। তবু Paradiso-র এই অংশের এই অনুবাদটিই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

And in His Will is our eternal peace,
And everything is moving to that sea.

—এখানেও সেই একই কথা : বিশ্ব-চলার তালের সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র জীবনের তাল মিলিয়ে নেওয়ার সাধনা। এই Universal Will, Universal Rhythm—একে যে ভাবেই কল্পনা করা হোক—এর সঙ্গে মিলসাধনই শান্তির, আনন্দের একমাত্র পথ।[১] যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হোক, কবির এই মহা-উপলব্ধি অবিসংবাদিত সত্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই পরম সত্যের অনুভূতিটি এক সম্পূর্ণ নতুন কাব্যরূপে নতুন আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এক শুদ্ধ-গভীর মিলন-কামনার মর্মপ্লাবী তরঙ্গে তরঙ্গে। Image-গুলি যেন এক মহান কল্পনার অদৃশ্য চৌম্বকশক্তিতে একের পর এক এসে এক অপূর্ব সম্পূর্ণতায় গ্রথিত হয়েছে। এর ধ্বনি-সমাবেশে কোন চমকপ্রদ ঝংকার নেই, আছে ভাবানুগামী এক শান্ত মধুরতা— নক্ষত্র-আলোকিত ধীরপ্রবাহিনী নদীর মত।

'ধ্রুবপদ' কথাটির অপূর্ব সার্থকতা লক্ষণীয়। এই একটি কথার মধ্যে আভাসিত হয়েছে বিশ্বের বিপুল, বিচিত্র, আমোঘ ছন্দোবিধান।

'মিলাব তাই জীবনগানে' : দ্বিতীয় পংক্তিটির অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ততা অন্তর্নিহিত ভাবটিতে এক গভীর emphasis, একটি গভীর finality-র সুর এনে দিয়েছে।

৩য় ও ৪র্থ পংক্তি :

গগনে তব বিমল নীল, হৃদয়ে লব তাহারি মিল
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে ॥

—নীল রঙ, বিশেষতঃ আকাশের গভীর নীলিমা রবীন্দ্রনাথের অনুভব-দৃষ্টিতে বার বার দেখা দিয়েছে নিবিড় আনন্দঘন শান্তির প্রতীক হয়ে। এই অনুভূতির পরিপূর্ণতম রূপায়ণ হয়েছে "বনবাণী" গ্রন্থের 'নীলমণিলতা' কবিতাটিতে।

---

১ এই প্রসঙ্গে অ্যাণ্ডারসন্ তাঁর Divine Comedy-র অনুবাদে উদ্ধৃত অংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সুন্দর কথাটি বলেছেন সেটি এখানে তুলে দিলাম ;

"...As to meaning, one may ask wherein consists our beautitude if not in bringing desire into harmony with Will or Law that governs the world, with Nature, with the Will of God, however variously man may conceive Him ?"

চতুর্থ পংক্তিতে চারটি 'ন'-এর অনুপ্রাস এক গভীর শান্তির ধ্বনি-প্রবাহ সৃষ্টি করেছে।

সমস্ত কবিতাটির ভাবঘন সংক্ষিপ্ততা এক নিখুঁত ক্লাসিক পরিণতিতে উত্তীর্ণ। ভাবের দিক দিয়েও কবিতাটি অনেকটাই ক্লাসিক-ধর্মী ; এর মূল ভাব বিশ্বচ্ছন্দের সঙ্গে গভীর একানুভূতি। রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের হাতের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

(১২)

শেষের মধ্যে অশেষ আছে, এই কথাটি মনে
আজকে আমার গানের শেষে জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।
সুর গিয়েছে থেমে, তবু থামতে যেন চায়না কভু—
নীরবতায় বাজছে বীণা বিনা প্রয়োজনে।
তারে যখন আঘাত লাগে, বাজে যখন সুরে
সবার চেয়ে বড়ো যে গান সে রয় বহুদূরে—
সকল আলাপ গেলে থেমে শান্ত বীণায় আসে নেমে
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে বাজে গভীর স্বনে।

("গীতাঞ্জলি")

বর্তমান আলোচনা-পর্যায়ের এই একটিমাত্র কবিতারই বোধহয় সুর নেই ; কিন্তু অন্য যে-কোন কবিতার মতই এটিও গীতধর্মী ; ভাবে ও প্রকাশরূপে একটি পরিপূর্ণ লিরিক। এই অংশের অন্যান্য কবিতাগুলির মত এখানেও সভ্যতা-সংস্কৃত আত্মদর্শী মানুষের অভিজ্ঞতালোকের একটি গভীর সত্যানুভূতি এক সুন্দর কাব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এবং মধ্যে কোন উত্তেজনার কম্পন, কোন ব্যাকুলতার দোলা নেই ; আছে একটি গভীর উপলব্ধির অচঞ্চল শান্তি। নিরলংকার প্রকাশরূপটির মধ্যেও তাই পাওয়া যায় একটি শান্ত চিন্তামগ্নতার সুর। স্বল্প পরিসরের ভিতর মহৎ ভাবটি নিখুঁতভাবে বিবর্তিত হয়ে সমাপ্তির সুন্দর image-টির ভিতর পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব বস্তু বা ঘটনার প্রভাব লক্ষিত হয় যেগুলি অল্প ক্ষণের জন্য আবির্ভূত হয়ে মনকে কয়েক নিমেষের জন্য গভীরভাবে স্পর্শ ক'রে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ; কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে তাদের

বিলুপ্তির সঙ্গেই তাদের প্রকৃত অস্তিত্বের শেষ নয়। তাদের ক্ষণিক বহির্জীবনের শেষে তারা মানুষের অন্তর্জগতে, সৃষ্টির ভাবলোকে, তাদের সাময়িক প্রভাবের যে গভীর রেশ রেখে যায় তার মধ্যেই তাদের অমরতা। তাদের শেষের মধ্যে তাই থাকে অশেষের সূচনা।

শুধু তাই নয়, তাদের প্রভাব ঐ নিমেষের স্থূল অস্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; মানব-অন্তরে তাদের ঐ ক্ষণিক খণ্ডিত আবেদনের পূর্ণায়িত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই তাদের বৃহত্তর সার্থকতা। গান যখন গাওয়া হয় তখন তার এক-একটি কলি, এক-একটি সুরের লহরী একে একে, ধীরে ধীরে, মনকে নাড়া দিতে থাকে। যখন যে অংশটুকু কানে আসে তখন সেইটুকুই সাময়িকভাবে চরম হয়ে উঠে মনকে অধিকার করে থাকে। কিন্তু গাওয়া যখন শেষ হয়ে যায়, একমাত্র তখনই (গায়কের বা শ্রোতার) অন্তরের সেই প্রতিধ্বনিময় স্তব্ধতার মধ্যে গানের সমস্ত কথাগুলি, সুরের সমস্ত রেশগুলি চেতনার গভীর কেন্দ্রে একটি organic unity-তে মিলিত হয়ে একটি অখণ্ড উপলব্ধিতে, এক পরিপূর্ণ আবেদনের সৌন্দর্যজালে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দিনের অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্যের মধ্যে অসংখ্য ঘটনা, চিন্তা, অনুভূতি বিচ্ছিন্নভাবে চেতনাতে আঘাত করে। কিন্তু দিনের সেই সংকটময় মিশ্র কোলাহল যখন সন্ধ্যার স্তব্ধতায় মিলিয়ে আসে তখনই আমাদের শান্ত মুক্ত মনে দীর্ঘ দিনটির অসংখ্য বৈচিত্র্য ও অসংগতির সমাবেশে রচিত সমস্ত সুরটি বেজে ওঠে। ॥

শেলি-র Music when soft voices die[১] দিয়ে সুরু অনবদ্য লিরিকটির সঙ্গে এই কবিতাটির ভাবৈক্য গভীর। শেলির কবিতাটি মূলতঃ আবেগময়; রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি চিন্তানিমগ্ন। শেলির উদ্বেলিত আবেগময় কল্পনায় ভেসে এসেছে একটির পর একটি অপরূপ image; রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শান্ত উপলব্ধির ওয়ার্ডস্ওয়ার্থীয় সুরটি একটিমাত্র মূল image-কে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করেছে। শেলির কবিতাটির চমকপ্রদ প্রকাশ-ঔজ্জ্বল্য এবং রূপ-বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে নেই। এখানে ভাব গভীরভাবে অন্তর্মুখী, ছন্দ শান্তগতি এবং ভাষা একান্ত সরল। শেষের অপূর্ব image-টি কবিতাটিকে এনে দিয়েছে এক সুগভীর সমাপ্তির সুর।

'সবার চেয়ে বড়ো যে গান সে রয় বহুদূরে'—এই অংশটি একটু তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত এবং prosaic। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, পরের সুন্দর পংক্তিগুলি এই ত্রুটিটিকে আর বিস্তার লাভ করতে দেয়নি।

১ এই কবিতাটি ২৭ ও ২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত আছে।

জ. ঋতুর তরঙ্গলীলা

(১৩)

পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না।
পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী॥

এই শান্ত-উত্তেজনাময় কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনেক রচনার মত বাদলের উদ্দাম ঘনঘটার বিবরণ নেই। এতে আছে বর্ষার একটি বিপুল ঢেউয়ের আসন্ন আবির্ভাবের প্রত্যাশায় পুলক-ব্যাকুল কবি-মনের একটি অপূর্ব চিত্র। এ দেশের বর্ষাঋতুর রূপ রবীন্দ্রনাথকে কী আশ্চর্যভাবে অভিভূত করতো তা আমরা জানি। সেই প্রভাবের গভীরতম অভিব্যক্তি এই কবিতাটিতে। গীতিকবিতাটির রস যে এর অপরূপ সুরের সংযোগে নিবিড়তর সৌন্দর্যে বাঞ্ছিত হয়ে ওঠে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। তা সত্ত্বেও এর নিছক কাব্যরূপটিও আশ্চর্য সুন্দর।

॥ নববর্ষার একটি বিপুল তরঙ্গের আগমনের বার্তা নিয়ে এল সজল পুব-হাওয়া। বাঞ্ছিতের আসন্ন আবির্ভাবের বার্তাবাহী সংকেতলিপির মত এই অশান্ত হাওয়া কবির উচ্চকিত হৃদয়ে এক মধুর উত্তেজনার দোলা লাগায়। এই দোলায় কবির মিলনোন্মুখ হৃদয় পূর্ণবক্ষ তটিনীর মত বার বার তরঙ্গোচ্ছল হয়ে ওঠে। এই প্রতীক্ষার নিবিড়তা কবির আর সব প্রয়োজনকে ঢেকে ফেলে; তিনি আর সব কিছু ভুলে সেই একটিমাত্র প্রত্যাশায় বিভোর হয়ে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর মিলনপিপাসাকে নিবিড়তর করে পূর্ব দিগন্তে মাথা তোলে প্রেমিকের নৌকার পালের মত নীলাঞ্জন মেঘের রসঘন পুঞ্জ।

এই বহুপ্রত্যাশিত সুরের তরীর আবির্ভাবে কবির হৃদয়ের সেই পুলক-বেদনা নিবিড়তর উচ্ছ্বাসে জেগে উঠে তাঁর সমস্ত চেতনাকে প্লাবিত করে ফেলে। আসন্ন মিলনের ঘনায়মান মোহে আচ্ছন্ন কবির মন যেন নিদ্রা ও জাগরণের ছায়া-সীমান্তে দোদুল্যমান। কিন্তু মিলনসুখের এই তো সুরু। এর পরে ঘনিয়ে আসবে অন্ধকার।

তার মধ্যে সুরু হবে সেই দূরাগত প্রিয়ের বিচিত্র সুর-সম্ভাষণ। সেই আকাশভরা সুরধারার প্লাবনে কবিরও হৃদয়ে জেগে উঠবে সুরের জোয়ার, খুলে যাবে গানের উৎস। দুই প্রেমিকের মিলিত সঙ্গীতের রসপ্লাবনে অভিসার-রজনী ভরে উঠবে। ॥

বর্তমান কবিতাটি সেই পরমাশ্চর্য কবিতাগুলির অন্যতম যেগুলির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-চিত্রণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোন কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে এই নিবিড় একাত্মতা, রূপবিভোরতার সঙ্গে মিস্টিক চেতনার এই আশ্চর্য সহজ মিলন এবং সমস্ত অভিজ্ঞতাটির একটি নিবিড় প্রেমানুভূতির সুমধুর রূপে প্রকাশ এক মহৎ কবি-প্রতিভার চরম পরিচয় বহন করে। Imagery-র সুকোমল আভাসময়তায়, নিখুঁত শব্দসমাবেশে, উপকরণের আশ্চর্য সরলতায় এবং প্রকাশের শান্ত সংক্ষিপ্ততায় কবিতাটি সৌন্দর্যের চরম পর্যায়ে উন্নীত।

(১৪)

তোমার নাম জানি নে, সুর জানি।
তুমি শরৎ-প্রাতের আলোর বাণী ॥
সারাবেলা শিউলিবনে আছি মগন আপনমনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি ॥

* * *

* * *

* * * *

* * * *

("গীতবিতান" পৃ ৪৯১)

এক গভীর তত্ত্বের অনুভূতি-আভাস দিয়ে কবিতাটির সুরু। শরৎ-প্রাতের আলোছায়ায়-বোনা আঙিনা থেকে যে সৌন্দর্যের ঢেউ এসে লাগছে কবির স্পর্শ-কাতর চেতনায়, কবি জানেন না তার প্রকৃতি, তার মৌলিক রহস্য কী। তিনি শুধু চেনেন তার অনির্বচনীয় আবেদনের সুরটিকে, চেতনার অভ্যন্তরে তার বিশেষ স্পন্দন, তার unique vibration-টিকে। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রায় এই কথাই বলে : অস্তিত্বের সত্যপ্রকৃতি কী তা এখনও প্রায় অনির্ণেয়, তার পিছনে ছোটা মরীচিকা

অনুসরণের মতই নিষ্ফল ; তাকে বুঝতে হবে তার গতিচ্ছন্দকে, তার আচরণের বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করে। দুর্জ্ঞেয়ের এই What সম্বন্ধে তাই বর্তমান বিজ্ঞান প্রকাশ্য-ভাবেই নিরাশ ; তার How সম্বন্ধেই আজ তার যা কিছু অনুসন্ধান। এই একই গভীর তত্ত্ব রসানুভূতির মাধ্যমে দুটি অনুপম পংক্তির স্বল্প পরিসরে অপরূপ সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়েছে। শরৎ-প্রাতের এই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যরূপটির nature কী তা কবি জানেন না ; তিনি শুধু বোঝেন যে এই সৌন্দর্য-বাণীর সূক্ষ্মসঞ্চারী তরঙ্গের এমন একটি আবেদন আছে যা একান্তই অনুপম, একেবারেই unique।

॥ মুক্ত নীল আকাশ থেকে নেমে-আসা সোনালী আলোর ধারায় প্লাবিত সবুজ বনাঙ্গনে শিউলিফুলের মেলা। সেই সৌন্দর্যের সায়রে কবির চেতনা মগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু এই পরিপূর্ণ মাধুরীর সুধাপানের মধ্যেও কবির অন্তরে বেজে ওঠে ব্যাকুলতার বাঁশি, জেগে ওঠে শিল্পীমনের চির-অশান্ত প্রকাশ-প্রেরণা। 'কিন্তু কবি আজ আর কীই-বা প্রকাশ করবেন ?

আমি যা বলিতে চাই হল বলা
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রু-গলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে সেই মুরতি এই বিরাজে—
ছায়াতে-আলোতে-আঁচল-গাঁথা আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

ব্যক্ত হতে যে আর কিছুই বাকি নেই। যে সৌন্দর্যের প্রকাশ-ব্যাকুলতা তাঁর অন্তরে, সেই অপার্থিব মাধুরীই তো পরিপূর্ণ রূপের স্তরে-স্তরে বিছানো রয়েছে শরৎ-প্রাতের নীল-সোনালি-সবুজের আবেষ্টনীতে, বিকশিত শিউলিবনের শুভ্র-পেলব পুঞ্জে। প্রকাশরূপিণী বীণাপাণি তো নিজেই মূর্ত হয়ে রয়েছেন আজকের এই বিশ্বপটে। তবে আর কবি-হৃদয়ে এই প্রকাশ-আকূতি কেন ? ॥

কবিতাটির অনবদ্য প্রকাশ-সৌন্দর্য এবং নিখুঁত রূপগ্রন্থনা সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় স্তবকের ভাবটি আর একটি গানে ("হৃদয়ে ছিলে জেগে") পাওয়া যায় :

কী-যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে-যে ঐ শিউলিদলে ছড়ালো কাননতলে,
সে যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে॥

কিন্তু এ রচনা শিল্প হিসাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। সাধারণ, মাঝামাঝি স্তরের সাফল্য এবং অনির্বচনীয় সৌন্দর্যময় কাব্যের মধ্যে কী তফাৎ তা এই দুটি একই মৌলিক ভাবপুষ্ট রচনাকে পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যায়।

(১৫)

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তার পরানপুতলা॥
আনন্দেরি ছবি দোলে দিগন্তেরি কোলে কোলে।
গান দুলিছে নীল-আকাশের-হৃদয়-উথলা॥

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

('গীতবিতান', পৃ ৫২৭)

এই রচনাটিতে লিরিক সৌন্দর্যের অমৃতস্পর্শ স্পর্শকাতর মানবমনের আর একটি গভীর অনুভূতিকে এক অপূর্ব-সুষমাময় ধ্বনিসমাবেশে বন্দী করেছে: আমাদের দেশে বছরের শেষে বসন্ত আসে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে, পুরোনো পৃথিবীর বুকে নবজীবনের ক্ষণিক হিল্লোল বইয়ে দিতে। সামান্য কয়েকটি দিনের জন্যে সে যেন আমাদের জীবনের এই ধূলিময় পটভূমিকে রঙিয়ে দিয়ে যায় এক অপূর্ব প্রাণপ্রাচুর্যের গৌরবে। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি সেই অপার্থিব মাধুরীর রসোচ্ছ্বাসের দিকে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই সেই অমর্ত্য যৌবনের তরঙ্গ একটিবার মাত্র তার উচ্ছ্বসিত কিরীটখানি তুলে আবার মিলিয়ে যায় কালপ্লাবনের কঠোর নেপথ্যে। তাই এই নবীনের কোমল হিল্লোলে, এই বর্ণ-গন্ধ-রূপের ক্ষণিক প্লাবনে মুগ্ধ অন্তরে অবিমিশ্র পুলকের উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে না; তার বদলে ঘনিয়ে ওঠে আনন্দবেদনায় বিজড়িত এক অবর্ণনীয় আকুলতা। বিশ্বমানবের এই নিবিড় অনুভূতিটির মর্মস্পন্দন ধরা পড়েছে এই কবিতাটিতে।

প্রথম পংক্তিটির আকস্মিক স্পর্শ যেন বসন্তের মায়ামন্ত্রটিকে হঠাৎ দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় এক বিপুল জোয়ারের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত। পৃথিবীর যে কোন

একটি গোলার্ধেরই অংশে অংশে বছরের এক-একটি বিশেষ সময়ে বসন্তের হিল্লোল জেগে ওঠে। কিন্তু—

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা

—এই কথাটি যেন বসন্তের অভিযাত্রী স্রোতধারাকে সমস্ত পৃথিবীর বুক জুড়ে সমস্ত বনে প্রান্তরে পর্বতে অনিবার্যভাবে ব্যাপ্ত করে। একটি অঞ্চলের একটি বসন্তদৃশ্যের ছায়াকে সমস্ত পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত দেখা— এই মহৎ বিশ্বপ্রসারিতা রবীন্দ্রমানসের একটি আশ্চর্য গুণ এবং এইরকম একটি নিবিড় বিশ্বানুভূতিকে প্রারম্ভের একটিমাত্র পংক্তির মধ্যে আভাসিত করার মধ্যে যে শিল্পশক্তির পরিচয় আছে তার তুলনা একমাত্র মহত্তম কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতেই পাওয়া যায়।

'ধরার চিত্ত হল উতলা': সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আজ বসন্তের উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বসন্ত-চঞ্চল পৃথিবীর মর্মানুভূতিটি ব্যঞ্জিত হয়েছে 'উতলা'— এই একটিমাত্র কথার ভিতর দিয়ে। এমনই sureness of touch যে এই একটি কথাই পরিপূর্ণভাবে এবং অনায়াসে ভাবটিকে ব্যঞ্জিত করে।

দ্বিতীয় পংক্তিটিতে ধরণীর এই নিবিড় ব্যাকুলতার কারণটি আভাসিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্তরে যে চিরনবীনের মাধুরী লুকানো ছিল তা আজ তার সমস্ত বুক জুড়ে অভাবনীয় রূপরসের সমাবেশে রচিত এক মনোহরা মানসীমূর্তিতে আবির্ভূত। বসন্তের এই মায়াময় রূপমালা যেন পৃথিবীর অন্তরমাধুরীর একটি exhalation, তার অস্ফুট অন্তর্ব্যাকুলতার এক অপরূপ বাণীমূর্তি। তার প্রাণের এই darling-কে, এই পরানপুত্তলাকে বুকে নিয়ে সৃষ্টিপুলকিতা ধরিত্রীর হৃদয় আজ উতলা।

চতুর্থ পংক্তি: পৃথিবীর বুকে বয়ে-যাওয়া বসন্তপ্লাবনের রঙীন ঢেউগুলি যেন আকাশের শান্ত নীলিমাকেও উদ্বেল করে তুলছে। যে কথাটি আর একটি গানের[১] পুরো পাঁচটি পংক্তি জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে—

হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার মৌন রহেনা আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

—সেই কথাটিই এখানে আভাসিত হয়েছে একটি মাত্র পংক্তির অনবদ্য শব্দগ্রন্থনায়:

১ ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে, 'গীতবিতান' পৃ ৫০১

গান দুলিছে নীল-আকাশের-হৃদয়-উথলা ।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি : প্রথম স্তবকে ব্যক্ত প্রকৃতির বসন্ত-চঞ্চলতাটি দ্বিতীয় স্তবকে অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে স্থানান্তরিত হয়েছে মানুষের মনে :

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন নিদ্রা ভুলেছে,
আজি আমার হৃদয়দোলায় কে গো দুলিছে ।

বসন্তমাধুরীর মায়াস্পর্শে মানব-অন্তরও ধরার মত উতলা হয়ে উঠেছে। এই অনির্বচনীয় রূপপরিপূর্ণতা যৌবনচঞ্চল অন্তরে প্রাণ-পরিপূর্ণতার নিরন্তর স্বপ্ন জাগায়। তারও রূপপিপাসিত প্রেমতৃষিত হৃদয়ের দোলায় এক পরানপুতলার মানসীমূর্তি ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে ।

সপ্তম ও অষ্টম পংক্তি :

দুলিয়ে দিল সুখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি—
দুলিয়ে দিল জনমভরা ব্যথা অতলা ॥

—বসন্তের স্পর্শে হৃদয়কোণে প্রচ্ছন্ন যত সুখাভাসগুলি পুলকহিল্লোলে ভেসে উঠল; কিন্তু সেই সুখপরিপূর্ণতার মুহূর্তেই বেজে উঠল বেদনার বিচিত্র আকুতি—হয়তো চিরবিচ্ছিন্ন কোন অতীতদিনের হারানো সুরের বিরহ, হয়তো বা পূর্ণপ্রাণের নিঃসঙ্গতার বেদনা। বসন্তের নিবিড় স্পর্শটি যেন অন্তর্গহনে অগোচর বা অর্ধগোচর সমস্ত আবেগের কুঁড়িকে বিহ্বল-করা পরিপূর্ণতার ফুটিয়ে তুলল ।

সহজেই লক্ষ্য হয় কবিতাটির মধ্যে বার বার 'দোল' বা 'দোলানো'-র image-টির পুনরাবৃত্তি। ধরণীর বুকের উপর 'পরানপুতলা' 'দোলে' ; আনন্দের ছবি দিগন্তের কোলে 'দোলে' ; 'গান দুলিছে' ; 'হৃদয়দোলায় কে গো দুলিছে' ; 'দুলিয়ে দিল সুখের রাশি' ; 'দুলিয়ে দিল জনমভরা ব্যথা অতলা'। বসন্তের প্রভাবকে যেন প্রকৃতির বুকে এবং মানুষের মনে একটি নিবিড় জাগরণী স্পন্দনরূপে, একটি অস্ফুট সুখব্যাকুলতার কম্পনরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সমস্ত আকাশ-পৃথিবী-মানবচেতনা ফাগুনের এই তরঙ্গদোলায় বাঁধা পড়ছে ।

অনির্বচনীয় অনুভূতির সূক্ষ্ম-সুন্দর বাণীমূর্তি রচনা বোধ হয় রবীন্দ্রপ্রতিভার সবচেয়ে বড় গুণ। এই কবিতাটি এই শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত। প্রথম ফাল্গুনের যৌবনসজ্জার মধুর আবেষ্টনীতে দক্ষিণ হাওয়ার প্রথম মদির ঝলক যৌবনচঞ্চল দেহে-মনে যে অপরূপ চঞ্চলতার ঢেউ হঠাৎ জাগিয়ে তোলে, তারই অবর্ণনীয় স্পর্শানুভূতিটি ধরা পড়েছে এই রচনাটির নিখুঁত রূপসংহতিতে ।

জ. প্রেম

(১৬)

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি-
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী ॥

*　*　*　*　*　*

*　*　*　*　*

যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
　　যেটুকু যায়রে দূরে　　ভাবনা কাঁপায় সুরে,
　　　　তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি ॥

("গীতবিতান", পৃঃ ৫০৫)

এই মনোরম কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে এক প্রথম-প্রেমবিভোর মনের একটি রসমধুর চিত্র। ছবিটির অঙ্কনকৌশল আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ করে; এর অপরূপ রসঘন মাধুরীও আমাদের মনে নিবিড় পুলকশিহরণ জাগায়। কিন্তু কবিতাটির অঙ্গরচনাই শুধু মনোরম নয়; এর ভিতরে একটি পরম অভিজ্ঞতার মর্মবাণী পরিপূর্ণ সৌন্দর্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে প্রথম-প্রেমের স্পর্শব্যাকুল, মিলনতৃষিত ভাবলীলার যে ছবিটি আঁকা হয়েছে তার সূক্ষ্ম-গভীরতা এবং পরিপূর্ণতাও এক অসাধারণ রোমান্টিক কল্পনাশক্তির স্বাক্ষর বহন করে। মুগ্ধ-ব্যাকুল প্রেমিক-হৃদয়ের সৌকুমার্যের এই পুষ্পবিকাশ অপূর্ব সৌন্দর্যের ভঙ্গিতে আভাসিত হয়ে উঠেছে এই ছোট্টো চিত্রপটটিতে। শুধু তাই নয়, এই মধুর বেদনাবিলাসের চিত্রণের ভিতরে পাওয়া যায় এক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের আলোছায়ার খেলা। তাতে এই রোমান্টিক চিত্রটি আরো ঐশ্বর্যময়, আরো গভীরভাবে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে।

প্রথম পংক্তির 'ছোঁওয়া' কথাটির অর্থ শুধু বাঞ্ছিতার আকস্মিক অঙ্গস্পর্শ নয়; এর গভীরতর ব্যঞ্জনার মধ্যে বাইরের স্পর্শের সঙ্গে মিশে আছে সেই আকাঙ্ক্ষিতার গতিভঙ্গির, তার চোখের চাওয়ার, তার কণ্ঠস্বরের, তার সমস্ত উপস্থিতিটুকুর রোমাঞ্চকর স্পর্শ।

'রচি মম ফাল্গুনী'—আর একটি অসীম-ব্যঞ্জনাভরা, অবর্ণনীয় সৌন্দর্যময় শব্দমালা। প্রেমিকমনের অনুভূতি-রঙিন ভাবলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য এই একটি কথা 'ফাল্গুনী'র মধ্যে আশ্চর্যভাবে আভাসিত হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি :

কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি।

প্রেমিকমনের এই 'ফাল্গুনী'র দুটি ভিন্ন উপাদানের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই যে বিভোরতাটি—এতে মিশে আছে কিছু বা পলাশের উচ্ছ্বসিত আগুন-রঙ, কিছু বা চাঁপার গভীর-গোপন সৌরভস্রোত; কিছু বা প্রিয়ার দীপ্ত রূপমাধুরীর ইন্দ্রিয়মোহ, কিছু বা তার গভীর হৃদয়মাধুরীর অতীন্দ্রিয় সৌরভ। Image-দুটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই অসাধারণ তাদের সংকেতময়তা।

'যেটুকু কাছেতে আসে·········স্বপনের ছবি আঁকে' : প্রিয়ার আগমনের জন্য প্রেমিক সারাক্ষণই প্রতীক্ষা করে আছে ; তবু যতবারই তার আবির্ভাব সত্যিই ঘটে ততবারই সেই উপস্থিতিকে যেন এক অসম্ভব সুখস্বপ্নের মত মনে হয়। রোমান্টিক প্রেমানুভূতির চিত্রণে এই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পৃথিবীর খুব কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়।

'নূপুরের তাল গুনি' : প্রিয়ার আসা-যাওয়ার পদধ্বনিই প্রেমিকের উচ্চকিত অন্তরে নূপুরনিক্কণ ধ্বনিত করে। এই একান্ত রোমান্টিক image-টির গভীর বাস্তবধর্মিতা লক্ষণীয়। প্রেমিকের মন সারাক্ষণ অন্তরালবর্তিনী প্রিয়ার সাথে সাথে ছায়ার মত ঘোরে, কল্পনায় তার ইতস্তত-ভ্রাম্যমান পদক্ষেপকে মন্ত্রমুগ্ধের মত অনুসরণ করে বেড়ায়।

সমস্ত কবিতাটিতে বার বার antithesis-এর, অর্থাৎ বিপরীতার্থক বা ভিন্নধর্মী ভাবধারার পাশাপাশি সমাবেশ বিশেষ লক্ষণীয় ; 'ছোঁওয়া লাগে', 'কথা শুনি' ; 'পলাশের নেশা', 'চাঁপায় মেশা' ; 'রঙে রসে জাল বুনি' এবং কাছে-আসা ও দূরে-যাওয়ার দুটি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। সমস্ত রসচিত্রটি বৈপরীত্যের এবং ভিন্নতার অপূর্ব সামঞ্জস্যে গঠিত। এই-জাতীয় অনুভূতি-গভীর এবং কল্পনাময় রচনার মধ্যে এই অপূর্ব বিন্যাসকৌশল এক অসাধারণ শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে।

(১৭)

এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে ॥

* * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * *

তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে সিক্ত সমীরে,
পিছনে নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে ॥

("গীতবিতান", পৃঃ ৪৭৮)

'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'-এর মত এই কবিতাটিরও প্রথম রূপটি কবির প্রায় আশী বছর বয়সে রচিত হয়। মূল রূপটি পাওয়া যায় "সানাই" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪)। এখানে উদ্ধৃত রচনাটি ঐ কবিতার বেশ-কিছুটা পরিবর্তিত গীতরূপ। এর মীড়প্রধান সুরটি রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির চরম উৎকর্ষে উত্তীর্ণ। কিন্তু এর নিছক কাব্যরূপটিও আশ্চর্য সুন্দর। "সানাই"-এর কবিতাটি নিখুঁত ছন্দে গাঁথা; বর্তমান রূপটি রচনা করার সময় কবি সুরসংযোগের দিকে লক্ষ্য রেখে ছন্দোগতিটি কিছুটা বদলে দিয়েছেন। ফলে যে ছন্দোগতিটির সৃষ্টি হয়েছে তাতে পাওয়া যায় গদ্যের সহজ স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপের মধ্যে এক অতিসূক্ষ্ম ছন্দদোলার সঞ্চার, এবং এই পরিবর্তিত ছন্দোগতিটির মধ্যে এক অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক সূক্ষ্মতা-র পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দগ্রন্থনার মধ্যেও যে পরিবর্তন কবি করেছেন তার ফলে কবিতাটির রূপমাধুরী উজ্জ্বলতর এবং ভাবব্যঞ্জনা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

আশী বছরের চিরতরুণ কবির এই মনোরম রচনাটিতে ধরা পড়েছে মুগ্ধ প্রেমিকমনের একটি মৃদু-মধুর সংশয়-ব্যাকুলতার মুহূর্ত, প্রেমবেদনার আর একটি লীলাতরঙ্গের গতিচ্ছন্দ। এতে চিত্রিত হয়েছে আশা-নিরাশা-সংশয়-আশ্বাসের আলোছায়ায় বোনা একটি ক্ষণিক বিমুগ্ধতার মুহূর্ত। এই mood-টি রূপায়িত হয়েছে যে অপূর্ব আভাসদীপ্ত কোমলতায় তা কবির এই পর্যায়ের চরম শিল্পপরিণতির পরিচায়ক।

'এসেছিলে তবু···গেলে' : এই আশ্চর্য ভাবব্যঞ্জক মিতভাষিতা, অল্প কয়েকটি

কথার সহজসমাবেশে একটি complex mood-এর মর্মকথাকে ব্যক্ত করার এই শক্তি, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যশিল্পের একটি প্রধান গুণ।

'সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে': তার আবির্ভাব ও প্রস্থান যেন ছায়ার মত। এই ছায়ামূর্তির চলে-যাওয়ার ভঙ্গিটি 'পলাতক' বলেই সেই দৃশ্য প্রেমিকের মনে এক মৃদুবেদনাময় অনিশ্চয়তার ঢেউ তোলে। গতিচ্ছন্দের এই চপলতা কি চলে যাওয়ার আগ্রহই প্রকাশ করে, নাকি এই লঘুচ্ছন্দ একটি ক্ষণিক মিথ্যার লীলামাধুরী রচনা করতে চায়?

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি: "সানাই"-এ সংকলিত প্রথম রূপটিতে যে ভাবটি—

তোমার সে উদাসীনতা
উপহাসভরে জানালো কি মোর দীনতা।
সেকি ছল-করা অবহেলা, জানি না সে—
চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে
গেল উপেক্ষা মেলে।

এই পাঁচটি পংক্তি জুড়ে মনোরম ভঙ্গিতে, কিন্তু একটু বেশী বিস্তারিতভাবে এবং একটু বেশী স্পষ্টভাষিত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে, ঠিক সেই ভাবটিই তার সমস্ত ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ রেখে এক ঘনীভূত মিতভাষিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে গীতরূপটির কয়েকটি মাত্র কথার মধ্যে:

তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানিনা সে.
চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে বেদনা মেলে।

'উপেক্ষা মেলে'-র চেয়ে 'বেদনা মেলে'-র ব্যঞ্জনা আমার কাছে আরো সুন্দর মনে হয়। এই image-টি এর কিছু আগে লেখা একটি গানের কয়েকটি কথা মনে পড়িয়ে দেয়[১]:

শ্যামল তমাল বনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায় গোধূলি-খনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে……।

সেখানে নিবিড় বিরহকাতরতা, এখানে এক বেদনামধুর সংশয়দোলা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি: সবচেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে এই দুটি পংক্তিতে: "সানাই"-এ যে-দুটি পংক্তির রূপ:—

১ আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি: "গীতবিতান" পৃঃ ৪৬৭।

পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল,
ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল।

"গীতবিতান"-এর রূপটিতে সে-দুটি হয়ে দাঁড়িয়েছে—

তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল,
শ্যামল বনান্তভূমি করে ছলোছল।

এই পরিবর্তন যেন যাদুময়। পঞ্চম পংক্তির প্রথমেই একটি 'তখন'-এর সংযোগ, 'ফোঁটা ফোঁটা'-র জায়গায় 'বিন্দু বিন্দু' এবং ষষ্ঠ পংক্তির সমস্ত শব্দসমাবেশটির পরিবর্তন এই পুনর্লিখিত রূপটির মধ্যে এক অনির্বচনীয়-আভাসময় ধ্বনিমাধুরীর সঞ্চার করেছে। Image-টির অপূর্ব দ্বৈত-চিত্রণশক্তিও লক্ষণীয়। পংক্তি-দুটিতে সদ্য-বর্ষণক্ষান্ত প্রভাতের একটি মনোরম চিত্র আঁকা হয়েছে; কিন্তু একই সঙ্গে এই ছলছল-করা শ্যামল বনান্তভূমির চিত্রটি আর একটি চিত্রের— উপেক্ষিত প্রেমিকের অভিমান-ছলছল হৃদয়ের—অপরূপ প্রতিচ্ছবি।

'পিছনে নীপবীথিকায়···মেলে; ছিন্নমেঘের আসা-যাওয়ায় রচিত নীপবীথিকার আলোছায়ার খেলাটি যেন প্রেমিক হৃদয়ের সংশয়-আশ্বাসের অন্তর্দোলার প্রতিচ্ছায়া।

ঝ. প্রেম ও প্রকৃতি

(২৮)

দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।
সংগোপনে ফুটবে মঞ্জরীতে॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে॥
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে—
এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে।

*   *   *   *   *
*   *   *   *

(গীতবিতান পৃ. ৩১১)

এই রচনাটিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি গভীর সুরের সৌন্দর্য-অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির

উপর প্রকৃতির জাগরণী প্রভাব যে কী গভীর-সম্ভাবনাময় হয়ে দেখা দিয়েছে তা উপলব্ধি করা যায় এই কবিতাটির অমিতশক্তিময় কল্পনাচিত্রটি থেকে। মানব-অন্তরের গভীরতম স্তরে প্রকৃতির সূক্ষ্ম-সঞ্চারী প্রভাবের রসচিত্রণ রোম্যান্টিক প্রতিভার একটি সহজাত লক্ষণ। এই ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর দান অবিস্মরণীয়; কিন্তু সেই একই পথ ধরে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রকৃতি ও স্পর্শকাতর মানবমনের মধ্যে গভীরতর এবং সূক্ষ্মতর যোগসূত্রের সন্ধান পেয়েছেন এবং এই অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যক্ত করেছেন বিচিত্রতর সৌন্দর্যমূর্তিতে।

॥ শেলির সূক্ষ্মগতি কল্পনায় লুপ্ত ভায়ালেটগুচ্ছের একদা-অনুভূত সৌরভ অন্তরের অনুভবকে সূক্ষ্মতর করে তোলে।[১] ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মহৎ কল্পনায় নদীর মর্মর-কলতানের মাধুরী মুগ্ধ বালিকার মুখচ্ছবিতে ফুটে ওঠে গভীরতর রূপরেখায়।[২] এখানে রবীন্দ্র-কল্পনায় সূর্যাস্তের দীপ্ত-কোমল রাঙিমার প্লাবন প্রেমিকা নারীর হৃদয়কে রঞ্জিত ক'রে তার নিভৃত গহনে ফুটিয়ে তুলেছে এক নিবিড় প্রেমরাগ। সন্ধ্যা-আলোর দৃশ্য কুসুম-প্রণয়িনীর অন্তর্গহনে জেগে উঠেছে প্রেম-মাধুরীর অদৃশ্য পুষ্পমঞ্জরীতে; অন্তকুসুমের নয়নবিমোহন বর্ণরাগ রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমপুষ্পিত হৃদয়ের সৌরভ-সুষমায়। সেই অপরূপ সৌরভোচ্ছ্বাস অভিসার-রজনীর তিমিরকে রোমাঞ্চিত ক'রে রচনা করবে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের আগমনী।

প্রেমিকার একান্ত কামনা, তার হৃদয়ের এই অভাবনীয় প্রেম-প্রস্তুতি যেন ব্যর্থ না হয়। বাঞ্ছিতের স্মৃতিরূপ—তার স্বপ্নস্বরূপ—এসে যেন নিঃশেষে ভরে দেয় হৃদয়; সেই স্মৃতির অমৃতস্পর্শে যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে প্রেমার্ত প্রাণের স্বপ্নলীলা। ॥

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই মনোরম ছবিটি সম্পূর্ণভাবেই একটি অন্তরচিত্র, একটি প্রেমরঞ্জিত হৃদয়ের সংকেতলিপি। অন্তরাভিসারী রোম্যান্টিক কল্পনার যে অদ্ভুত সাহসিকতা এবং গভীরতম অন্তরের আলোছায়ার রহস্য-স্পন্দনকে নিবিড় সৌন্দর্যরূপে ব্যক্ত করার যে ক্ষমতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিতে এবং এই জাতীয় কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়—তার তুলনা আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

কবিতাটির প্রকাশরূপের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি অপূর্ব-আভাসময় image-এর সমন্বয় এবং এক অবিচ্ছিন্ন মধুময় ধ্বনি-কোমলতা।

---

১ শেলি: Music, when soft voices die.

২ ওয়ার্ডসওয়ার্থ: Lucy Poems: Three years she grew in sun and shower—শীর্ষক অংশটি।

ভাব-সংগঠনের দিক দিয়েও রচনাটি নিখুঁত। প্রথমত স্তবকটিতে আছে প্রকৃতির এক দীপ্ত-মধুর রূপের স্পর্শে প্রণয়ীহৃদয়ের জাগরণ, প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা। দ্বিতীয় স্তবকে আছে সেই নিবিড় প্রেমব্যাকুলতার স্বপ্নসার্থকতার আকুতি।

'মন্দবায়ে অন্ধকারে··· ···ধারে:' সমস্ত হৃদয়টি যেন একটি সৌরভময় পুষ্পগুচ্ছে বিকশিত হয়ে মৃদুল হাওয়ায় আন্দোলিত হতে থাকবে বাঞ্ছিতের আগমন-পথের ধারে। Image-টির মধ্যে অসাধারণ চিত্রমাধুরী এবং অন্তর্দ্যোতনার নিখুঁত সমন্বয় লক্ষণীয়।

সপ্তম ও অষ্টম পংক্তি :

এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে ॥

—আর একটি গভীর-আভাসময় **image**। প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার কাননই হয়তো বাঞ্ছিত-মিলনের পটভূমি: আবার নায়িকার প্রেম-সুরভিত হৃদয়ই সেই রজনীগন্ধার বন; সেখানেই পরম-আকাঙ্ক্ষিতের আমন্ত্রণ।

'নিশীথিনীতে': বাইরের নিশীথিনীর অন্তরে বিছানো প্রণয়িনীর 'নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে'।[১]

(১৯)

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে ॥
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে ॥

*　　*　　*
*　　*　　*
*　　*　　*
*　　*

("গীতবিতান" পৃ: ৫২৪)

১ "লিপিকা": মেঘদূত।

এই রচনাটিতে ধরা পড়েছে প্রেমরঞ্জিত তরুণ কবিমনের উপর বসন্তবিহ্বল প্রকৃতির এক রসমধুর প্রভাবের সুর। 'দিনশেষের রাঙা মুকুল'-এ প্রকৃতি-স্পর্শিত অন্তরের ভাবটি নিবিড়, অন্তর্লীন, আত্মবিভোর। এখানে বসন্ত-চঞ্চলিত হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসটি বহির্মুখ ও প্রকাশোৎসুক। সেখানে প্রেমপ্লাবিত বিরহী-হৃদয়ের নিবিড় মিলনকামনা; এখানে মিলন-মধুর প্রেমরাগের কল্পনাবিলাস। এ কবিতাটিতে ব্যাখ্যা করার মত কিছুই নেই। রসোৎসুক পাঠক উপভোগ করবেন এর অনায়াস ভাবরূপায়ণ, এর অনুপম রূপরচনা, এর অনবদ্য শব্দচয়ন, এর মধুময় ধ্বনিসমাবেশ। Absolute perfection-এর আর একটি চিত্র।

সমস্ত কবিতাটি অনুপ্রাসের মায়াময় ঝংকারে ভরা। কিন্তু এই অনুপ্রাসের ব্যবহার আশ্চর্যরকম পরিমিত। প্রাচুর্য আছে, কিন্তু কবির অপরিণত যুগের কাব্যে কোথাও কোথাও অনুপ্রাসের যে অদ্ভুত আতিশয্য চোখে পড়ে—

চল-চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ

—সেই crudity-র লেশমাত্র এখানে নেই। এক মধুর ধ্বনিলহরীর রচনায় কবি এখানে অনুপ্রাসের বহু-বিচিত্র ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছেন, এবং অন্তত সঞ্চারীর পংক্তি-দুটিতে—

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।

—এই অনুপ্রাসের ব্যবহারকে ঘনত্বের প্রায় চরম সীমায় নিয়ে গেছেন, কিন্তু কোথাও কোন জায়গায় অনুপ্রাসের ঘনত্বকে অত্যধিক বা অসুন্দর মনে হয় না। বরং 'মাধবীর মধুময় মন্ত্র' যেন মন্ত্রশক্তির মতই আমাদের অন্তরকে মধুসিঞ্চিত করে। লিরিক অনুভূতির প্রকাশে এই সূক্ষ্ম স্বতঃস্ফূর্ত পরিমিতিবোধ একমাত্র মহত্তম শ্রেণীর কাব্যশিল্পীদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

'গানে' সঞ্চারিত 'কোকিলের কলগীতি' পুলকিত অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবভাষণের, এবং 'বকুলের গন্ধ' অন্তরের নিবিড় আবেগ-বিহ্বলতার দ্যোতক।

'মাধবী' কথাটি এখানে মধুঋতুর সামগ্রিক প্রভাবের প্রতীক। তুলনীয়:

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।[1]

---

১ "বলাকা"

কবিতাটির সৌন্দর্যতরঙ্গটি উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে শেষ পংক্তিদুটিতে :

বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥

কবি-হৃদয়ের অপ্রকাশের প্রণয় রক্তিমাই যেন আগুনরঙা পলাশকলির কাঁকন হয়ে প্রিয়ার হাতকে জড়িয়ে ধরেছে। কবির অন্তরে যা ছিল অনির্বচনীয়, প্রকৃতিই যেন তাকে রূপায়িত করে পৌঁছে দিল প্রিয়ার হাতে।

এখানে 'মণিবন্ধ' কথাটির প্রয়োগ যেন সৌন্দর্যের অমরাবতা সৃষ্টি করেছে।

ঞ. ব্যর্থ লগ্ন

(২০)

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে,
তখন ছিলেম বহু দূরে কিসের অন্বেষণে ॥
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তশিখরশিরে
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনকচাঁপার বনে
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে ॥

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

("গীতবিতান", পৃ ৩৮৫)

এই বিষাদ-মধুর কবিতাটিতে জীবনের একটি গভীর ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা চিত্রিত হয়েছে এক অপূর্ব রূপকচিত্রের ভিতর দিয়ে।

॥ মানুষের জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী যৌবনই কর্মপ্রয়াস সুরু করার সময়, দুর্গম অজানার অন্বেষণে যাত্রা করার পরম লগ্ন। কিন্তু সৃষ্টির বিচিত্র নিয়মে এই ক্ষণিক যৌবনই আবার জীবনের শ্রেষ্ঠ অবকাশকাল—যে অবকাশের মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে প্রেমের অপরূপ সৌরভমঞ্জরী। যৌবনের প্রারম্ভেই অনেক

জীবনের ক্ষেত্রে এই ভালবাসার আহ্বান আসে ; সে আহ্বান বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা সার্থকতার বিচিত্র পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এমনও হয় যে যখন সেই মধুর বার্তা, সেই 'ছুটির নিমন্ত্রণ' এল, তখন নিমন্ত্রিত হয়তো একান্ত অন্যমনস্ক ; তার উৎসুক কর্মপ্রয়াসে, তার দুর্গম মনন-অভিযানে সে আত্মবিভোর। হয়তো এই কর্ম-বিভোরতায়, এই অজানা-সমুদ্রযাত্রায় তার বহুদিন কেটে গেল। অবশেষে যখন তার কাজের নেশা সাময়িকভাবে কেটে গেল, যখন সে কর্মসমুদ্র থেকে আবার কূলে ফিরে এল, তখন ধীরে ধীরে একটি নিদারুণ বেদনাময় সত্য তার অন্তরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। অনেকদিন আগে, যখন 'তরুণ ছিল অরুণ আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ', তখন তার জীবনে এক আশ্চর্য 'ছুটির নিমন্ত্রণ' এসেছিল। কিন্তু 'সোনায়-ছোঁওয়া, অরুণ-আলোয়-ঢালা' সেই নিমন্ত্রণের শিউলিমালা যখন এসেছিল তখন তাকে গ্রহণ করা হয়নি। আজ এই ফুল-ঝরানো শীতের পড়ন্ত বেলায় সে আহ্বানে সাড়া দেবার সময় নেই। জীবনের অমূল্য অবকাশ ফুরিয়ে গেছে। ॥

লক্ষ্য করা যায় যে এই জাতীয় ছোট ছোট গীতিকবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই একটি বিশেষ ভাবরূপায়ণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সে হচ্ছে একটিমাত্র major image-এর বিচিত্র বিস্তারের ভিতর দিয়ে সমস্ত ভাবটিকে ব্যক্ত করা। তাঁর এই-জাতীয় কবিতার মহৎ রূপসংহতির এটিও অন্যতম কারণ। বর্তমান আলোচনা-পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত 'বসন্ত তার গান লিখে যায়', 'খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী', 'মোর পথিকেরে বুঝি এনেছে এবার,' 'বসন্ত সে যায় তো হেসে যাবার কালে' প্রভৃতি রচনায় এই পদ্ধতির বিচিত্র সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান কবিতাটিও এই একই ভাবভাষণ-রীতির আর একটি দৃষ্টান্ত।

'ছুটির নিমন্ত্রণে' : Image-টির মৌলিকতা এবং সংকেতময়তা দুই-ই অপূর্ব। এই 'ছুটির নিমন্ত্রনের' বিপরীত ঢেউ আসছে পরের পংক্তির শেষে : 'কিসের অন্বেষণে'। 'কূলে' কথাটি থেকেই জেগে উঠছে কর্মসমুদ্রে সুদূর অভিযানের একটি চিত্র।

তার পরের image-টি—'তখন অস্তশিখরশিরে······কনকচাঁপার বনে'—রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিস্ময়কর image-গুলির অন্যতম। প্রথমত, image-টির রূপমাধুরী : অস্তশিখরলগ্ন সূর্যের শেষ রক্তিমাভা নেমে এসে এক মায়াময় বর্ণমাধুরীতে রঞ্জিত করেছে কনকচাঁপার পাপড়িগুলিকে। এর কোন স্পষ্ট

human significance জানতে চাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই আচ্ছন্ন-করা দীপ্ত-করুণ সন্ধ্যাছবিটিতে আশ্চর্যভাবে আভাসিত হয়েছে পরিস্থিতিটির গভীর মর্মবাণী।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তি :

লিখন তোমার বিনিসুতোর শিউলিফুলের মালা,
বাণী যে তার সোনায়-ছোঁওয়া অরুণ আলোয়-ঢালা—

যে লিখনটি এসেছিল নিমন্ত্রণের বার্তা নিয়ে, তারও পরিচয়-প্রসঙ্গে গভীর-সৌন্দর্যময় imagery ব্যবহৃত হয়েছে। লিখনটি হচ্ছে 'বিনিসুতোর শিউলিফুলের মালা'। কবির চিরপ্রিয় শিউলিফুল সরল অনাবিল মাধুরীর প্রতীক[১] ; সেই শিউলিফুলের মালা। কিন্তু বিনিসুতোর কেন? সুতো দিয়ে গাঁথা মালা সুন্দর; কিন্তু এ মালার মধ্যে সুতোর জোড়ের কৃত্রিমতাটুকুও যেন নেই। হৃদয়ের অকলঙ্ক প্রেমের ফুলগুলিকে গাঁথতে কোন সূত্রের প্রয়োজন হয়নি; অনুরাগের মায়াবন্ধনে তারা আপনিই বাঁধা পড়েছিল।

'বাণী যে তার সোনায়-ছোঁওয়া অরুণ আলোয়-ঢালা' : প্রাতঃসূর্যের দীপ্তিতে যেমন অরুণিমার পটভূমিতে সোনালীর আভাস, তরুণ হৃদয়ের এই প্রেমের বাণীতে তেমনি ছিল নারী-অন্তরের লাজরক্তিমার পটভূমিতে বিকীর্ণ অনুরাগের স্বর্ণকিরণমালা।

অষ্টম—দশম পংক্তি :

এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন মৌন সমীরণে।
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে ॥

—এই পংক্তিগুলির অবসন্ন ম্লানতা আগেকার অংশটির ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে এক করুণ পার্থক্য রচনা করেছে। লিখনটির কোমল মাধুরীর বর্ণনার মধ্যে যে করুণতার আভাস ছিল, শেষ পংক্তিগুলি সেই plaintive note-কে অতি অল্প-পরিসরের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে একটি গভীর ট্র্যাজিক ব্যর্থতা-চেতনায়।

১ এই প্রসঙ্গে 'তোমার নাম্ জানিনে সুর জানি' এবং 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা' গানদুটির আলোচনা স্মরণীয়।

(২১)

সকালবেলার কুঁড়ি আমার বিকালে যায় টুটে,
মাঝখানে হায় হয়নি দেখা উঠল যখন ফুটে॥
ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি ধুলো থেকে আনিস তুলি,
শুকনো পাতার গাঁথব মালা হৃদয়পত্রপুটে॥

*   *   *

*   *   *

*   *   *   *

*   *   *   *

("গীতবিতান" পৃ ৫৫৩)

'তুমি আমায় ডেকেছিল ছুটির নিমন্ত্রণে'র মত এখানেও ফুটে উঠেছে পরিণত জীবনের একটি গভীর আক্ষেপ-বেদনার সুর। Mood-দুটি খুবই কাছাকাছি, অথচ মোটেই এক নয়। এদের উৎস একই, কিন্তু পরিণতি ভিন্ন। 'ছুটির নিমন্ত্রণ'এর পরম লগ্নটিকে অবহেলা করার সান্ত্বনাহীন বেদনা—যা অনিবার্যভাবেগত, তার অমৃত-গরলময় স্মৃতিচেতনাই—আগেকার কবিতাটির মর্মকথা। বর্তমান কবিতাটির মধ্যে সেই আচ্ছন্ন-করা স্মৃতিবেদনা নেই, mood-টির মধ্যে একটি আপেক্ষিক নির্লিপ্ততা আছে। এখানেও বেদনাবোধ গভীর, কিন্তু এই tragic loss-টি এখন একটি fait accompli। তাই স্মৃতি-বিভোরতার বদলে এখানে mood-টির মধ্যে আছে অন্য একটি আকৃতি : যে শতদল বিফলে ঝরে গেছে তার মাধুরীকে চেতনা থেকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার, তাকে স্মৃতির বিচিত্র হারে গেঁথে রাখার বাসনা। আগেকার কবিতাটিতে জীবনের নিদারুণ ভুল ও ক্ষতির চেতনায় মধ্যেই অন্তর নিমগ্ন; এখানে যে অমূল্য ধন হারিয়ে গেছে তার লুপ্তাবশেষকে পরিপূর্ণ বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার গভীর আকূতি; বাস্তব জীবন থেকে যা হারিয়ে গেছে, সৃষ্টিকারী কল্পনার সাহায্যে তার স্মৃতিকে অবিস্মরণীয় রূপমালায় গেঁথে ফেলার বাসনা। এটি স্পষ্টতই কবিমনের উক্তি। বহু প্রেমপরিস্থিতির এবং প্রেমিকমনের আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিক চিত্রণের মধ্যে স্থানে স্থানে কবিমনের এই ব্যক্তিগত সুরটির স্পর্শ অনুভব করা যায়। আর্ট জীবনের লুপ্ত মাধুরীর স্মৃতিসম্পদকে চিরদিনের সামগ্রী করে তুলতে পারে এই ভাবানুভূতি রবীন্দ্রকাব্যে, বিশেষত তাঁর গানে অপূর্ব বৈচিত্র্যে আভাসিত হয়েছে।

এখানেও একটি অপূর্ব-আভাসময় রূপকের ভিতর দিয়ে এই গভীর অন্তরানুভূতিটি এক মর্মস্পর্শী সৌন্দর্যমালায় বাঁধা পড়েছে। আগেকার কবিতাটির তুলনায় এর প্রকাশভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা, এর style-এর এক অদ্ভুত terseness লক্ষণীয়। এই অল্পভাষিতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় প্রারম্ভের পংক্তি-দুটিতে, যেখানে একটি গোটা জীবনের ইতিহাস ঘনীভূত হয়েছে, এবং সঞ্চারী অংশের পংক্তিদুটিতে—

যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি—
এখন আন্ কুড়ায়ে দিনের শেষে অসময়ের ছিন্ন বাকি।

প্রথম দুটি পংক্তিতে আছে নিরুদ্ধ বেদনার নিস্তরঙ্গ শান্ত গতি। এতই শান্ত এই গতি যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ক্ষতি তত গভীর নয় এবং তাকে সহজেই মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ সাগরস্রোতের উপর পরের (তৃতীয় ও চতুর্থ) পংক্তি-দুটির নিবিড় তরঙ্গোচ্ছ্বাস এই শান্তির ভুলকে মুহূর্তে ভেঙে দেয়। সঞ্চারীর পংক্তিদুটিতে কবিতাটি আবার এক নিমেষের জন্য প্রারম্ভের সেই শান্ত ক্ষতচেতনায় ফিরে গেছে ; তার পরেই শেষ পংক্তি-দুটিতে—

কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা আঁধারকে দেয় যে সান্ত্বনা
তাই নিয়ে মোর মিটুক আশা—স্বপন গেছে টুটে॥

—আবার একটি আক্ষেপ-বেদনার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। দুটি ভিন্নগতি ছন্দতরঙ্গের পরিবৃত্তিতে গঠিত এই কবিতাটির দেহরচনা এবং ভাবব্যঞ্জনা-শক্তি দুই-ই এক অনতিক্রমনীয় সৌন্দর্যের স্তরে উত্তীর্ণ। আমার ধারণায় এই কবিতাটির সবচেয়ে আশ্চর্য গুণ হচ্ছে এর মন্থরগতি ছন্দদোলাটি—যার মধ্যে গভীর বেদনাবোধ, মহৎ acceptance এবং অভিজ্ঞতার স্মৃতি-অবশেষকে হৃদয়ে জড়িয়ে রাখার বাসনা এক আশ্চর্য সম্পূর্ণতায় ফুটে উঠেছে। এই ধরনের আশ্চর্য সূক্ষ্ম rhythmic effect আমি রবীন্দ্রকাব্যেও খুব বেশী পেয়েছি বলে মনে হয় না। এই ছন্দকম্পন তার ভাবব্যঞ্জনাশক্তির শীর্ষে পৌঁছেছে শেষ পংক্তির মাঝখানের বিরামটিতে।

অন্তরা ও আভোগ অংশের অপূর্ব-সৌন্দর্যময় image-দুটির মধ্যে এক বিচিত্র মিশ্র আবেগের নিখুঁত ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। গভীর হতাশার মধ্যে ছিন্ন পাপড়িগুলি দিয়ে মালা-গাঁথার প্রেরণা, আকাশব্যাপী অন্ধকারের মধ্যেও স্মৃতিচন্দ্রকণার

ক্ষীণতম আভায় তৃপ্তির অন্বেষণ, despair এর মধ্যে creative impulse-এর এই উৎসুক জাগরণ — এদের মধ্যে গভীর পরিপূর্ণতায় ফুটে উঠেছে।

ট. বিচ্ছেদ

(২২)

তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে ॥
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুনসমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে ॥

* * * *
* * * *
* * * * *
* * *

("গীতবিতান," পৃ ৩৮৪)

এই অনুপম কবিতাটিতে ব্যাখ্যা করার মত বিশেষ কিছুই নেই। কারণ, এর বাণী অনির্বচনীয় ; এতে রূপায়িত হয়েছে সভ্যতা-পরিশ্রুত, সৌকুমার্য-বিকশিত একটি হৃদয়ের প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনাবিলাস। পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে' জাতীয় কবিতার মত আত্মহারা বেদনার মর্মন্তুদ ক্রন্দন এখানে নেই ; এতে আছে এক বিষাদোজ্জ্বল আত্মসচেতনতা। ব্যথিত প্রেমিক (অথবা প্রেমিকা) যেন নিজের হৃদয়ের এই বেদনাবিধুর স্মৃতিগুঞ্জরনে বিভোর, যেন সে তার বিচ্ছেদ-চেতনার এই বিশ্বময় ব্যাপ্তিতে মুগ্ধ। নিবিড় বেদনাবিহ্বলতার মধ্যে এই সূক্ষ্ম আত্মচেতনা, উচ্ছ্বসিত কল্পনাবিলাসের মধ্যে প্রকাশের এই সুচারু পরিমিতি এক অবর্ণনীয় শিল্পসৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

॥ প্রথম স্তবকে ভেসে ওঠে বিচ্ছেদের আগেকার সোনার মুহূর্তগুলির স্মৃতি— যার স্পর্শে সমস্ত পারিপার্শ্বিক ক্ষণে ক্ষণে যাদুময় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় স্তবকে পাওয়া যায় বিচ্ছেদের ছায়ায় মলিন বর্তমানটি—যে ছায়া আপনার আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে আকাশে-বাতাসে-বনে-প্রান্তরে ॥ —

দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়া ওই কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীলে দিগঞ্চলে রে ॥

প্রথম দুটি পংক্তিতে "ল"-এর তরল প্লাবনের মধ্যে ফুটে উঠেছে অন্তরের অশ্রুবিগলিত স্মৃতিবিহ্বলতা।

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির বিচিত্র অনুপ্রাসের মায়াজাল হিল্লোলিত বসন্তকুঞ্জের নবপল্লবদলের মৃদুমর্মর, পতঙ্গের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি প্রভৃতির সমন্বয়ে রচিত মৃদু-মধুর আন্দোলনের আভাসটিকে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কীট্‌স্-এর Nightingale Ode-এর অপূর্ব ধ্বনিব্যঞ্জনাময় পংক্তিটি :

The murmurous haunt of flies on summer eves.

দুটিরই শব্দাভাস-মাধুরী আশ্চর্য। কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চিত্রণের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। কীট্‌স্-এর এই পংক্তিটিতে এবং এই পংক্তিটি যার শীর্ষ রচনা করেছে সেই অপূর্ব স্তবকটিতে এক পুষ্পিত বসন্তকুঞ্জের যে কল্পনাচিত্রটি আঁকা হয়েছে তাতে শুধুই বসন্তের নিবিড় ইন্দ্রিয়বিমোহন রূপবর্ণগন্ধের মদিরতার আভাস। রবীন্দ্রনাথের পংক্তি-দুটিতেও বসন্তমাধুরীর ঐ মদির বিহ্বলতার আভাস আছে, কিন্তু ঐ মাধুরী একই সঙ্গে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেমিকার অন্তরপ্লাবী প্রেমের বিহ্বল-করা স্মৃতির প্রতীক। এইভাবে বার বার অতি অনায়াসে এবং একান্ত সহজ ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যে প্রকৃতির রূপমালার বিচিত্র আন্দোলনের সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিবিড় অবর্ণনীয় স্পন্দনগুলি মিশে গিয়ে এক ধরণের গভীর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে—যার কাছাকাছি একমাত্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলি-ই বোধহয় কখনো কখনো পৌঁছতে পেরেছেন।

প্রথমাংশের 'ল'-কারের কোমল প্লাবন আবার ফিরে এসেছে শেষ পংক্তিটিতে।

এই রচনাটিরও রূপ-গ্রন্থনার মধ্যে পাওয়া যায় সেই absolute perfection, সেই অনিন্দ্য রূপসৃষ্টি, যা সমস্ত সমালোচনাকে বিস্ময়-নির্বাক করে দেয়।

(২৩)

বসন্ত সে যায় তো হেসে যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ডালে।
তেমনি তুমি যাবে জানি সঙ্গে যাবে হাসিখানি,
অলক হতে পড়বে অশোক বিদায়-থালে॥

* * *
* * *
* * * * *
* * * *

("গীতবিতান", পৃ ৩৬০)

রবীন্দ্রনাথের মহত্তম সৃষ্টিগুলির অন্যতম এই কবিতাটিও "সানাই"য়ে প্রকাশিত হয় এবং পরে সুরযোজনার জন্য বর্তমান আকারে পরিবর্তিত হয়। এই রচনাটির ক্ষেত্রে নির্বাচককে কোন দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়নি, কারণ পরিবর্তিত গীতিরূপটি মূল রূপটির চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর। এক্ষেত্রে পরিবর্তন সামান্য; কিন্তু এই সামান্য অদল-বদলের ফলে শিল্পোৎকর্ষ আশ্চর্যভাবে উন্নীত হয়েছে। এই ধরণের অধিকাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই কবি ছন্দের মূল কাঠামোটি ভেঙে ফেলেছেন সুরের নতুন কাঠামো গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু বর্তমান রচনাটির ক্ষেত্রে মূল কবিতার ছন্দ-গঠনটি অক্ষুণ্ণ আছে; পরিবর্তিত হয়েছে শুধু কতগুলি image ও শব্দসমাবেশ।

বর্তমান কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সেই মহত্তম রচনাগুলির অন্যতম যাদের মধ্যে জীবনের এক-একটি বিপুল অভিজ্ঞতার বেদনালোক এক-একটি অনবদ্য আর্টের সৌন্দর্যমূর্তিতে সংহত হয়েছে। একটির পর একটি আভাসদীপ্ত image এক মহান প্রেমিক-অন্তরের বেদনাদ্যুতিকে বন্দী করে ফেলেছে আর্টের অপূর্ব রূপ-গ্রন্থনে।

॥ কুশলী তুলির চমকপ্রদ টানে টানে এই কাব্যপটটিতে আঁকা হয়েছে বিদায়ের এক বেদনামধুর চিত্র। The Last Ride Together-এর মত এখানেও প্রেমিক যুগলের মিলনের শেষ মুহূর্ত আসন্নপ্রায়। ব্রাউনিঙের কবিতায় নায়িকার বিমুখ হৃদয় বিদায়কালে অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও বেদনায় দুলে উঠেছিল। এখানে চিরবিচ্ছেদের আসন্ন মুহূর্তে নায়কের সমস্ত জগৎ বিলুপ্তপ্রায়, কিন্তু নায়িকা আশ্চর্যভাবে উদাসীন। এই মহূর্তেও তার মুখে সেই অনুপম হাসির ছটা।

চিরন্তন প্রকৃতির একটি দৃশ্যে যেন নিখুঁতভাবে আঁকা এই আসন্ন বিদায়-পরিস্থিতিটির ছবি। বসন্ত তার উপস্থিতিকালে বনের বক্ষ ভরে দেয় তার অজস্র

দাক্ষিণ্যে। কিন্তু যখন সে বনভূমিকে শোকে আচ্ছন্ন করে চলে যায় তখনও তার রূপের দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয় না। হাসিমুখেই সে বিরহাতুর বনভূমির গলায় শেষ কৃষ্ণচূড়ার আগুনরঙা মালাটি পরিয়ে দিয়ে যায়। বনের কোলে রক্তিম পুষ্পগুচ্ছটি দুলতে থাকে, কিন্তু চপলচরণ বসন্তের উত্তরীয় তখন দিগন্তে বিলীন। প্রেমিক তেমনি জানে, বিদায়ের ব্যাকুল মুহূর্তে সে যখন জীবনের সব-কিছু হারাতে বসবে, তখনও তার প্রিয়া তার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হেসেই তাকে বিদায়ের শেষ সম্ভাষণ জানাবে। নির্মম বসন্তের মত চলে যাওয়ার মুহূর্তেও তার মুখের অপরূপ হাসির দীপ্তি ম্লান হবে না।

তারপরে— সেই মায়াবিনীর বেদনাহীন মুখচ্ছবি বুকে নিয়ে প্রেমিক একলা বসে থাকবে জীবনের এই ভাসান-খেলার নদীর ধারে, তার খরস্রোতে প্রাণের প্রতিমাকে ভাসিয়ে দিয়ে। প্রেমিকের মহৎ অন্তরের শুধু এইটুকু কামনা—সে যেন বিদায়ক্ষণের দুঃসহ বেদনাকে প্রিয়ার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। তার পক্ষে এ এক দুঃসহ আত্মদমন। তবু এই ভাল যে বিদায়ক্ষণের ক্ষণিক অনুরাগ প্রিয়ার বিলীয়মান পদক্ষেপকে ঘিরে থাক: পরিত্যক্তের সম্বল যে নিঃসঙ্গ বেদনার অমারাত্রি— সে ক্ষণেকের জন্য বিলম্বিত হোক। ॥

এক অতি-সূক্ষ্ম অনুপ্রাসজাল কবিতাটিকে বেদনার বিচিত্র প্রতিধ্বনিতে ভরে দিয়েছে। থেমে-থেমে-চলা মন্থর ছন্দোগতিটিতে আছে নিরুদ্ধ বেদনার স্পন্দন।

'শেষ কুসুমের···ভালে': শেষ পুষ্পোচ্ছ্বাসটি যেন বনভূমির ভালে বসন্তের বিদায়চুম্বন।

'সঙ্গে যাবে হাসিখানি': এর মধ্যে দুটি ভিন্ন ভাবের সমাবেশ হয়েছে বলে মনে হয়—(১) তোমার সঙ্গে তোমার অপরূপ হাসিটিও আমার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে; (২) যাবার সময়েও তোমার মুখে লেগে থাকবে সেই অম্লান হাসিখানি।

'অলক হতে পড়বে অশোক বিদায় কালে': চিত্র-গৌরবে, ভাব-ব্যঞ্জনায় এবং ধ্বনিমাধুর্যে একটি মনোরম সৃষ্টি। এই মর্মান্তিক বিদায়ক্ষণেও সেই স্বভাবসিদ্ধ লীলাভরেই নায়িকা নায়কের অঞ্জলি ভরে দেবে তার শেষ মধুর সম্ভাষণে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি:

রইব একা ভাসান-খেলার নদীর তটে
বেদনাহীন মুখের ছবি স্মৃতির পটে।

—পঞ্চম পংক্তির এই পরম বিস্ময়কর image-টির ভাবগৌরবের তুলনা নেই। একটি বহু-পুরোনো সামাজিক অনুষ্ঠানরীতির মর্মকথাটি কী আশ্চর্যভাবে একটি

বিপুল-তাৎপর্যময় image-এর সৌন্দর্যসংকেতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের দেশে আমরা যে প্রতিমাকে প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করি, তাকেই আবার নদীর জলে ভাসিয়ে দিই। জীবনপ্রবাহই যেন ভাসান-খেলার খরস্রোতা নদী; আমাদের হৃদয়ের আকুল আদরে লালিত ধনগুলিকে কোনো না কোনো দিন তার সর্বগ্রাসী স্রোতে ভাসিয়ে দিতেই হবে—এমনই সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম। প্রেমিক তার প্রাণের প্রতিমাকে সেই নির্মম স্রোতে সত্ত ভাসিয়ে দিয়ে তীরে বসে থাকবে জলন্ত স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে।

শেষের দুটি পংক্তিতে—

অবসানের অস্ত-আলো তোমার সাথি, সেই তো ভালো—
ছায়া সে থাক মিলনশেষের অন্তরালে ॥

—যে কথাটি বলা হয়েছে তার মধ্যে নায়কের মনের যে মধুর মহত্ত্বের পরিচয় আছে তার তুলনা নেই। মানুষের নৈতিক প্রকৃতির এর চেয়ে বেশী পরিশোধন আর কীই বা হতে পারে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই অংশটিতে 'অ' এবং 'স'-এর কুশলী প্রয়োগে কী-এক বিস্ময়কর সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। "অবসানের অস্ত-আলো"-য় তিনটি কথার আরম্ভে যথাক্রমে 'অ' 'অ' এবং 'আ' এই তিনটি স্বরবর্ণের প্রয়োগ এক কোমল করুণতার প্লাবন সৃষ্টি করেছে।

সহজেই নজরে পড়ে, কবিতাটির সমস্ত ক্রিয়াগুলি ভবিষ্যৎকালে। অর্থাৎ এই বিদায়লগ্নটি এখনও আসেনি, শীঘ্রই আসবে ; প্রেমিক কল্পনানেত্রে সেই আসন্ন মুহূর্তের অনিবার্য ট্রাজিক রূপটি দেখছে। আশ্চর্য এই যে তার প্রণয়িনীর অন্তরের উদাসীনতার কথা জেনেও নায়ক তার প্রেমে বিহ্বল, তার বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় ব্যাকুল। প্রেমিকমনের এই একান্ত অসহায়তাটি এই কাব্যচিত্রটিকে আরো করুণ, আরো গভীরভাবে বাস্তবধর্মী করে তুলেছে।

আর একটি কথা আমার মনে হয়। কবি প্রকৃতির যে চিত্রটি দিয়ে কবিতাটি সুরু করেছেন, আমি নিজে আমার সামান্য অনুভূতি দিয়ে বছরের পর বছর প্রকৃতির সেই রূপটি দেখে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছি। আমাদের দেশের বসন্তের রঙীন সমারোহ যখন শেষ হয়ে আসে তখনই কৃষ্ণচূড়ার[১] ঘনশ্যামল ডালগুলি সেজে-ওঠে আগুনরঙা ফুলের অজস্র মালায়। এই বিলম্বিত পুষ্পোচ্ছ্বাস বসন্তের এলাকাকে অতিক্রম করে বৈশাখের অভ্যন্তরেও নিজেকে প্রসারিত করে।

১ এবং আরো দু-এক রকম গাছের

চারিদিকের প্রকৃতি পুষ্পরিক্ত ; তার মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়ার এই দীপ্ত বর্ণশিখা। বিরহ-ব্যাকুল প্রকৃতির ললাটে বিদায়ী বসন্ত যেন শেষ কয়েকটি চুম্বন এঁকে দিয়েছে। আমার মনে হয়, প্রকৃতির এই বসন্তশেষের বিচিত্র রূপটি দেখেই কবির কল্পনায় জেগে উঠেছিল এই ভাবটির একটি মানবিক রূপকচিত্র। অবশ্য এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

ঠিক এই ধরণের ঘটনার একটি নজীর মনে পড়ছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর একটি সুন্দর সনেট আছে ; তার আরম্ভ Why art thou silent? পলগ্রেভ কবিতাটির নাম দিয়েছেন To a Distant Friend। তাতে কবি দূরবাসী কোন প্রিয়বন্ধুর দীর্ঘ নীরবতার জন্য ব্যথিত অভিমান প্রকাশ করেছেন। কবি আপনার বন্ধুপ্রীতিহারা হৃদয়কে একটি হিমভরা পরিত্যক্ত পাখীর-নীড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন :

Speak! though this soft warm heart once free to hold
A thousand tender pleasures, thine and mine,
Be left more desolate, more dreary cold
Than a forsaken bird's-nest fill'd with snow
'Mid its own bush of leafless eglantine—
Speak, that my torturing doubts their end may know.

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর নিজের টীকা থেকে জানা যায় যে তিনি এক শীতের দিনে বনের ভিতর বেড়াতে বেড়াতে তুষারে আচ্ছন্ন একটি পরিত্যক্ত পাখীর বাসা দেখেছিলেন, এবং কেবলমাত্র এই দৃশ্যটি তাঁর অন্তরে যে সাংকেতিক ভাবাবেগের সৃষ্টি করে তারই প্রকাশ ঐ সনেটটিতে।

(২৪)

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা—
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা ॥
তোমার জ্বলে বাতি, তোমার ঘরে সাথি—
আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা ॥

*   *   *
*   *   *
*   *   *
*   *   *

("গীতবিতান" পৃ ৫৬৯)

এই মহৎ রচনাটি যেমন মর্মস্পর্শী তেমনিই বিস্ময়কর। কাব্যের ইতিহাসে কোথাও কোন ব্যর্থমনোরথ প্রেমিক তার ব্যর্থতাকে এমন শান্ত-গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেরেছে বলে মনে হয় না। The Last Ride Together-এর প্রেমিক তার ব্যর্থতাকে পরাজয় বলে স্বীকার করেনি ঠিকই, কিন্তু সে সান্ত্বনা পেয়েছে মানবজীবনের' সর্বাঙ্গীণ অসার্থকতার কথা ভেবে এবং পরবর্তী জীবনের পরম সার্থকতার আশ্বাসে ভর করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ব্যর্থ-প্রেমিকের দার্শনিক শান্তদর্শিতা প্রায় অতিমানবীয়। তার vision-এর এই objectivity অত্যাশ্চর্য; স্রোতে ভেসে চলতে চলতে সে যেন স্রোতের সামগ্রিক রূপটি দেখতে পাচ্ছে। গভীর ক্ষতিবোধের মধ্যে এই বিস্ময়কর স্থিরদর্শিতা আমাদের কৃত্রিম, অবিশ্বাস্য মনে হতে পারতো যদি এই ব্যাপ্ত-গভীর জীবনদৃষ্টি কয়েকটি মর্মস্পর্শী image-এর অনবদ্য গ্রন্থনের মধ্যে প্রকাশিত না হত। গভীর বেদনানুভূতির সঙ্গে অবিচল জীবনদৃষ্টির এই সমন্বয় বিশ্বকাব্যে দুর্লভ।

॥ নায়িকার জীবনে এক নতুন মিলনমধুর অধ্যায় সুরু হল, আর পরিত্যক্ত নায়কের জীবনে বহু আশা-আকাঙ্খায় ভরা একটি অধ্যায় অতল শূন্যতায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু এই গভীর ক্ষতচেতনার মধ্যেও নায়ক আশ্চর্যভাবে উপলব্ধি করছে যে তার প্রেয়সীর হারানো জীবনের উঠতি ঢেউ এবং তার নিজের আপাত-ব্যর্থ জীবনের পড়তি ঢেউ—এই দুইয়ের বিচিত্র সমাবেশেই জীবনস্রোতের রহস্যময় গতিভঙ্গীর সৃষ্টি। আর সকলের মত সে নিজের ভাগ্যলাঞ্ছিত শ্রীহীন অস্তিত্বকে জীবনের অর্থহীন ভগ্নস্তূপের সঙ্গে তুলনা করছে না। সে দেখতে পাচ্ছে, তার এই এই ব্যর্থতাও জীবনের সামাগ্রিক রীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ; একে না হলে এই অসীম বৈচিত্র্যে গাঁথা জীবনদৃশ্য রচিতই হত না। ॥

গঠনের দিক দিয়ে কবিতাটি শুধুই একটি image-এর মালা। এই প্রকাশ-পদ্ধতি কল্পিত নায়কের স্তব্ধ-গভীর বেদনাময় দৃষ্টির পক্ষে আশ্চর্যভাবে উপযোগী। ছোট ছোট rhythmic period-এ গাঁথা এক একটি image যেন ব্যথিত উপলব্ধির এক একটি ঢেউয়ের দোলা।

'আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা': 'রাতি' শুধু দুঃখের নয়, সংশয়িত অনিশ্চয়তারও—যে রাতের অন্ধকারে জীবনের পথ হারিয়ে গেছে। 'তারা'র দল পরিবর্তনশীল জগতের অচঞ্চল আলোকপ্রহরী; তাই তারা চিরন্তন আশ্বাসের প্রতীক। "লিপিকা"র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এ সন্ধ্যার ক্লান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকেরা 'আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।'

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি :

তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল—
তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল।

—কী আশ্চর্য সহজ ভঙ্গিতে এই অপূর্ব সংকেতময় কথাগুলি কবির মনে জেগে উঠে এক নিখুঁত সংগতিতে গাঁথা হয়ে গেছে। 'ডাঙা' এবং 'বসে থাকা'র ভিতর দিয়ে নায়িকার স্থির নিরাপত্তায় অবস্থান এবং এক অচঞ্চল সুখের নীড়ে আশ্রয় গ্রহণের ভাবটি ব্যঞ্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, 'জল' তরঙ্গিত অনিশ্চয়তার প্রতীক, এবং 'চলাচল' নায়কের অব্যবস্থিত জীবনের অশান্ত পথ-খোঁজার অর্থাভাস বহন করে।

সপ্তম ও অষ্টম পংক্তি :

তোমার হাতে রয়, আমার হাতে ক্ষয়—
তোমার মনে ভয়, আমার ভয়হারা ॥

অনেক ঐশ্বর্য আছে বলেই হারানোর ভয় ; সে ভয় আশাহত অকিঞ্চনকে স্পর্শ করতে পারে না।

(২৫)

আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে—
বাদল-দিনের আকাশপারে
ছায়ায় হল লীন।
কোন্ করুণ মুখের ছবি

* * *

* *

এই গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্ধবাণী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন।

("গীতবিতান" পৃ ৯১০)

আশী বছর বয়সে রচিত এই কবিতাটিতে ধরা পড়েছে কবির সুদূর যৌবনকালের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতির স্পন্দন। বিচক্ষণ রবীন্দ্র-পাঠকের পরিচিত কবিজীবনের এই মর্মন্তুদ স্মৃতিটি কবির সমস্ত জীবনকে জড়িয়ে থেকে বার বার প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র শিল্পরূপে। রসোৎসুক পাঠকের পক্ষে কবির বিপুল কাব্যরাশির মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন সূত্রটির অনুসরণ অভাবিত ঐশ্বর্যের সন্ধানে দিতে পারে। সামান্য লক্ষ্য করলেই এই স্মৃতির বাণীকে বিচিত্ররূপে মূর্ত দেখা যাবে কবির পরিণত বয়সের অনেক রচনায়। তার অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত: 'ছবি' ("বলাকা"), 'শেষ বেলাকার শেষের গানে' ("গীতবিতান," পৃ ৩৩৬), 'আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে' ("গীতবিতান" পৃ ৪৭৯), 'প্রথম শোক' ("লিপিকা"), 'সতেরো বছর' ("লিপিকা") 'শেষ অভিসার' ("সানাই")।[১] একই বেদনা-প্রণোদিত এই রচনাগুলির মনোরম রূপবৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে রচিত এই কবিতাটি বোধ হয় কবির জীবনের এই অমর স্মৃতিবেদনার শেষ রূপায়ণ। এর অন্তর্ধ্বনিটি একই স্মৃতির বাহক পূর্বোক্ত রচনাগুলির প্রত্যেকটির থেকে ভিন্ন। এখানে পাওয়া যাবেনা তরুণ হৃদয়-বীণার তার-ছেঁড়ার নিষ্ঠুর স্মৃতি ('আমার যেদিন') বা হারানো সাথী-প্রাণের চির-বিশ্বব্যাপ্তির আশ্বাস (ছবি) বা অশান্ত আত্মঘাতী শোকের "হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়" পরিণতি ('প্রথম শোক')।

এখানে পাওয়া যায় জীবনের প্রান্তচারী ধ্যানবিভোর মনে প্রথম যৌবনের সেই হঠাৎ-থেমে-যাওয়া নিবিড় প্রেমবাণীর স্মৃতিছায়াপাতের এক পরমাশ্চর্য প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ায় মিশে আছে সেই সুদূর দিনের হারানোর বেদনার বিশ্বভরা করুণতা ও জীবনের পরপারপ্রসারী এক অস্পষ্ট অথচ গভীর প্রশ্নাভাস। সমস্ত mood-টি এক অতুলনীয় করুণতায় মণ্ডিত। এই মুহূর্ত-সঞ্চারী pathos-এর সৃষ্টি করেছে ছন্দের যাদুময় সঞ্চালন এবং এক বিস্ময়কর মিতভাষিতা। কবির poetic style-এর এ এক আশ্চর্য পরিণতি। এখানে ভাবাবেগের যেন কোনো প্রত্যক্ষ প্রকাশ নেই। আছে শুধু কবিতাটির তিনটি অংশে গাঁথা প্রচ্ছন্ন-অর্থবিদ্যুৎভরা

১ এই রচনাগুলি যে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-বিজড়িত এমন কোন বাইরের প্রমাণ নেই। "লিপিকা"র প্রথমাংশের বেশ কয়েকটি লেখায় এই অমর বেদনার বেশ জড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রমাণ আছে কেবল 'সতেরো বছর' রচনাটির ক্ষেত্রে, কারণ কাদম্বরী দেবীর অকালমৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত শোকগাথা 'পুষ্পাঞ্জলি'র সঙ্গে এর ভাব ও ভাষাগত মিল গভীর। তবে সাধারণভাবে এই রচনাগুলির ভাব-উৎস-সন্ধানে এদের অতিনিবিড় personal note-এর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই নির্ভরযোগ্য।

কতগুলি মায়াময় আভাস-সূত্র। তাই জীবনের শেষ কয়েক বছরে রচিত এই-জাতীয় কবিতাগুলি অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পাঠেই অনুভূতিময় পাঠকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে কিছুটা অস্পষ্ট রয়ে যায়। তার কারণ, এই অতি-সরল অথচ সূক্ষ্ম-আভাসময় কবিতাগুলি যেন এক সাংকেতিক লিপিতে লিখা ; পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট শিল্পপ্রবণ পাঠকমনে এদের ধ্বনিকম্পন বার বার আঘাত করলে তবেই ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন অর্থাভাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

॥ কবির তরুণ যৌবনের যে অনির্বচনীয় প্রেমমহিমাময় দিনগুলি এক মর্মান্তিক আকস্মিকতায় চূর্ণ হয়ে যায়, তারা কোথায় গেল, তারা কি একেবারেই চলে গেছে—এই করুণ জিজ্ঞাসা আজ আবার কবির মনকে ব্যথিত করছে। এতই নিবিড়ভাবে সত্য ছিল তারা যে তাদের চিরবিলুপ্তি অভাবনীয়। কিন্তু জীবনের এপারে বা ওপারে, কোথাও কি আর তাদের ফিরে পাওয়া যাবে? কবির অতীত দিনের বর্ষা-সজল স্মৃতির দিগন্ত-ছায়ায় তারা বুঝি চিরদিনের মত বিলীন হয়ে রইল।

কেবল সেই বাদল-ছায়াভরা ম্লান স্মরণাকাশে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে সেই হারানো মুখের অস্পষ্ট ছবি : আদিগন্ত ছেয়ে ফেলে ভৈরবীর বিরহ-মূর্চ্ছনায়।

সেই হারানো দিনের অবিস্মৃত হৃদয়বাণীকে কবি ব্যাপ্ত দেখেছেন বিপুল বিশ্বছবিতে,—ব্রাউনিং যেমন Roman Campagna-র প্রান্তরময় ব্যাপ্ত দেখেছিলেন মানবপ্রেমের চির-অপূর্ণতার নিদারুণ রহস্যকে।[১] বাদল-আকাশ ছেয়ে, দিগন্ত-প্রসারী গহন অরণ্যের নিবিড় ছায়ায় যেন সেই অকাল সমাপ্ত প্রেমবাণী কালের শাসনে স্তব্ধ, জমাট হয়ে আছে। উচ্চকিত স্তব্ধতায় যেন সেই থেমে-যাওয়া বাণী প্রতীক্ষা করেছে কোন এক আলোকিক লগ্নের, কোন এক অভাবনীয় miracle-এর, যার যাদুস্পর্শে তার এই মৃত্যু-স্তব্ধতা যাবে ভেঙে ; সে আবার পরম মুখরতায় জেগে উঠবে অনাগত জীবনের কোন সুদূর প্রাঙ্গণে। ॥

"গীতবিতান" তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে (পৃ ১০০৩) এই গানটির এক পাঠান্তর পাওয়া যায়। এটি ফেব্রুয়ারী ১৯৪১-এ, অর্থাৎ এখানে আলোচিত পাঠটির প্রায় তিন মাস পরে, রচিত হয়। কিছু উল্লেখযোগ্য তফাৎ চোখে পড়ে।

তৃতীয় পংক্তিতে—

বাদল-দিনের আকাশ-পারে

---

১ ব্রাউনিঙ-এর সুপরিচিত কবিতা : **Two in the Campagna**।

এর জায়গায়—

অশ্রুসজল আকাশ-পারে

এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে—

পূবেন হাওয়ায় মেলে দিল
সজল ভৈরবী।

এর বদলে—

বাদল-হাওয়ায় মেলে দিল
বিরহী ভৈরবী।

পরের পাঠটি সম্ভবত সুরযোজনার জন্য পুনর্লিখিত হয়েছিল, কিন্তু সুরটি বোধহয় পাওয়া যায়না। প্রথম পাঠটির ষষ্ঠ পংক্তিতে 'পূবেন' কথাটি অনেকের বেখাপ্পা লাগতে পারে, আমার নিজেরই লাগে। এই অদ্ভুত ও সৌন্দর্যহীন কথাটি কবি কোন খেয়ালে কে জানে, এই পর্যায়ে সৃষ্টি ক'রে, আমি যতদূর জানি, দু-জায়গায় ব্যবহার করেছেন— এখানে এবং "সানাই"-এর 'মরিয়া' (পৃ ৮৮) কবিতাটিতে—

যে গান হয়নি গাওয়া,
যে দান হয়নি পাওয়া
পূবেন হাওয়ায় পরিতাপ তার
উড়াইব অবহেলায়।

কিন্তু ঐ কবিতাটিকে গানে[১] পরিণত করার সময় কবি পরিবর্তিত পাঠটিতে ঐ অতি-স্পষ্ট ত্রুটিটিকে সহজেই শুধরে ফেলেছিলেন—

আজি পুরব হাওয়ায় তারি পরিতাপ
উড়াব অবহেলায়।

কিন্তু এই ত্রুটিটির উপস্থিত সত্ত্বেও আমার প্রথমে উদ্ধৃত পাঠটিই বেশী ভাল লাগে।

কবির এই অন্তিম পর্যায়ের রচনার মধ্যেই "সানাই"-এর (পৃ ৯৮) 'শেষ অভিসার' কবিতাটি ছাড়াও 'আমার হারিয়ে যাওয়া দিন'-এর একটি আশ্চর্য দোসর আছে। এই কবিতাটির আরম্ভ: 'শ্রাবণের বারিধারা ঝরিছে বিরামহারা',[২]

১ আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়, "গীতবিতান" পৃঃ ৪৮০
২ "গীতবিতান", পৃঃ ৯০৯।

এবং এটি রচিত হয় অগাষ্ট ১৩৪০-এ, অর্থাৎ 'আমার হারিয়ে যাওয়া দিন' রচনার মাত্র চার মাস আগে। রচনাটির কয়েকটি লাইন নিচে তুলে দিলুম :

দূর দিবসের তটে মনের আঁধার পটে
অতীতের অলিখিত লিপিখানি লেখা কি।
বিদ্যুৎ মেঘে মেঘে গোপন বহ্নিবেগে
বহি আনে বিস্মৃত বেদনার রেখা কি।
যে ফিরে মালতীবনে সুরভিত সমীরণে
অস্তসাগরতীরে পাব তার দেখা কি ॥

ভাবের, mood-এর আশ্চর্য মিলটি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বহুদূরে ফেলে-আসা প্রথম যৌবনের সেই বেদনাস্মৃতির বাষ্পজাল নিঃসন্দেহে অশীতিবর্ষ কবির অন্তিমচেতনাকে বার বার আচ্ছন্ন করেছিল। অবশ্য 'আমার হারিয়ে যাওয়া দিন'-এর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য-কুহকের কাছাকাছি কোন কিছু এতে নেই।

ঠ. প্রেমবঞ্চিত

(২৬)

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে।

* * * *
* * * *

তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে।

("গীতবিতান", পৃ ২৬০)

"গীতিমাল্য" পর্যায়ের এই রচনাটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের মহত্তম সৃষ্টি-গুলির অন্যতম। শুধু তাই নয়, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের উপর, এবং সাধারণভাবে, এই জাতীয় মহৎ-অনুভূতিপ্রবণ মানুষের জীবনের উপর একটি মর্মস্পর্শী commentary। বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই গভীর বেদনানুভূতিটি ব্যক্ত করেছেন বহু বিচিত্রভাবে। কিন্তু এই অনন্য রচনাটিতে নিবিড় অভিজ্ঞতাটি ধরা পড়েছে অতুলনীয় তীব্রতায়, উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণতায় এবং অনবদ্য শিল্পসৌষ্ঠবে।

রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের জীবনের মূল সুর হচ্ছে প্রেম—, অশেষ, অবাধ, অপরিমেয় প্রেম ; জীবনে যা কিছু মহৎ, মধুর, উদার, তার প্রতি প্রাণের গভীর উদ্বেলিত ভালবাসা। মানুষের গভীর হৃদয়বত্তা, মানুষের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা, প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য, নারীর মোহময় রূপ ও হৃদয়মাধুরী—সবই পূর্ণিমার চাঁদের মত তাঁর প্রাণের সমুদ্রে জোয়ার জাগায়।

কিন্তু যে মানুষ এত সৌন্দর্যবিভোর, এত প্রেমপ্রবণ, তার গভীর প্রেমপিপাসা জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে কী করে মিটবে? কাকে, কোন বস্তুকে, কোন সাথী-হৃদয়কে আশ্রয় করে এই মহান প্রেম তার সার্থকতা খুঁজে পাবে? মানুষের স্পর্শকাতর প্রাণের প্রেমকে বিশ্বসৌন্দর্যের স্পর্শ বিচিত্রভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কিন্তু সে প্রেম আপনার প্রকাশ-পরিণতি খোঁজে মানুষেরই ভালবাসায়, মানুষেরই মঙ্গলকামী কর্মপ্রচেষ্টায়, বন্ধুর প্রীতি-সাহচর্যে, নারীর সংবেদনশীল লীলায়িত প্রেমে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতা এবং অনুভূতিপ্রবণতা দুই-ই অসাধারণ হওয়ায় এই প্রেমপরিণতির প্রয়োজন তাঁর জীবনে খুবই গভীর ছিল। কিন্তু এই বিপুল প্রয়োজনের কতটুকুই বা পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল? অসাধারণ মনের অধিকারী অধিকাংশ মানুষের মত তিনি কর্ম এবং কল্পনার বিচিত্র পথে সারাজীবন ঘুরেছেন একান্ত নিঃসঙ্গতায়। বাঞ্ছিত সঙ্গস্পর্শ হয়তো মাঝে মাঝে পেয়েছেন ; কিন্তু তাঁর দীর্ঘজীবনে সে-সব লগ্ন এসেছে পরম ব্যতিক্রমের মত। প্রায় সারাজীবনই তাঁকে ঘুরতে হয়েছে এমন সব ক্ষীণহৃদয় সংকীর্ণমনা সাধারণ মানুষের মধ্যে— যাদের সঙ্গ তাঁর গভীর অন্তরের চির-নিঃসঙ্গতাকেই তীব্রতর করে তুলেছে।

অবশ্য এইসব সঙ্গীদের নীরস পরিবৃতির মূল্যও কম নয়। এই ধূসর পরিবেশে বার বার প্রতিহত হয়ে কবির এই গভীর জীবনতৃষ্ণা, এই অকূল প্রেম-বেদনা কী আশ্চর্যভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে, কী বিচিত্র বর্ণসমাবেশে, কী অজস্র আনন্দ-বেদনার পুষ্পদলে স্তরে স্তরে ফুটে উঠেছে! শুধু তাই নয়, জীবন-ব্যাপী এই সঙ্গবিরহের ফলে তাঁর গভীরতম অনুভূতিগুলির ভিতর ফুটে উঠেছে

এক মহান বিশ্বধর্মিতা যার তুলনা আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। এই নিঃসঙ্গতার নিষ্ঠুর চাপে তাঁর কাব্যময় ছড়িয়ে পড়েছে সেই অলৌকিক আলো যা মাটিতেও নেই, সাগরবক্ষেও নেই, আছে শুধু স্রষ্টা শিল্পীর অলক্ষ্য ধ্যানলোকে। বর্তমান কবিতাটিও কবি-জীবনের গভীর আকূতির সেই মহৎ sublimation-এর একটি দৃষ্টান্ত।

কবিতাটির ভাবার্থ যে এই-ই, এটি যে নিঃসঙ্গহৃদয় কবির এই-জীবনেরই অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণার অভিব্যক্তি, এটি যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের অপ্রাচুর্যের বেদনার প্রকাশ নয়—সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সন্দিগ্ধ পাঠক স্মরণ করতে পারেন "সঞ্চয়িতা"য় কবি নিজে এই রচনাটির নাম দিয়াছেন 'ব্যর্থ'। দ্বিতীয়ত, Lover's Gift and Crossing এ (পৃ ৮৩) সংকলিত এই গানটির অনূদিত রূপটিও একই সাক্ষ্য দেয়। এর শেষ অংশে আছে—

And why does this foolish heart recklessly launch its hope on the sea whose end it does not know ?

ঈশ্বরের নিষ্ফল অন্বেষণে বার বার ধাবিত হওয়ার জন্য কবি নিজের হৃদয়কে 'নির্বোধ' বলছেন একথা ভাবাও যায় না। বহুদিন আগে লেখা একটি গানে কবি যে কথা বলেছিলেন—

ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি,
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা॥
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা, নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে,
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা॥

—মূলত সেই কথাই এখানে গভীরতর পরিণতির সুরে ব্যঞ্জিত হয়েছে—

তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে।

কবিতাটির এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে এটি যদি কবির এই-জীবনের অতৃপ্ত প্রেম-তৃষ্ণারই পরিচায়ক হয়, তাহলে এর স্থান "গীতিমাল্য"তে

কেন এবং এর অনুবাদটিই বা ইংরাজী বইটির Lover's Gift অংশে স্থান না পেয়ে Crossing-এ সংকলিত হয়েছে কেন? এর উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। কবিতাটি প্রেমবেদনার অভিব্যক্তি হলেও এই বেদনার কথা কবি নিবেদন করেছেন তাঁকেই যিনি এই বিশ্বের নিয়ামক, কবির জীবনরথের যিনি সারথী।

কবিতাটির গঠনে ছোট এবং বড় পংক্তিগুলির বিন্যাসকৌশল লক্ষণীয়। ছোট ছোট দুটি আধো-জাগা ঢেউয়ের পরে এক একটি বিপুল বেদনার তরঙ্গ যেন উপকূলে ভেঙ্গে পড়েছে।

'কেন ভোরের আকাশ······গানে': বিচিত্রবর্ণ আলোর সংগীতে প্লাবিত ভোরের আকাশ বিহ্বল হৃদয়েও গানের প্রতিধ্বনি তোলে; কিন্তু সে গান শোনাবার সাথী কোথায়?

'কেন তারার মালা······পাতা': পাঠক লক্ষ্য করবেন এই image-দুটির মধ্যে বিপুল কল্পনাশক্তির প্রসার এবং মহৎ বিশ্বপ্রসারিতার সঙ্গে একটি রসমধুর sensuousness-এর মিলন।

'কেন দখিন হাওয়া····· কানে': দখিন হাওয়া যেভাবে নবযৌবনা ধরণীর গোপন কথা কানে কানে জানায়, হৃদয় চায় গভীর অনুভূতির বাণীগুলি সেইভাবে মরমী সাথীকে নিভৃতে জানাতে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তি:

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে।

—নীল আকাশের নিবিড় উন্মুখ দৃষ্টি যেন হৃদয়ের যত চেপে-রাখা, ভুলে-থাকা কামনাকে নতুন ক্ষুধায় জাগিয়ে তোলে।

'তরী সেই সাগরে······জানে: অনিশ্চিত, অজ্ঞাত যার পরিণাম, সেই ভালবাসায় নিজেকে বার বার হারিয়ে ফেলে।

(২৭)

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি
আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী॥

*   *   *
*   *   *
*   *   *

আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে

*   *   *

আমার সকল দিনের পথ খোঁজা এই হল সারা,
এখন দিক্‌-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি ॥

("গীতবিতান", পৃঃ ১৪৪)

এই গভীর-আবেদনময় কবিতাটিও রবীন্দ্রজীবনের গূঢ়তম অন্তর্বেদনার এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে"র কয়েক বছর পরে রচিত এই গানটিতে কবিহৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণার বেদনা একটি অপূর্ব, অভিনব সুরে বেজে উঠেছে। অভিনব এই অর্থে যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রেমকাব্যের মধ্যে এই সুরটি দুর্লভ। তাঁর কাব্যে চিত্রিত ট্র্যাজিক প্রেমেরও এমন এক মহৎ ব্যাপ্তি এবং সচলতা আছে যে দুঃখের মধ্যেও সে যেন কোন অলক্ষ্য আশ্বাসবলে জয়ী! তাই এই গভীর আক্ষেপ-বেদনার, এই anguish এবং resignation-এর সুরটি এই অপূর্ব-সুন্দর কবিতাটিকে এক অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে।

॥ কবির জীবনব্যাপী সঙ্গসুধাতৃষ্ণা প্রায় অতৃপ্তই রয়ে গেল। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে অতৃপ্তপিপাসা কবি তাঁর ঘরে আর আলো জ্বালতে চান না: কী হবে সাথীহারা শূন্য ঘরে আলো জ্বেলে।[১] এই ব্যথিত চির-প্রতীক্ষা শেষ করে দিয়ে তিনি রাত্রির বিপুল দীপহীন অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে থাকতে চান—জীবনের প্রান্তপ্রসারী অজানা তিমিরলোকের মধ্যে যদি কোন প্রচ্ছন্ন আশার সংকেত পান। অন্ধকারের সেই দুর্গম রহস্যের ধ্যানে তাঁর চেতনা নিঃশেষে নিমগ্ন হোক, অন্য কোন প্রয়াসের জন্য তার কিছুমাত্রও অবশিষ্ট থাকার প্রয়োজন নেই। তাঁর জীবনের এই উদ্বেলিত প্রেমতৃষ্ণা, এই অপরিতৃপ্ত সঙ্গপিপাসা তাঁর গভীর হৃদয়ের লুকিয়ে-ফোটা পুষ্পদলের মধ্যেই চির-অগোচর থেকে যাক।

তাঁর যে সৌন্দর্য-অভিসারী হৃদয় এই সবুজ পৃথিবীর বিচিত্রিত প্রাঙ্গণে প্রণয়ী-হৃদয়ের সঙ্গসুধারস খুঁজে বেড়িয়েছিল সে এখন বিশ্বের তারাখচিত অন্ধকারের অজ্ঞাতলোক ফিরুক জীবনের বেদনাময় রহস্যের অর্থসন্ধানে। তাঁর দিনের অর্থাৎ মর্তজীবনের সমস্ত অন্বেষণ আজ সমাপ্ত হয়েছে। বহু বিচিত্র পথে অন্বিষ্টের

---

১ এই আলোচনা-পর্যায়ের 'তোমার হল সুরু' কবিতাটির দুটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

তোমার জ্বলে বাতি,   তোমার ঘরে সাথি,
আমার তরে রাতি,   আমার তরে তারা।

পিছনে ঘুরে আজ জীবনের প্রান্তে এসে তিনি যেন দিশাহারা। এই পথ-হারানোর শূন্যতার মধ্যেও কোন সুদূর আশায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি আজও এগিয়ে চলেছেন তা তিনি নিজেই জানেন না।॥

অসংখ্য প্রেমপরিস্থিতির চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় গীতিকাব্যের মধ্যে, বিশেষত তাঁর গানগুলির মধ্যে পাওয়া যায় শিল্পীমনের এক আশ্চর্য creative detachment। এই মহৎ নৈর্ব্যক্তিকতার ছাপ তাঁর অধিকাংশ লিরিকে। খানিকটা ব্রাউনিঙের মত তিনি নিজেকে অসংখ্য প্রেমপরিস্থিতির নায়করূপে কল্পনা করে শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে study করেছেন। তাঁর পরিণত বয়সে রচিত প্রায় কোন প্রেমচিত্রেই তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষা-বেদনা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়নি। এই সাধারণ সত্যের যে সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তার মধ্যে বর্তমান কবিতাটি বোধহয় সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও বিস্ময়কর। "গীতিমাল্য"র 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে'র সঙ্গে এর মৌলিক ভাবগত ঐক্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার দু'বছর পরে লেখা আর একটি (এবং সম্ভবত একটিমাত্র) রচনার সঙ্গে 'আমি জ্বালব না'র চমকপ্রদ ভাবগত এবং প্রকাশগত মিল আছে। সেটি হচ্ছে 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে' ("গীতবিতান" পৃ ৩৮৮)।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রেমকাব্যে এই ধরনের গভীর personal note বিরল। মেঘবিলুপ্ত অন্তদিগন্ত যেন শান্ত-ধূসর আবরণে ঢাকা। নিগূঢ়তম অন্তর্বেদনায় রঞ্জিত এই গানগুলি যেন সেই মেঘাবরণ ভেদ করে দু-একটি ক্ষীণ রেখায় ফুটে-ওঠা অন্তরালের রক্তিমোচ্ছ্বাস।

কিন্তু 'আমি জ্বালব না'-র mood-টি একেবারেই অনন্য, এমনকি অপ্রত্যাশিত। এর কোন জুড়ি আছে বলে মনে হয় না। 'আমার একটি কথা'-র বিষাদটি স্নিগ্ধ-মধুর। কবি সাথীহীন, কিন্তু এই নিঃসঙ্গতার বেদনাকে তিনি প্রতিফলিত দেখছেন 'চেয়ে-থাকা তারা'র চোখে এবং একে তিনি 'বাঁশির' গানে গানে প্রকাশ করতে পারছেন। কিন্তু 'আমি জ্বালব না'-তে বিষাদটি গভীর-নিরাশাময়. সান্ত্বনাহীন; তার কোন মুক্তি নেই; তাই তার ট্র্যাজিক সুরটি গভীরতর। সেই নিষ্ফল বেদনাকে প্রকাশ করেই বা কি হবে? তার চেয়ে 'বেদনার গন্ধখানি' হৃদয়ের 'লুকিয়ে-ফোটা পুষ্পপাতে'ই ঢাকা থাক। গভীর অপূর্ণতার এই ক্ষণিক চেতনা, এই বেদনাবিহ্বল পথশ্রান্তির সংশয়, বোধহয় পরিণত রবীন্দ্রকাব্যের এই একটিমাত্র স্থানেই আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে গেছে।

কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয়, এই উদ্বেলিত মর্মবেদনার mood-টির রূপায়ণেও

কবি সেই একই artistic detachment-এর পরিচয় দিয়েছেন। তার সাক্ষ্য বহন করছে কবিতাটির নিখুঁত গঠন।

Image-গুলির বিপুল ইঙ্গিতময়তা লক্ষণীয়। 'আমি জ্বালব না…প্রদীপখানি' —এই একটি পংক্তির একটি image-এর ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে জীবনব্যাপী আশাভঙ্গের সুর।

তৃতীয় পংক্তি—

আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথরাতে

—পরিস্ফুট অর্থের অতীত একটি ব্যঞ্জনা আছে এই কথাটিতে; কবির অন্তরের হতাশার সঙ্গে এর মধ্যে মিশে আছে তাঁর বিফল অস্তিত্বকে অন্ধকারের কালো পটে মুছে ফেলার অভিমানক্ষুব্ধ বাসনা।

চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তি—

আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি ॥

—অনির্বচনীয়-সৌন্দর্যময় এই ভাবচিত্রটি রবীন্দ্রনাথের মহত্তম image-গুলির অন্যতম।

৭ম পংক্তি—

যেখানে ঐ আঁধারবীণায় আলো বাজে

—এই বিপুল বিশ্বচিত্রটি নানারূপে পরিণত রবীন্দ্রকাব্যে ছড়ানো। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

'অগ্নিবাণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে।'

("গীতবিতান", পৃ ৭৩)

'প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।'

("গীতবিতান", পৃ ১৯)

'বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়।'

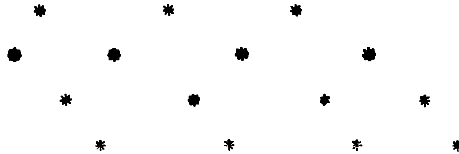
("গীতবিতান", পৃ ৯৩)

কবিতাটির অর্থসম্বন্ধে আমি এখন সন্দেহমুক্ত। অর্থাৎ এর mood-টি যে কবির জীবনব্যাপী নিরুদ্ধ অতৃপ্তির এক দুর্লভ উচ্ছ্বাসে গঠিত, এ-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে সংযোজিত সুরটিও একই সাক্ষ্য দেয়। গানটির সুর একেবারেই অসাধারণ; রবীন্দ্রনাথের আর কোন গানের সুরের সঙ্গে এর মিল নেই। প্রথম পংক্তিটির সুরের মধ্যে মাড়ের গভীর মোচড়গুলি এক অতি-গভীর হৃদয়ক্ষতের সাক্ষ্য বহন করে।

ঙ. বাস্তবের স্বপ্নসজ্জা

(২৮)

ওগো তুমি পঞ্চদশী,
পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।
মৃদু স্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে॥
ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী
তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে,
প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে॥



("গীতবিতান" পৃ ৪৮১)

এই রোমান্টিক ছায়াচিত্রখানি চরম-পরিণত রবীন্দ্রপ্রতিভার অসাধারণ শক্তির পরিচয় বহন করে। প্রায় আশী বছর বয়সে রচিত মূল কবিতাটি "সানাই"-এ প্রকাশিত হয় 'পূর্ণা' নামে। বর্তমান পাঠটি "গীতবিতান"-এ সংকলিত পুনর্লিখিত গীতরূপ। শব্দসমাবেশের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে এই পাঠটি মূল রচনাটির চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি-সৌন্দর্যের রসচিত্রণে কবিতাটি প্রায় অতুলনীয়। ছিন্নবর্ষণ মেঘের ক্ষীণচ্ছায়া-বিচিত্রিত একটি আষাঢ়-পূর্ণিমার অনির্বচনীয় সৌন্দর্য-কুহক মূর্ত হয়ে উঠেছে এর image-গুলিতে।

॥ অস্ফুটযৌবনা কিশোরীর মত শুক্লপক্ষের ক্ষীণকায়া চাঁদ ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে। কিশোরীর জীবনে এগারো, বারো, তেরো,

চোদ্দো বছরের মত একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী তিথি এসে কৃশাঙ্গী চাঁদকে ধাপে ধাপে স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। শেষে একদিন দেখা যায়, পনেরো বছরে পদার্পণ করে কিশোরী যেমন পূর্ণবিকশিত যৌবনে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি 'শুক্লা নিশার অভিসার-পথের' পথিক চন্দ্র-কিশোরী পঞ্চদশী তিথিতে পৌঁছেই খুঁজে পেল তার চরম পরিপূর্ণতা; পঞ্চদশী কিশোরী হল পূর্ণযৌবনা পূর্ণিমা।

বাদল-ছায়ারঞ্জিত এই পূর্ণিমারাত্রির মাধুরীকে কবি তাঁর শেষ জীবনের লীলাময় কল্পনাদৃষ্টিতে দেখেছেন এক স্বপ্নমগ্না পূর্ণযৌবনারূপে। সে নিদ্রিতার অধরে কখনো জেগে ওঠে সুখস্বপ্ন-ছোঁয়া মধুময় হাসির আভাস। আকাশ-মাটি-আচ্ছন্ন-করা, মেঘচ্ছায়া-স্তিমিত মায়াময় জ্যোৎস্নাধারাই সেই হাসি। এই মধুর স্নিগ্ধতার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠছে জেগে-ওঠা পাখীর অস্ফুট কাকলি: সে ক্ষণিক কলরোল যেন নিদ্রিতার স্মিতযৌবনের সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে জাগায় এক মধুর তরঙ্গচঞ্চলতা। তার নিদ্রাকে স্নিগ্ধতর করে তোলে সজল হাওয়ায় ভেসে আসা নতুন-ফোটা কেতকার সৌরভোচ্ছ্বাস।

আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, বাদল-হাওয়ায় আন্দোলিত বনের ক্ষীণমর্মর যেন নিদ্রিতা নিশীথিনীর হৃদয়ে স্বপ্নস্মৃত কোন অজানা বেদনায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। তাই বুঝি অকারণ-বেদনার ছায়ার মত দিশাহারা ছিন্ন মেঘের দল তার স্বপ্নকরুণ মুখখানিকে থেকে থেকে ম্লান করে তুলছে। কালো মেঘের প্রান্তপ্রসারী জ্যোৎস্নারেখা যেন কালো চোখের পক্ষ্মরেখায় ছলছল অশ্রুর আভাস।॥

একটি বাদল-পূর্ণিমার এই অপূর্ব কল্পনামণ্ডিত চিত্রটির রচনায় যে অভাবনীয় শিল্প-অধিকারের পরিচয় আছে তার তুলনা কবিরই শেষ-জীবনের কয়েকটি রচনায় ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই ভাবচিত্রটি গঠিত হয়েছে দুটি ভিন্ন ভাবের নিখুঁত সমাবেশে। প্রথম অংশে পাওয়া যায় স্বপ্নমগ্নার সুমধুর সুখবিহ্বলতা; দ্বিতীয় অংশে আছে সেই সুখমগ্ন স্বপ্নাকাশে ক্ষণে-ক্ষণে ভেসে-আসা স্মৃতিবেদনার মেঘাভাস:

যেন অরণ্যমর্মর
গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর।
অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,
ছলোছলো জল এনে দেয় তব নয়নপাতে॥

প্রত্যেক image-এর এই আশ্চর্য দ্বৈত-চিত্রণশক্তি রবীন্দ্রকাব্যেও বিরল। প্রতিটি image পূর্ণিমারাত্রির এক-একটি রূপাংশকে চিত্রিত করে এবং একই সঙ্গে কল্পিতা নিদ্রামগ্নার স্বপ্নলীলার এক একটি ভাবতরঙ্গকে আভাসিত করে তোলে।

'ওগো তুমি পঞ্চদশী' অংশটি একটি আবেগময় মুগ্ধ সম্ভাষণ, এবং পাঠের সময় এর উপর সম্বোধনের ঝোঁকটি পড়া দরকার।

দ্বিতীয় পংক্তিতে দন্ত্য স-এর সূক্ষ্ম অনুপ্রাসের পর একটিমাত্র ল-এর তরলতা অবর্ণনীয় ধ্বনিমাধুরীর সৃষ্টি করেছে।

ঢ. সুন্দরের স্বপ্নাভিসার

(২৯)

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে।
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না॥

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবিসৃজনে।
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না॥

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা,
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি জোনাকিপ্রদীপমালিকা,
ভরি নিশীথতিমিরথালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।

ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখশয়ন তেয়াজি—
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহকাঁদনা॥

("গীতবিতান," পৃ ৪৮৫)

সাধারণভাবে দেখতে গেলে কবিতাটি একটি রোমাণ্টিকধর্মী flower poem। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-প্রমুখ অনেক ইংরেজ কবি অনেকগুলি flower poem এবং bird poem লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও জীবনের শেষ চতুর্থাংশে অনেক গাছ, লতা ও ফুলের উপর অনেক কবিতা লিখেছেন; তার মধ্যে অনেকগুলিই মহৎ আর্টের আবেদনলোকে উত্তীর্ণ। এদের মধ্যে কতগুলি আছে মোটামুটি ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ধাঁচের; তাদের ভিতর সবচেয়ে সুন্দর বোধহয় "বনবাণী"র 'নীলমণিলতা' এবং "পূরবী"র 'আকন্দ'। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার আর এক ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক যে সব তরু, লতা বা পুষ্প-বিষয়ক কবিতা, তাদের মধ্যে আছে শেলির অনেক কবিতার মত,[১] এক-একটি মর্তরূপের কণাকে কেন্দ্র করে এক আকাশচারী রোমাণ্টিক কল্পনার বিপুল ভাববিহার। 'মন-যে বলে চিনি চিনি', 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'

১ ঠিকভাবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় কবিতাগুলিতে শেলি এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর গুণাবলীর এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয় পাওয়া যায়। তার ওপরে. এগুলির মধ্যে আরো কিছু আছে যা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব।

প্রভৃতি কবিতা এই দলের। বর্তমান কবিতাটিও অনেকটা এই শ্রেণীর। শেলির Skylark-এর মত রবীন্দ্রনাথের শিউলিফুল রোমাণ্টিক কল্পনার বিচিত্র আলোকপাতে এক গৌরবময় সংকেতমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। শেলির ক্ষেত্রে এই রূপান্তরণের পথে কল্পনার পাখার দু-একটি এলোমেলো ঝাপটা লক্ষিত হয়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কল্পনার এই ভাববিহারের পক্ষস্পন্দন নিখুঁত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগের সূত্র কোথাও দুর্বল বা দীর্ঘ হয়ে পড়েনি।

কবিতাটির দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ চোখে পড়ে। প্রথমাংশের বিশেষ ভাবটি মহৎ পরিণতি লাভ করেছে দ্বিতীয়াংশের বৃহত্তর ভাবলোকে। কিন্তু, মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী অক্লান্ত সৌন্দর্যসাধনার এই বিশ্বজনীন ভাবটি শেষ পংক্তিগুলিতে আবার ফিরে এসেছে সেই আরম্ভের বিশেষে—শরৎপ্রাতের কোমল মাধুরীর ঢেউ-তোলা শিউলিফুলে।

॥ শরৎপ্রাতের শিউলিফুল—সে যেন শরতেরই প্রাণের প্রতিমা। বাসন্তী বৃন্তে বিকশিত তার কোমল শুভ্র দল তরুণ প্রাণের অকলঙ্ক পবিত্রতার প্রতীক। তার মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধে সরল প্রাণের গভীর প্রীতির বার্তা। তার সকালের আলোয়-ঝরে-পড়া ক্ষণিকতায় সমস্ত সৌন্দর্যরূপের ভঙ্গুরতার আভাস। শেফালির এই রূপসৌরভের মধ্যে নিহিত অসীম কোমলতা, গভীর সরলতা, নম্রমধুর মাধুরী এবং করুণ ক্ষণিকতার মিলনে রচিত যে সৌন্দর্যরসটি শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে তাকেই কবি বলেছেন 'শেফালিবনের মনের কামনা'। আলোছায়ায় গড়া এই শিশিরভেজা সকালের অনন্ত অণুত পরিব্যাপ্ত এই সুষমার অব্যক্ত আভাসটিকে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যমূর্তিতে সংগৃহীত দেখবার জন্য কবির মনে বাসনা জাগে। কিন্তু সৌন্দর্যের চরম অভিব্যক্তি তো পরিপূর্ণ নারীত্বের মধ্যে।[১] তাই শেফালির সৌরভোচ্ছ্বাসে প্রচ্ছন্ন এই মাধুরীরস যদি এক অনুপম নারীমূর্তি গ্রহণ ক'রে শরতের এই স্বর্ণপ্লাবিত বুকে ক্ষণেকের জন্য অবতীর্ণ হয় তবেই কবির প্রাণের এই গভীর সৌন্দর্যতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয়।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের বিকাশই তো হৃদয়ের 'সোনার স্বপন, সাধের সাধনা'—শরতের অঙ্গনভরা এই সৌরভসুষমা যার আভাস বয়ে আনে। যুগে যুগে অসংখ্য মানবহৃদয় এই অক্লান্ত সাধনায় কত বিনিদ্র রাত, কত উৎসুক দিন বেদনার অনির্বাণ হোমানলে উৎসর্গ করেছে। সেই চিরদিনের অতৃপ্ত কামনার ধন যেন ঐ শেফালির স্নিগ্ধ-সুরভিত শুভ্রতায় মূর্ত হয়ে শ্বেতচন্দনচর্চিত মুখের মধুর সম্ভাষণে

১ এই ভাবটির অপূর্ব রসচিত্রণ আছে "বিচিত্রিতা"র 'পুষ্প' কবিতাটিতে।

বিশ্বভুবনকে অভিনন্দিত করছে। ধন্য সে যার বিরহী-হিয়ায় আজ দুঃখবেদনার দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হয়ে ঐ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মহিমা প্রকাশ পেল। ধন্য সে যার মেঘবিমুক্ত জীবন আজ ওই সোনার স্বপ্নের শতদলে সজ্জিত হল। ॥

কবিতাটির মনোরম প্রকাশরূপের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

প্রথম স্তবকে শেফালিসৌরভের প্রতীক যে অপরূপ নারীমূর্তিটি কল্পিত হয়েছে তার আভাসচিত্রণে এক আশ্চর্য শান্ত অথচ গভীর সৌন্দর্যতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে। এই পরমবাঞ্ছিত সৌন্দর্যরূপটিকে ইন্দ্রিয়কামনার নিগড়ে বন্দী করার কোন স্পৃহাই যেন কবির নেই। তিনি শুধু কিছুদূরে থেকে বিশুদ্ধতম সৌন্দর্যের quintessence দিয়ে গড়া এই পরমাশ্চর্যটিকে দেখতে চান, এই পরম উপস্থিতির সুধাটুকু আপন-মনে পান করতে চান[১]।

'জ্বালি জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা' থেকে 'ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে' পর্যন্ত এক চমকপ্রদ সৌন্দর্যময় image-মালা মানবহৃদয়ের সৌন্দর্য-সাধনার বিচিত্র বেদনার আকৃতিকে আভাসিত করেছে।

(৩০)

আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে ॥
ওই-যে দূরে কূলে কূলে ফাল্গুন উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুলে—
সেথা হতে আসে দুরন্ত হাওয়া, লাগে আমার পালে ॥
কোথায় তুমি মম অজানা সাথি,
কাটাও বিজনে বিরহরাতি,
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে ॥

("গীতবিতান" পৃ ৩৬২)

১ এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়তে পারে 'চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে' গানটির শেষের পংক্তিগুলি :

নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি ॥

এই গানটি "সানাই"-এর অন্তর্গত না হলেও এর গভীর জাতিগত মিল আছে "সানাই" থেকে নেওয়া এই আলোচনা-পর্যায়ের অন্য রচনাগুলির সঙ্গে। এখানেও সেই অতিসূক্ষ্ম কল্পনার তরঙ্গে রঙীন ভাবলীলাকাশ, সেই মধুসঞ্চারী রসদৃষ্টি, সেই মায়াময় দেহরচনা।

এই ধরনের রচনায় ভাবের কি কোন পৃথক বিশ্লেষণ সম্ভব? এখানে ভাব ও ভাষণ, অনুভূতি ও আঙ্গিক এমন আশ্চর্যভাবে এক হয়ে গেছে যে ভাবটির যেন কোন বিশেষ অস্তিত্বই নেই—সে আছে মূর্ত হয়ে একমাত্র ঐ প্রকাশরূপটিতেই। তাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখবার চেষ্টা বৃথা। এই কথা মনে রেখে কবিতাটির ভাবমূর্তির সামান্য একটু আভাস দেবার চেষ্টা করছি।

॥ কবির নিজেরই গান তাঁর মুগ্ধ অন্তরকে দোলা দিয়ে কখন তাকে চুপি চুপি বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে ভাবের এক অপরূপ রূপলোকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, গানের সুরের অলৌকিক মাধুরী ভাববিলাসী অন্তরকে এই দৈবশাসিত ছিন্ন বাস্তবের কারাগার থেকে কল্পনার আদর্শলোকে মুক্তি দেয়—যেমন দিয়েছিল কীট্‌স্‌কে নাইটিংগেলের অবর্ণনীয় সংগীতমুখর রোমাঞ্চলোকে।

সেই অবাধ মুক্তির জগতে পৌঁছে রসতৃষিত মনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা বেদনাগুলি উড়ে বেড়ায় কল্পনার রঙীন রশ্মি বেয়ে। অন্তরের দীর্ঘতৃষিত রসদৃষ্টিতে ভেসে ওঠে অনির্বচনীয় ফাল্গুন-মাধুরীর প্লাবনে উচ্ছ্বসিত এক সুদূর উপকূল—রোমান্টিক কল্পনার সেই 'নীলকুন্তলা সাগরমেখলা' চিরবসন্ত-রঞ্জিত নন্দনভূমি। সেখান থেকে বয়ে-আসা দুরন্ত দক্ষিণহাওয়া মুগ্ধ যাত্রীর নৌকার পালে জাগায় অভিযাত্রার মাতন।

কিন্তু আদর্শলোকের ঐ অপরূপ নিমন্ত্রণে তো একলা যেতে মন চায় না। তাই পরিপূর্ণ মাধুরীর আমন্ত্রণের সংগীতে বেজে ওঠে চিরদিনের বিরহ-কাতরতা। কোথায় সেই অদেখা অজানা, সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত, যে আজ নাবিকের এই আনন্দযাত্রার সাথী হতে পারত— তাকেই যে আজ একান্ত প্রয়োজন। কোথায় সে আছে কে জানে—প্রেমিকপ্রাণের সেই চির-অন্বেষিত পরিপূরক: পৃথিবীর কোন অজানা কোণে সে-ও অজানা প্রিয়ের বিরহে বিধুর—কে জানে। উদ্বেলিত সাগরের জোয়ারজলে দোদুল এই নিরুদ্দেশযাত্রী তরীখানি যে আজ সেই অজানারই রমণীয় সাহচর্যের জন্য ব্যাকুল। ॥
